পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায়

অনিলা দাশগুপ্ত

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম, চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রকাশক :
অনিলা দাশগুপ্ত
জি-১ মানিকতলা গভর্ণমেণ্ট হাউসিং স্টেট
কলিকাতা-৫৪

মুদ্রাকর :
আর. কে. নস্কর
দীপঙ্কর প্রেস
২/১এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

যাদের নিয়ে লেখা তাদের

স্মৃতির উদ্দেশে

দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্রের নীল জলরাশি—আকাশ থেকে যেন সোজা পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

পথে যেতে যেতে গাড়ি থেকেই দৃশ্যটি চোখে পড়ল অনুপের। বিস্ময়ে-আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। এমন অপরূপ দৃশ্য অনুপ জীবনে কল্পনাও করতে পারেনি। শুধু চোখ মেলে দেখার দৃশ্য এটা—বর্ণনার অতীত।

পুরীর সমুদ্র। সকালে পুরী স্টেশনে নেমেই একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিয়ে 'সেবাশ্রম' ধর্মশালার দিকে রওনা হয়েছিল সে। পাণ্ডাই পথ বাতলে দিচ্ছিল, গাড়ির পা-দানিতে দাঁড়িয়ে।

বলতে গেলে একরকম ঝোঁকের মাথায় কলকাতা থেকে চলে এসেছে অনুপ। আসার আগে সে বাণীর সঙ্গে আর দেখা করতে যায়নি। যাবেই বা কেন! তবে আসার আগে একটি সপ্তাহ সে যে ওর জন্যই বিকেলে অধীর প্রতীক্ষায় বাড়িতে বসে থাকতো, এটা আর কেউ না জানলেও সে নিজে তো জানে। লোভী লোকের আশার মত একটা ইচ্ছা প্রতিক্ষণ ওর মনের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ছিল—বাণী হয়তো আসবে আবার ওর কাছে—নিজের ব্যবহারের জন্যে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইবে এসে।

কিন্তু বাণী এলো না শেষ পর্যন্ত। একটি একটি করে সাতটা দিন পেরিয়ে গেল, তবু বাণীর দেখা পেল না অনুপ। হ্যাংলামির জন্যে তখন নিজের উপরেই রাগ হয়েছে ওর। না, বাণীর কথা ভেবে নিজেকে আর কষ্ট দেবে না অনুপ।

হ্যাঁ, বাণীর উপর অভিমান করেই কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছে সে। হাতে সামান্য যা পুঁজি ছিল, তাই নিয়েই চলে এসেছে। চাকরির জন্যেও পরোয়া করেনি। পেটে যখন বিদ্যা আছে, না খেয়ে মরবে না।

অন্য কিছু চিন্তা না করেই সোজা পুরীতে চলে এলো অনুপ। পুরীর সেবাশ্রম' ধর্মশালাতেই এসে উঠলো প্রথমে। কিন্তু আশ্রমের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিল না কিছুতেই। কলকাতায় ফিরে

যেতে ইচ্ছে হয়েছিল অনেকবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। বাণীর কথাগুলি মনে পড়ে—মুখের উপর কি নির্মমভাবেই না সেদিন বললে কথাগুলি!

খারাপ লাগলেও অনুপ তাই পুরীতেই থেকে গেল। কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন, চাকরীর ব্যবস্থা তো করতেই হবে একটা।

চাকরির তদ্বির করতেই সেদিন বেরিয়েছিল সে। ফেরার পথে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে সান্ত্বনা মাসীমার সঙ্গে দেখা—বেলা তখন এগারোটা বেজে গেছে। হাসপাতালের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে মাসীমা পুরীতে আছেন, খবরটা জানা থাকলেও ওঁর ঠিকানাটা জানতো না অনুপ।

অনুপকে দেখে মাসীমা যেমন আশ্চর্য হলেন, খুশিও হলেন তেমনি।
—আরে, তুই এখানে!

সাদা থান কাপড় পরা ফুল-বেলপাতা হাতে নিয়ে মাসীমাকে মন্দির থেকে বেরুতে দেখে অনুপও কম আশ্চর্য হয়নি। মাসীমার এই রূপটি সম্পূর্ণ নতুন ওর চোখে।

ওঁকে দেখে বড় দুঃখ হল অনুপের। প্রচণ্ড একটা অভাব-কে ভুলে থাকার জন্যেই না মানুষ ধর্মের আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়।...

কথাটা মনে হলে পৃথিবীর সমস্ত বর্ণ-বৈচিত্র্য মুছে যায় এক মুহূর্তে—বিধবার সাদা থানের মতই বর্ণহীন করুণ মনে হয় আকাশটাকে।

—কোথায় আছিস?—রাস্তায় নেমে মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন।

—'সেবাশ্রমেই' আছি আপাতত।

—আমার সঙ্গে চল, আমাদের বাড়িটা দেখে যাবি।

সত্যি কথা বলতে কি, মাসীমাকে দেখে অনুপের মনটাও খুশি হয়ে উঠেছিল।...ছেলেবেলার অনেক কথাই মনে পড়ে যায় ওঁকে দেখলে—বিশেষ করে মায়ের কথা!

অনুপকে সঙ্গে করে মাসীমা তাঁদের বাড়িতে এসে ঢুকলেন। বাড়িটা ওঁর নিজের নয়, ভাসুরের। মাসীমার ভাসুর পুরীতেই বসবাস করছেন। নিঃসন্তান মাসীমা ওঁদের সংসারেই এসে আশ্রয় নিয়েছেন এখন।

বাড়িতে ঢুকে অনুপ প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল বইকি!

মাসীমাকেই শুধু চেনে সে। মাসীমার জা, ভাসুর, ভাসুরঝি—ওঁদের কারো সঙ্গেই তো ওর পরিচয় নেই !···

নতুন লোক দেখলেই ও কেমন যেন ঘাবড়ে যায়। তখুনি চলে আসার চেষ্টা করছিল। তা মাসীমা ভাত না খাইয়ে কিছুতেই ছেড়ে দিলেন না।

খাওয়া হয়ে গেলে মাসীমাকে একলা পেয়ে অনুপ নিজের অবস্থাটা ওঁকে বলে ফেললো—একটা ঘর না হলে আর চলছে না মাসীমা।

কথায় বলে গরজ বড় বালাই।

—তুই পুরীতেই থাকবি নাকি !—মাসীমা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

একটু ইতস্ততঃ করে অনুপ উত্তর দিয়েছিল—সেই বাসনা নিয়েই তো চলে এসেছি।

মাসীমা কি যেন একটু ভাবেন নিজের মনে। তারপর জিজ্ঞেস করেন—একটা ঘর হলেই তো হবে ?

—হ্যাঁ, একলার পক্ষে একটা ঘরই যথেষ্ট।—অনুপ উত্তর দেয় সঙ্গে সঙ্গেই। আসার আগে ঘরের কথাটা সে আবার মনে করিয়ে দিয়েছিল মাসীমাকে।—ভুলে যেও না কিন্তু।

না, মাসীমা সত্যি ভুলে যাননি ওর কথা। দু'দিনের মধ্যেই ঘরটা পেয়ে গেল অনুপ। মাসীমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতে।

ঘরখানি মনের মতোই। খোলামেলা, নিরালাও বটে—এক-ঘরে লোকের মত বাড়িব অন্য অংশ থেকে একেবারে আলাদা। ঘরটির দক্ষিণ দিকে জানলার পাশেই একটা নিমগাছ। পাটকেল রঙের কচি-কচি পাতা সকালে সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে। গাছের ডালে কত রঙ-বেরঙের পাখি এসে বসে—লম্বা লেজ দুলিয়ে শিস্ দেয়। আশ্চর্য মিষ্টি সুর।

চাকরিটাও জুটে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। স্কুল মাস্টারী। মাইনেটা ভদ্র না হলেও পেশাটা নিঃসন্দেহে ভদ্র—কেরানীগিরির চেয়ে একশো গুণে ভালো।

সমস্যা রান্না-খাওয়া নিয়ে। মাসীমা অবশ্য তাঁদের বাড়িতেই ওর খাবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনুপ রাজী হয়নি। রোজ-

রোজ অন্যের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া ওর ধাতে পোষায় না। মাসীমার একলার সংসার হলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। দিন কয়েক অনুপ তাই বাইরেই খেয়ে নিয়েছে।

ব্যাপারটা বিমলবাবুর নজর এড়ায়নি। বাড়ির অন্য ভাড়াটে তিনি। বিমলবাবুই বাধা দিলেন একদিন। বললেন—আমরা থাকতে আপনি রোজ-রোজ হোটেলে খাবেন, এ কেমন কথা?

বিমলবাবুর স্ত্রী শেষ পর্যন্ত অনুপের রান্না-খাওয়ার ভার নিলেন। ওদের সঙ্গে অনুপের সম্পর্কটা অনেকটা পেয়িংগেস্টের মতন। তবে বড় সহৃদয় ব্যবহার মহিলাটির। অনুপ ওকে 'বৌদি' বলেই ডাকে।

দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি। সময় যেন কাটতে চায় না। ফুরসত পেলেই তাই সমুদ্রের পারে গিয়ে বসে থাকে অনুপ। পুরীর সমুদ্র ওর সমস্ত অন্তরাত্মা অধিকার করে বসেছিল যেন। সমুদ্রের দিকে তাকালে সব কিছুই ভুলে যায় সে। ভুলে যায় নিজের দুঃখ—আকাশের অসীম বিস্তারের দিকে তাকালেও ওর এই ভাবটা মনে জাগে—নিজের দুঃখ আর নিজের থাকে না। বিশ্বের অসীম সত্তার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় যেন। কীটসের উক্তিটি মনে পড়ে—Thou silent form Dost tease us out of thought, As doth eternity.—হে নীরব মূর্তি, অসীম সত্যের মতই তুমি আমাদের মনকে সমস্ত চিন্তার থেকে মুক্ত করে বাইরে নিয়ে যাও।

সময়ের জ্ঞান হারিয়ে সমুদ্রের পারে তন্ময় হয়ে বসে থাকে অনুপ।

চৈত্রের মাঝামাঝি। বসন্তের হাওয়ায় মন উতলা হয়ে উঠলো অনুপের।

রবিবারের সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে মনের মধ্যে আশ্চর্য একটা আবেগ অনুভব করলো। বসন্ত এমন প্রাচুর্য নিয়ে আর কখনো আসেনি ওর জীবনে।

ঘরের সামনে বাগানের আগুন রঙা মরশুমী ফুলগুলি ওর প্রাণে এক-

নতুন আনন্দময় উত্তাপের সৃষ্টি করেছিল যেন। জীবনে কোথাও যেন কোন ফাঁক নেই। প্রেমের সুধায় জীবনপাত্র যেন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বকবির গানখানি মনে পড়লো—

"তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।······
ওগো, তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের—"

বিরহের মধ্যেও প্রিয়তমের চিরন্তন স্পর্শ—কি অপূর্ব অনুভূতি! কবিতা লেখার আশ্চর্য একটা প্রেরণা এসেছিল অনুপের মনে। কিন্তু লেখা হয়ে উঠলো না শেষ পর্যন্ত।

মাসীমার চিঠি নিয়ে ওদের বাড়ির চাকর বিপিন এসে উপস্থিত। মাসীমা ডেকে পাঠিয়েছেন অনুপকে। বাধ্য হয়েই যেতে হলো। বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মাসীমার ভাসুরঝি-ওরা কোণারক যাবার জন্য বায়না ধরেছিল। এতদিন পুরীতে আছে অথচ 'কোণারক' দেখার সুযোগ পায়নি। মাসীমার ভাসুর কুনোস্বভাবের লোক। বেশি ঘোরাঘুরি করতে ভালোবাসেন না। অথচ সঙ্গে একজন পুরুষ ছেলে না থাকলেই বা ওরা যায় কি করে? পাড়ার পরিচিত একটি ছেলে যেতে রাজী হয়েছিল। সেই অনুযায়ী ওরা তৈরি হয়েছিল যাবার জন্য। ছেলেটি কি কাজে যেন হঠাৎ আটকে পড়েছে, যেতে পারবে না।

হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে মাসীমা তাই ডেকে পাঠিয়েছেন অনুপকে।

ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেই উৎসাহিত হয়ে উঠলো সবাই।—যাক, বাঁচা গেল? অনুপ যখন এসে পড়েছে তখন আর ভাবনা কি!—মাসীমা বলে উঠলেন।

অনুপও এককথাতেই রাজী হয়ে গেল ওদের সঙ্গে যেতে। 'কোণারকে'র বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তো রোজ মেলে না।

মাসীমার ভাসুরের গাড়ি করেই রওনা হল ওরা। অনুপ ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলো। পিছনের সীটে মাসীমা, মাসীমার জা আর তার দুই মেয়ে—মিতা আর গীতা। বেশি বয়সে ভদ্রলোক বিয়ে

করেছেন তাই মেয়ে দুটি এখনও নেহাত ছেলেমানুষ। মিতাই বড়—বছর দুয়েকের ছোট বড় ওরা। দুষ্টুমিতে দুটি বোনই সমান। চেহারায় অবশ্য কোন মিল নেই, এক মায়ের সন্তান কে বলবে!

মিতা আশ্চর্য সুন্দরী। মোমের মতন নরম গড়ন, গায়ের রঙ কনক-চাঁপার মতই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। সবচেয়ে সুন্দর ওর দুটি ভাসাভাসা ডাগর চোখ। আকাশের ঝকমকে তারার মত সব সময়ই যেন হাসছে। পাতলা মাঝারি গড়নের নাক। পাতলা চাপা ঠোঁটে একটা কৌতুক খেলে বেড়াচ্ছে সর্বক্ষণ। নিজের দেহের সৌন্দর্য সম্বন্ধে মেয়েটি খুবই সচেতন। ওর চোখ দেখলেই বোঝা যায়!···বাড়ন্ত গড়ন। হ্যাঁ, বয়েসের তুলনায় ওকে একটু বড় মনে হয় বৈকি। বয়স নাকি মাত্র পনেরো বছর। ক্লাস টেন-এর ছাত্রী।

দেখতে দেখতে 'কোণারক' এসে গেল। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সবাই। কিন্তু সবাইকে পেছনে ফেলেই মিতা এগিয়ে গেল—সূর্যমন্দির দেখার উৎসাহ সব থেকে যেন বেশি ওরই।

মন্দিরের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল অনুপ। সূর্য-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ! কিন্তু আশ্চর্য realistic art—অপরূপ নগ্ন সৌন্দর্য! সমস্ত সংস্কারমুক্ত আরটিস্ট-এর সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়—"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ। সুন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।" নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল অনুপ। মিতার কথায় চমক ভাঙ্গলো—একি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, এবার চলুন।—বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলো সে।

মিতার মা অমনি ভুরু কোঁচকালেন শাসনের ভঙ্গিতে। কিন্তু মায়ের শাসন মানলে তো! মন্দির দেখে ফিরে আসছিল ওরা। মিতা সবার আগে দৌড়ে চললো—সদ্য মুক্তি পেয়ে একটা ঝর্ণা যেন আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মিতার মা বিরক্ত হয়ে উঠলেন—আর কোথাও যদি আমি ওকে নিয়ে যাই—! মাসীমাকে সাক্ষী মেনে বললেন।

মাসীমা স্নেহের হাসি হেসে উত্তর দিলেন—আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? যাক না, কত দূরেই বা যাবে!

অনুপ চুপ করেই ছিল। ওকে সঙ্গে এনে মাসীমাদের কি লাভ

হয়েছে, সে বুঝতে পারে না। একেবারে নিষ্কর্মা—স্মার্টনেস বলে কোন পদার্থই নেই ওর স্বভাবে।

খানিকবাদে পছন্দসই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে বসে পড়লো সবাই। খিদেয় পেট তখন চোঁ চোঁ করছে।

টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার তো সঙ্গেই ছিল ওদের—এসব ব্যাপারে মাসীমার কখনই ভুল হয় না।

খাবার পরিবেশন করছিলেন মাসীমা-ই। মিতা হঠাৎ আবার একটা ছেলেমানুষি করে বসলো। নিজের ভাগের দুটো মিষ্টি সে অনুপের পাতে তুলে দিলে। মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললে—অতিথি কিনা তাই একটু খাতির করলাম।

মিতার মা আবার শাসনের নজরে মেয়ের দিকে ভুরু কোঁচকালেন। মিতার ব্যবহারে উনি ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অনুপও বেশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। কি প্রয়োজন ছিল ওকে খাতির দেখিয়ে মিষ্টি দিতে যাবার?

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা উতরে গেল। সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল অনুপ বুঝতেই পারলো না।

বাড়িতে ঢোকার খানিকবাদেই বৃষ্টি নামল—মৃদু-মন্থর তালে।

রাত্রের খাবার পাট চুকিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো অনুপ—সকাল থেকে একটুও বিশ্রাম পায়নি সে।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে—বৃষ্টি না যেন নূপুর বাজছে। কান পেতে বৃষ্টির সেই রিম্‌ঝিম্ শব্দ শুনতে শুনতে অনুপ ঘুমিয়ে পড়লো একসময়।

সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা। এর মধ্যে অনুপ আর মাসীমাদের বাড়িতে বেড়াতে যায়নি।

পাশাপাশি বাড়ি। ইচ্ছে করলে রোজই তো যেতে পারতো সে। কিন্তু যাবার কথা মনে হলেই কেমন সংকোচ লাগতো যেন।

সংকোচের কারণও ছিল অবশ্য। মাসীমা এর মধ্যেই একদিন এসে ওর কাছে গোপনে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

—মিতাকে তোর পছন্দ হয়?—কোনরকম ভূমিকা না করেই সোজা-

সুজি জিজ্ঞেস করেছেন: মা বেঁচে থাকলে এতদিন কি বিয়ে না করে থাকতে পারতিস ?

—বিয়ে ! তুমি পাগল হয়েছ ?—অনুপ হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে ওঁর কথা।

তারপর ওদের বাড়িতে আর যায়নি অনুপ। ইচ্ছে করেই যায়নি। গেলেই তো মিতা এসে হাসি-গল্প শুরু করে দেবে ওর সঙ্গে।

বিকেলে সে আজকাল সমুদ্রের পারে গিয়েই বসে থাকে। নীল শাড়ির আঁচল দুলিয়ে সাগর কন্যা ছুটে আসে তুষার শুভ্র বাহু মেলে—এসেই পালিয়ে যায় দূরে—বহুদূরে আকাশ যেখানে নেমে এসে সাগরকে চুম্বন করছে।

দিনটা মেঘলা বলেই সেদিন বিকেলে আর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়নি অনুপ। বাড়িতে চুপচাপ থাকতে ইচ্ছে হল না। খেয়ালের মাথায় হঠাৎ মাসীমাদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলো সে।

কোনদিক না তাকিয়ে সোজা মাসীমার ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

ঘরে ঢুকে অবাক। মাসীমার অসুখ! বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন। খাটের উপর মাসীমার মাথার কাছে বসে মিতা হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করছে মাথায়।

—জ্বর হয়েছে ?—অনুপ জিজ্ঞেস করে।

উত্তরটা দিলে মিতা।—হ্যাঁ।

মাসীমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অনুপ।

—বোস।—খাটের পাশে খালি চেয়ারটা দেখিয়ে মাসীমা বললেন।

অনুপ চেয়ারে বসে পড়লো। মাসীমার কপালে হাত রেখে বললে—গায়ে এখনও তো বেশ টেম্পারেচার—জ্বর আছে।

অনুপের কথা শেষ হতে না হতেই মিতা খাট থেকে নেমে পড়লো আচমকা। হাত পাখাখানা অনুপের হাতে দিয়ে বললে আমি চা নিয়ে আসি।

—না, না, চায়ের কোন দরকার নেই।—অনুপ বাধা দিলে: মাসীমা অসুখে পড়ে—

মিতা ওর কথায় একটু ক্ষুণ্ণ হলো যেন। মুখ কালো করে জানলার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কোন কথা না বলেই আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরের দিনই অনুপ আবার গেছে ওদের বাড়িতে। অমন অসুখ দেখে এল, না যাওয়া ভালো দেখায় না। তারপর মাসীমার খবর নিতে রোজই একবার করে যেতে হয়েছে।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মাসীমা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু ওদের বাড়িতে যাওয়ার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারেনি অনুপ। মিতার সম্পর্কে সংকোচটাও কেটে গেছে।

শুধু তাই নয়, মিতা এখন রোজই তার বই-খাতা নিয়ে হাজির হয় ওর কাছে।...অঙ্ক শিখিয়ে দিতে হবে। অঙ্কে মেয়েটি সত্যি বেশ কাঁচা। ওকে অঙ্ক বুঝিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই রাত হয়ে যায়।

রাত হলেই বা ক্ষতি কি! বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকলেই তো মন খারাপ হয়ে যায় অনুপের। কলকাতায় ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সেই দিনগুলি জীবনে আর কখনো ফিরে আসবে না।

রাত্রের খাবারটা বিমলবাবুর স্ত্রী ওর ঘরের টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে যান। নিঃশব্দে খাওয়ার পাট চুকিয়ে বই নিয়ে বসে অনুপ। বইয়ের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে—বইয়ে মন বসে না।

খানিকবাদে বিরক্ত হয়ে বই রেখে শুয়ে পড়ে সে। বাণী এখন কি করছে? রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমনোর অভ্যাস নেই ওর।...অনুপকে সে একেবারেই ভুলে গেছে কি?...কতদিন তার খবর পায় না। ইচ্ছে করেই অনুপ তাকে চিঠি দেয়নি। কি হবে অতীতের জের টেনে?...

নিজের অসুখ-বিসুখকে বাণীর বাবা কোনদিনই আমল দেন না। কিন্তু ব্রঙ্‌কাইটিসের ধাক্কাটা কিছুতেই যেন সামলে উঠতে পারছেন না তিনি। সেই থেকে একটা না একটা লেগে আছে। দিনকতক বাইরে থেকে

ঘুরে এলে হয়তো শরীরটা সারতো। ডাক্তার-কাকাও তাই বলছিলেন—ডাক্তার মুখার্জিকে বাণী 'কাকা' বলেই সম্বোধন করে।

কিন্তু অন্য সবাই চিন্তা করলে কি হয়, নিজের শরীরের জন্যে বাণীর বাবার কোন চিন্তা নেই। চিন্তার বোঝা বাণীর উপর চাপিয়ে দিয়ে তিনি তো নিশ্চিন্ত। কিন্তু বাণী চিন্তা না করে থাকে কি করে!

অনেক আগেই বাইরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঐ ব্যাপারটা ঘটলো। বাপ-মাকে না-জানিয়ে মানসী হঠাৎ উধাও হলো বাড়ি থেকে। আর তারপরেই ভূপেশকাকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

মানসীর বিয়ের খবর পাবার পর কোথায় নিশ্চিন্ত হবেন, তা নয়, উলটো অসুখ আরো বেড়ে গেল। আসল কথা, অরবিন্দকে জামাই হিসাবে কল্পনা করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল ওঁর পক্ষে। মানসীর বিয়ে তাই প্রায় একটা শোকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওঁর কাছে।

তারপর ললিতা-কাকীমা-ই বা কি কাণ্ড করলেন! ভূপেশ কাকার উপর রাগ করে ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে বসে রইলেন। ব্লাডপ্রেসারের রোগী, তাকে এভাবে একলা ফেলে গেলেন কি করে!

বাণীর বাবা কিন্তু যেতে পারলেন না। বাইরে যাবার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন—তোর ভূপেশ কাকাকে একলা ফেলে এ সময়ে কিছুতেই যাওয়া চলে না।

বাণী মৃদু আপত্তি তুলেছিল—তোমার নিজেকেও তো বাঁচতে হবে।

—নিশ্চয়।—বাণীর বাবা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন; বাঁচতে হবে। সবাইকেই বাঁচতে হবে। কিন্তু শুধু নিজের বাঁচার কথা ভাবলেই কি মানুষ বাঁচতে পারে?

—সস্নেহে বাণীর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—তোর কাকীমা ফিরে এলেই যাবার ব্যবস্থা করবো—কতদিন আর ভাইয়ের সংসারে গিয়ে বসে থাকবেন? রাগ পড়ে গেলেই দেখবি—

শরীর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই কথাটা হেসে উড়িয়ে দেন বাণীর বাবা।

মেয়ের কথা না-হয় হেসে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ডাক্তারকাকার কথা? বাবাকে বড় ভাইয়ের মতই শ্রদ্ধা করেন কাকা। তাঁর কথা তো আর অগ্রাহ্য করা চলে না।

তাঁর উপদেশ শুনেই বাবা শেষ পর্যন্ত হাওয়া পরিবর্তন করতে রাজী হয়ে গেলেন। বাণীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। বাইরের জল-হাওয়া গায়ে লাগলে যদি বাবার শরীরটা আবার সেরে ওঠে।

জায়গাটাও ডাক্তার-কাকা বাতলে দিলেন। বললেন ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের পক্ষে সমুদ্রের হাওয়াই ভালো। দিনকতক পুরী থেকেই না হয় ঘুরে আসুন।

পুরীর নাম শুনেই বাণী উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ওর অনেকদিনের শখ পুরীতে বেড়াতে যাবে। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। একটা না একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। এবার আর কোনো কথা নয়—পুরীতেই যাবে ওরা। ভূপেশকাকা তো এখন অনেকটা সামলে উঠেছেন। বাণীর বাবা তাই আর আপত্তি তুললেন না।

বাণী দিন স্থির করে ফেললো। সঙ্গে-সঙ্গে অফিসে ছুটির জন্যে দরখাস্তও লেখা হয়ে গেল।

পুরীতে গিয়ে সপ্তাহখানেক সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে বারীনকে। বড়জোর সকালে-বিকালে সমুদ্রের ধারে অল্প-স্বল্প বেড়াবে। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেই তো কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে—কত নতুন লোকের সঙ্গে চেনা-জানা হবে। চাই কি, হঠাৎ অনুপের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে! সেও যখন পুরীতে আছে। মানসীর কাছে চিঠি লিখেছে অনুপ। ঠিকানাটা নোটবুকে লিখে নিয়েছে বাণী। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই ওকে চিঠি লিখতে পারতো সে।

ইচ্ছে যে হয়নি, তা নয়। লিখেও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকে দেওয়া হয়নি। বয়ে গেছে ওর কাছে চিঠি লিখতে। মিছামিছি রাগ দেখিয়ে চলে গেলো। গিয়ে একটা খবর পর্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করলো না!···মানসীকে অবশ্য এতদিন বাদে চিঠি দিয়েছে। বাণীকে দিতে কি হয়েছিল? বাণী যেন ওর কেউ নয়।

রাগ করেই বাণী ওর কাছে তাই চিঠি দেয়নি। লিখেও ছিঁড়ে ফেলেছে। কিন্তু পুরীতে সমুদ্রের পারে বেড়াতে গিয়ে যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তখন? বাণী কি চুপ করে থাকবে? কথা বলবে না ওর সঙ্গে?

বলবে। ভদ্রতার খাতিরে যেটুকু বলা দরকার তাই বলবে—তার বেশি নয়। কিন্তু অনুপ যদি ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়? ইচ্ছে হলে যাবে। বাণী যেচে ওর সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা করতে যাবে না।

না, অনুপ কখনোই ওই ধরনের ব্যবহার করতে পারে না। রাগ নিশ্চয়ই এতদিনে পড়ে গেছে ওর। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। লজ্জায়-সংকোচে হয়তো চুপ করে আছে। বাণীর কাছে তাই আর চিঠি লিখতে পারছে না। আচ্ছা ছেলেমানুষ! একলা ঘরে বাণী নিজের মনেই হেসে ওঠে।

ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেলেই জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেললো সে। একলা মানুষ। আগে থেকে গুছিয়ে না রাখলে কোনটা ফেলে যাবে তার ঠিক আছে? দরকারের সময় হাতের কাছের জিনিসটা হয়তো পাওয়াই যাবে না। তখন ছোটো আবার দোকানে। অনর্থক ছুটোছুটি ভালো লাগে না বাণীর। তা-ছাড়া বেড়াতে বেরিয়েও যদি সেখানে গিয়ে ঘর-সংসারের ধান্দায় ঘুরতে হয়, সেটা মোটেই আনন্দদায়ক নয়। রামলালটা তো কোন কর্মের নয়। ধর-লক্ষ্মণের অবস্থা। বেডিং-টা পর্যন্ত বাণীকে গুছিয়ে নিতে হবে।

ধীরে-সুস্থে সব গুছিয়ে ফেললো বাণী। হ্যাঁ, যাবার আগের দিনই সব রেডি হয়ে গেল। বাকী রইলো শুধু খাবার টিফিনক্যারিয়ার ও জলের পাত্র।

রাত দশটা বেজে গেছে। বাণীর বাবা তখনও বাড়ি ফেরেন নি। বাবার জন্যই অপেক্ষা করছিল বাণী। তিনি ফিরে এলে দু'জনে একসঙ্গে বসে খাবে।

ঝোলাভর্তি একগাদা বই নিয়ে রাত এগারটায় বারীন বাড়ি ফিরলেন। বইগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে একমুখ হাসি নিয়ে বললেন—মনে করে এই বইগুলি ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে নিয়ো কিন্তু। ওখানে গিয়ে কোথায় আবার বইয়ের খোঁজে ঘুরে বেড়াবো।

বাণী হেসে বলে—কিন্তু পুরীতে গিয়েও কি তুমি কেবল বই মুখে করে বসে থাকবে?

—সঙ্গে বই না থাকলে রাত কাটবে কি ভাবে? বারীনও হেসে

উত্তর দেন : রাত্রের দিকে তো আর সমুদ্রের পারে ঘুরে বেড়ানো চলবে না।

—না, তুমি সত্যি ইন্‌করিজেব্‌ল—তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। —বলেই বাণী চটপট টেবিলে খাবার সাজাতে থাকে। এত রাত করে খাওয়া ওর বাবার পক্ষে মোটেই ঠিক নয়। কিন্তু বাণী নিরুপায়।

এপ্রিলের রাত। বসন্তের হাওয়া বইছে। সে হাওয়া অনুপের ঘরের পাশে নিমগাছ-টার ডালপালা নিয়েও মাতামাতি করে। যাবার বেলায় এবার বসন্তর যেন একটা অহেতুক কুড়েমি দেখা দিয়েছে।

আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। হাওয়ায় অজানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। অনেক চেষ্টা করেও চোখে ঘুম এল না অনুপের।

শান্তি নগরে ঠিক এমনি এক জ্যোৎস্নারাতে বাণীর সঙ্গে সে বেড়াতে বেরিয়েছিল—অরবিন্দও ছিল সঙ্গে। চাঁদ সেদিন আরো উজ্জ্বল ছিল যেন—কালো মেঘের পাশে ঝকমক করছিল।

পথে যেতে-যেতে কবিতা আবৃত্তি করছিল অনুপ। কিন্তু অরবিন্দ থামিয়ে দিয়েছিল ওকে—গান-কবিতা এ-সব কিছুই মাথায় ঢোকে না অরবিন্দের।

তা না ঢুকুক, চুপ করে থাকতে পারে তো।

না। চুপ করে থাকা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। বাণী কিন্তু চুপ করেই ছিল।

জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক অনুপ—চোখে ঘুম আসে না। ঘুম এল সেই শেষ রাত্রে।

সকালে প্রচণ্ড মাথাধরা নিয়ে বিছানা থেকে উঠল অনুপ। তা সত্ত্বেও স্কুল করতে হলো। মাথাধরার জন্য তো আর ছুটি নেওয়া চলে না। জ্বর হলে তবু একটা কথা ছিল।

স্কুলে কাজের চাপে যন্ত্রণাটা ভুলে ছিল সে। বিকেলে বাড়ি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন আবার বেড়ে গেল।

চায়ের সঙ্গে তাই দুটো 'এ্যাস্‌পিরিন' খেয়ে শুয়ে পড়লো সে। বাইরে বেরুনোর কথা মনেও এল না। 'এ্যাস্‌পিরিনে'র প্রভাবেই হয়তো ঝিমিয়ে পড়েছিল অনুপ। তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল আচমকা—কপালের উপর আশ্চর্য নরম হাতের স্পর্শ। ঘরের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো অনুপ—সুইচ টিপে আলো জ্বালালো।—মিতা!

অনুপের তক্তপোশের পাশেই চেয়ারে বসেছিল সে। চোখে চোখ মিলতেই হেসে উঠলো খিলখিল করে—লুকোচুরি খেলায় সমবয়সী এক খেলার সাথীকে যেন হারিয়ে দিয়েছে সে।

এমন সময়ে ওর ঘরে মিতাকে দেখবার কল্পনাও করেনি অনুপ। দেখে কিন্তু অখুশি হল না। মাথাধরাও তখন প্রায় ছেড়ে গেছে।

অনুপ বিছানায় এসে বসলো আবার।

কথা বললো মিতাই প্রথম!—বেশ লোক, বিকেল থেকে আপনার অপেক্ষায় বসে আছি—আজ যাবেন না, কাল বলে এলেই পারতেন।

—কাল জানাব কি করে?…অসুখ-বিসুখ কি নোটিশ দিয়ে আসে কখনো?

—অসুখ করেছে?—মিতা যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো। অনুপ মাথা নেড়ে সায় দিল। বললে—ভীষণ মাথা ধরেছে, হঁা, মাথা ধরার কথাটা একটু বাড়িয়েই বলতে হলো।

মিতা কি যেন ভাবলো একটু। তারপর বললে—শুয়ে থাকলেই মাথা ধরা সেরে যাবে?

—তাহলে কি করতে হবে বলো?—মিতার কথার ধরন দেখে ভারী হাসি পেল অনুপের।

—ওডিকলন আছে?

—না!—হাসি চেপে উত্তর দিলে অনুপ।

—থাক, দরকার নেই।—অনুপের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে মিতা বললে—শুয়ে পড়ুন, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।

অনুপ বিছানায় শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মিতা ওর মাথা টিপতে শুরু করে দিল। দু'হাতে কপালের পাশ দুটো চেপে ধরে বললে—আমি মাথা

টিপে দিল মাথাধরা ছেড়ে যেতে বাধ্য।…বাড়িতে কারো মাথায় যন্ত্রণা হলে তাই আমার ডাক পড়ে।

—আর একটু আস্তে।—কপালটা এত জোরে চেপে ধরেছিল মিতা যে অনুপকে শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ করতে হলো।

—লাগলো?—ঠাট্টার সুরে মিতা বললে এত নরম আপনি?

—তোমার হাতের চেয়েও?—কিছু না ভেবেই মিতার একখানি হাত অনুপ তার কপাল থেকে টেনে নিলে। লম্বা নিটোল গড়নের ফর্সা আঙুল গুলোয় মাখমের কোমলতা।

—মিতার হাতটা ধরে অনুপ বলে—ভারী সুন্দর তোমার হাতখানি।

—শুধু হাত, আর কিছু নয়?—খিলখিল করে হেসে উঠলো মিতা, পাহাড়ী নদীর উচ্ছলতা ওর হাসিতে।

অনুপের সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। মাথা-ধরার কথা বেমালুম ভুলে গেল সে। বিছানা থেকে একলাফে উঠে দুহাতে মিতার মুখখানা তুলে ধরলো তারপর হঠাৎ যেন চুম্বকের আকর্ষণে ওর ঠোঁট গিয়ে মিতার ঠোঁটে মিললো।…

উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল সে। মিতা এই ধরনের একটা ব্যবহারের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কেমন হকচকিয়ে গেল যেন।

অনুপ নিজেও কি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েনি?

পড়ছে। মিতার সঙ্গে সে এই রকম একটা ব্যবহার করতে পারে, এক মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারেনি অনুপ।

মুখ নীচু করে বসেছিল মিতা। মুখ তুললো অনুপের কথা শুনে।

—রাত হয়ে গেল, বাড়ি যাবে না?

সংকোচটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি মিতা। ওর দিকে একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিলে। তারপর কোন কথা না বলেই আস্তে উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মিতার সঙ্গে অনুপ এগিয়ে গিয়েছিল গেট অবধি। কিন্তু মিতা একবার ফিরেও তাকালো না ওর দিকে—কথা বলা তো দূরে থাক। ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো।

অনুপ নিজের ঘরে ফিরে এল আবার। কোন রকমে খাবার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু ঘুমোতে পারলো না। 'এ্যাসপিরিনে'র প্রভাব তখন কেটে গেছে। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে অনুপ।……মিতা নিশ্চয়ই রাগ করেছে অনুপের উপর। কিন্তু মিতা তো ওকে কোন বাধা দিলে না।

…তবু নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় অনুপের। দুর্বল, অসম্ভব দুর্বল সে—এ দুর্বলতার ক্ষমা নেই। কিন্তু মিতার সম্বন্ধেই বা হঠাৎ ওর এরকম দুর্বলতা দেখা দিলো কেন? মনের দিক থেকে কতটুকুই বা সম্পর্ক ওর সঙ্গে। সম্পর্ক যার সঙ্গে ছিল—এখনও ঘুমের আগে চোখ বুঝলে যার মুখখানি মনে পড়ে তাকে তো কখনো সে—। পাশাপাশি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা দু'জনে গল্প করেছে। কিন্তু ঐ ধরনের দুর্বলতা দেখা দেয়নি কোনোদিন।…অনুপ নিজেকে যেন বুঝতে পারে না। নিজেকে বোঝা সব থেকে শক্ত কাজ সংসারে। বুক ভেঙ্গে কান্না আসে অনুপের।

শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে বাণীকে স্বপ্ন দেখলো—বাণী কি যেন বলছিল হেসে হেসে। অনাবিল একটা শান্তিতে মন ভরে উঠেছিল অনুপের।

ঘুমটা ভেঙ্গে গেল আচমকা। শুকতারা তখন অস্ত গেছে কিন্তু পূবের আকাশে আলো ফোটেনি।

স্বপ্ন, স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয় না মানুষের জীবনে?

নিজের অজান্তেই হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অনুপের বুক থেকে।…বাণী সত্যিই কি ভুলে গেছে ওকে? ইচ্ছে করলে একটা চিঠিও তো লিখতে পারতো সে।

অনুপের খবর নিতে বাণীর কি ইচ্ছে হয়নি? হয়েছে। কিন্তু নেওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত। অভিমান করেই বাণী ওর খবর নেয়নি।

কিন্তু পুরীতে এসে কেন যেন ঘুরে-ফিরে অনুপের কথাটা বারবার মনে

পড়ছে বাণীর। দু' সপ্তাহের উপর বাণী ওরা পুরীতে এসেছে। অনুপ পুরীতেই আছে, অথচ এর মধ্যে একদিনও তার সঙ্গে দেখা হল না। রাস্তায় কিম্বা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েও তো দেখা হয়ে যেতে পারতো।

রাত এগারটা বেজে গেছে। পাশের ঘরে বাণীর বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। চেষ্টা করেও কেন যেন আজ ঘুমোতে পারছে না বাণী।

বিছানা থেকে উঠে নোটবুকটা বের করে অনুপের ঠিকানাটা আবার পড়ে দেখলো। জায়গাটা অনেক দূরে ওদের বাড়ি থেকে। তবে ঠিকানা যখন আছে, চিঠি দিতে ক্ষতি কি!

অনুপকে শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠি লিখে ফেললো বাণী। লম্বা চিঠি। চিঠিতে সব খবরই ছিল, এমন কি ওর বাবার অসুখের খবর পর্যন্ত।

চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখলো ঃ আসতে দেরি করলে এবার কিন্তু সত্যিই চটে যাবো।—বাণী—

দেরি না করে পরের দিন সকালের ডাকেই চিঠিটা পোষ্ট করে দিলে সে। আর সেইদিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি নামলো—থামতেই চায় না। বর্ষা এবার এত আগে শুরু হয়ে গেল কেন?

বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশ মেঘলা হয়েই রইলো। —দু'দিনের মধ্যে সূর্যের মুখ দেখা গেল না। তিনদিন বাদে রোদ উঠলো। নির্মেঘ নীল আকাশ। বিকেলবেলায় উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে অনুপের কথা মনে পড়লো বাণীর। বাণী ওকে চিঠি দিয়েছে আসার জন্যে। চিঠিটা সময়মত পৌঁছুলে অনুপ নিশ্চয় এর মধ্যেই এসে ওদের সঙ্গে দেখা করতো।···বাদলার জন্যই হয়তো আসতে পারেনি। বাণীর ঐ চিঠি পেয়েও অনুপ দেখা করতে আসবে না, এ-ও কি সম্ভব!

মেঘের চিহ্নও নেই আকাশে। আজ নিশ্চয়ই আসবে অনুপ। বাণী তাই বেড়াতে বেরুল না বাবার সঙ্গে। এসে যদি বেচারা ফিরে যায় ওদের না দেখে?

বাবা বেরিয়ে গেলে বাণী বই নিয়ে বসলো। কিন্তু বইয়ে মন বসলো না।

২

বই রেখে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো সে। রাস্তার জনস্রোত দেখতে দেখতে বাণী ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু অনুপের দেখা পেল না।

না। আজও এলো না সে। মনটা খারাপ হয়ে গেল বাণীর। কি হল ওর? হঠাৎ কোন অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?

"রাত্রের ট্রেন দুরন্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথিক, উদ্দাম ঐ গতিকে তুমি রুদ্ধ করিতে যাইও না, তাহা হইলে উহার পৃষ্ঠতলে তুমি নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে।"—কার লেখা মনে পড়ছে না।

কিন্তু কি আশ্চর্য ভবিষ্যৎ-বাণী। মানুষের জীবনে কোনো কোনো ঘটনা বড় দ্রুতগতিতে ঘটে যায়—সোজা সিঁড়ি দিয়ে বল গড়িয়ে পড়ার মতই। ঐ গতিকে রুদ্ধ করার শক্তি নেই মানুষের!

অনুপ অবাক হয়ে ভাবে।...

দু'টি মাসের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল। ইচ্ছে করেই সান্ত্বনামাসীদের ওখানে যাওয়া বন্ধ করেছিল অনুপ। নিজের ব্যবহারের জন্যে মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছিল বইকি!

কিন্তু সেদিন রবিবার সকালে বিপিনকে দিয়ে মাসীমা যখন আবার ডেকে পাঠালেন ওকে, মনটা কেন যেন খুশি হয়েই উঠলো। জামা-কাপড় বদলে ওদের বাড়ির দিকে রওনা হল সে। নীল আকাশ তখন রোদে ঝলমল করছে।

বাড়িতে ঢুকে সবার আগে দেখা হল মিতার সঙ্গেই। বারান্দায় চেয়ারে বসে সে টেবিলক্লথে এমব্রয়ডারি করছিল।

মিতাকে দেখে অবাক হয়ে গেল অনুপ। এই ক'দিনেই আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে মিতার। হঠাৎ যেন অনেকখানি বড় হয়ে উঠেছে। সারা মুখে একটা গনগনে আগুনের আভা।

অনুপকে দেখে সে তার বুকের কাছে শাড়ির অংশটুকু সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো যেন। আঁচলটা বুকের উপর টেনে নিয়ে অনুপের দিকে একটা সলজ্জ দৃষ্টি তুলে বললে—এতদিন আসেন নি কেন?—দস্তুরমত শাসনের সুর।

একটু ভেবে অনুপ উত্তর দিলে—সময় পাইনি।

—ও।—মুখ বেঁকিয়ে অভিমানের ভঙ্গিতে উত্তর দিলে মিতা।

ভারী অস্বস্তি লাগছিল অনুপের। মাসীমা এসে পড়ায় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সে। মিতাও অমনি উঠে চলে গেল ঘরের ভেতর।

—ভালো আছিস তো ?—মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন ঃ ক'দিন আসিস ।, তাই চিন্তা হচ্ছিল। বিপিনকে পাঠিয়েছিলাম তোর খবর নিতে, গিয়ে দখা পায়নি।

—একটু আটকা ছিলাম।—থতমত খেয়ে অনুপ উত্তর দিলে ঃ তুমি গালো আছো তো ?

—আমার আবার ভালো থাকা, এখন গেলেই বাঁচি।···পিঠের সেই ্যাথাটা ক'দিন থেকে আবার বড্ড ভোগাচ্ছে।

অনুপ বেশ লজ্জিত হয়ে পড়লো। সত্যি এর মধ্যে মাসীমার একটা বের নেওয়া অন্ততঃ উচিত ছিল। দেখা করেই না হয় চলে যেত। দশে থাকতে মায়ের অসুখের সময় উনি কি সেবাটাই না করেছিলেন ায়ের।

—বোস। চা নিয়ে আসি।—চায়ের ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন সীমা।

বারান্দায় অনুপ একলাই বসে ছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে কি গাবছিল মনে নেই। মিতাকে দেখে সম্বিৎ ফিরে এল।

অনুপের সামনে একটা বেতের মোড়ায় বসে পড়লো মিতা। রাগের ভিনয় করে বললে—ভেবেছিলাম, জীবনে আর কথা বলবো না—

সত্যি কথা বলতে কি, সেই মুহূর্তে মিতার চেয়ে সুন্দর, মিতার চেয়ে াপনার আর কাউকে মনে হয়নি অনুপের। সেদিনকার মত ওকে াবার আদর করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সামলে নিলে নিজেকে। ওর চোখে চোখ রেখে হেসে বলেছিল—তুমিও তো আর খবর নিলে না!

—কি করে নেব বলুন ?—এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মিতা বললে—সেদিন বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে যা বকুনি খেয়েছি।

অনুপের জন্যেই ওকে বকুনি খেতে হয়েছে। মিতার কচি মুখখানার দিকে চেয়ে ভারী মায়া লাগলো। খানিক চুপ করে থেকে সে আস্তে

আস্তে বললে—আর যেও না আমার ওখানে—তোমার মা যখন পছন্দ করেন না।

চা নিয়ে মাসীমা ফিরে এলেন। মিতাও অমনি চলে গেল কিছু না বলে। গুরুজনের উপস্থিতিতে অনুপের সামনে বসে থাকতে হয়তো ও সংকোচ বোধ করছিল। তা নইলে অমন ছুটে চলে যাবে কেন! একেবারেই ছেলেমানুষ!

বৈশাখের ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করলো। সমুদ্র আরো চঞ্চল আরো উদ্দাম হয়ে উঠলো।

মাসীমাদের বাড়িতে যাবার অভ্যাসটা একেবারে না ছাড়লেও মিতার কাছ থেকে অনুপ যথাসম্ভব দূরে দূরেই থাকতো। মিতা আর এসে ওর কাছে অঙ্কের খাতা নিয়ে বসতো না—ওর মা হয়তো নিষেধ করেছেন।

মাসীমার সঙ্গে দেখা করেই অনুপ তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই মিতা ছলছুতো করে মাসীমার ঘরে কতবার যে ঘুরে যায়। সন্ধ্যার আগেই ওদের ওখান থেকে উঠে পড়ে অনুপ।

মিতার এজন্যে অভিমানের অন্ত নেই। চলে আসার নাম করলেই ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—এখুনি যেতে হবে, বাড়িতে এমন কি কাজটা আছে শুনি?

কাজ না থাকলেও অনুপ তাড়াতাড়িই ফিরে আসে বাড়িতে।… মিতাকে একলা দেখলে সে বড় একটা দাঁড়ায় না সেখানে। মিতার কাছে একলা থাকতে কেমন ভয় পায় অনুপ। তবে ভয়টা ওর মিতাকে নয়, নিজেকেই।

জৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ। সকালে ঘুমের মধ্যেও সানাইয়ের সুর এসে কানে পৌঁছল অনুপের। সানাই বাজছিল মাসীমাদের বাড়িতে। মিতার মামাতো বোনের বিয়ে। সম্বন্ধটা ঠিক করেছেন মিতার মা। বরপক্ষ পুরীর বাসিন্দা, কলকাতায় গিয়ে ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হলেন না। মেয়েকে নিয়ে মিতার মামা-মামীকে তাই কলকাতা থেকে এখানে

চলে আসতে হয়েছে। কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবককে এখনও বরপক্ষের মন যোগাতে হয়।

সকালে সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছে অনুপ। তখনও হাত-মুখ ধোয়া হয়নি। বিপিন এসে হাজির হল মাসীমার চিঠি নিয়ে। অনুপকে এখুনি যেতে হবে, বাড়িতে কাজের লোকের নাকি অভাব হয়ে পড়েছে ওদের। কিন্তু অনুপের মত আনাড়ী লোককে মাসীমা কাজের লোক বলে স্থির করলেন কি করে।

তবে মাসীমা যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, না গিয়ে উপায় কি! স্নান করে ব্রেক-ফাষ্ট সেরেই অনুপ বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

মাসীমাদের বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মিতা বাড়ির সংলগ্ন বাগান থেকে বেরিয়ে এল।

অনুপের সামনে এসে এক মুখ হাসি নিয়ে বললে—আমার বাচ্চা গোলাপ গাছটায় কি সুন্দর একটা গোলাপ ফুটেছে।—খপ করে অনুপের হাত ধরে বললে—চলুন, দেখবেন চলুন।

সত্যি দেখবার মতই। অতটুকু গাছে অত বড় একটা ফুল। ফুলের ভারে ডালটা নুয়ে পড়েছে মাটিতে। ভারী সুন্দর রঙ ফুলটির—হালকা গোলাপী রঙ—অনেকটা মিতার গায়ের রঙের মতই। সামনের বাড়ির উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে সকালের আলো ফুলের পাপড়িগুলিকে চুম্বন করছে।

বাগানটা ছোট হলেও অনেকরকম ফুল ফুটেছে—জবা, টগর, বেল, যুঁই, গন্ধরাজ—রঙ-বেরঙের মরশুমী ফুল। আশ্চর্য এদিকে এতদিন নজরই পড়েনি অনুপের।

চোখে রঙের নেশা ঘনিয়ে এসেছিল অনুপের; বারান্দা থেকে মাসীমা হঠাৎ ডাক দিলেন—এদিকে আয়।

না গিয়ে উপায় কি! অনুপ মাসীমার সামনে এগিয়ে এল। মিতা সোজা অন্দরমহলের দিকে চলে গেল। বাজারের ফর্দটা অনুপের হাতে দিয়ে মাসীমা বললেন—এই জিনিসগুলি কিনে আনতে হবে।···চা খেয়ে এসেছিস তো?

—হ্যাঁ।- সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে অনুপ টাকা ও ফর্দ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল।

মাসীমার নির্দেশমত জিনিসগুলি কিনে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এল অনুপ। জিনিসগুলি পৌঁছে দিয়েই নিজের ডেরায় চলে আসবে ভেবেছিল সে, কিন্তু মাসীমা আটকে ফেললেন ওকে।—সে কি হয়, কিছু না খেয়েই চলে যাবি ?

দুপুরবেলাতেও ছাড়া পেলনা অনুপ। এর মধ্যে কতবার যে মিতার সঙ্গে দেখা হল ওর! কিন্তু কথা হয়নি একটিও। আড়চোখে অনুপের দিকে তাকিয়েই চলে গেছে সে—কাজে ভীষণ ব্যস্ত, ভাবটা এইরকম। অনেকটা যেন শরৎবাবুর 'আন্নাকালী'র অবস্থা। শাড়ীর আঁচল সে কোমরে জড়িয়ে নিয়েছিল শক্ত করে। আসমানী রঙের সিল্কের শাড়িখানি আশ্চর্য মানিয়েছিল ওকে।...

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বেশি না হলেও প্রায় শ'খানেক লোককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। ছাদে বরের আসনের জন্যে একটা জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। বরাসনটি সুন্দর করে সাজানোর ভারও এসে পড়লো অনুপের উপর। তবে এ কাজটা পেয়ে অখুশি হয়নি অনুপ। কোন একটা সুন্দর জিনিসকে সম্পূর্ণ করে তোলার মধ্যে আনন্দ আছে বইকি!

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলায় ছাদে কাজ করছিল অনুপ—কিছুক্ষণের জন্যে একলাই ছিল। মিতা সেই অবসরে হঠাৎ এসে এককাণ্ড করে বসলো। পিছন থেকে এসে জোর করে ওর মুখে একটা সন্দেশ পুরে দিলে।

ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেললো অনুপ। সন্দেশটা খেয়ে বললে—দিলেই যদি তবে এত কৃপণতা কেন? হ্যাঁ, অনুপের জন্যে মাত্র একটি সন্দেশই এনেছিল মিতা।

—চুরি করে এনেছি যে।—দুষ্টুমিতে চোখ দুটি ঝকমক করছিল মিতার: তাড়াতাড়িতে বেশি আনতে পারলাম না।

সিঁড়িতে লোকজনের সাড়া পেয়েই ছুটে পালিয়ে গেল সে।

সন্ধ্যা নাগাদ বর এসে গেল। বাড়ি শুদ্ধ লোক ব্যস্ত হয়ে উঠলো চঞ্চলা মিতার চঞ্চলতা যেন আরো বেড়ে গেল। ফুলের মালা নিয়ে সে ছুটে গেল তার দিদির ঘরে—কনেকে তখনও মালা দিয়ে সাজানো হয়নি।

প্রিয়তমের গলায় মালা পরানোর কল্পনাটা ভারী মিষ্টি কিন্তু। কার মাথায় প্রথম এল সেই কল্পনা? ভালোবাসা প্রকাশের এই ভঙ্গিটি পুরানো হলেও ভাবের ঐশ্বর্যে চিরনতুন।

বিয়ের সময় বাধ্য হয়েই আবার উপরে যেতে হয়েছিল অনুপকে।

বিয়ের পর বর-কনের সঙ্গে সবাই হুড়োহুড়ি করে নীচে নেমে গেলো। অনুপ ইচ্ছে করেই নামলো না—ছাদেই বসে থাকলো। ভিড়ের মধ্যে কোনদিনও ঢুকতে ভালো লাগে না তার। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে ওর আরো যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়।

এত কাজের মধ্যেও মাসীমা কিন্তু ওর কথা ভোলেন নি। খানিক বাদেই নিজের হাতে ওর খাবার নিয়ে এলেন। অনুপের স্বভাবটা ভালো করেই জানেন তিনি—লোকজনের মধ্যে বসে খেতে সে কোনকালেই পছন্দ করে না।

—আয়, গরম গরম লুচি ভেজে এনেছি, খেয়ে নে।

মাসীমা চিলে কোঠায় ডেকে নিয়ে গেলেন ওকে। মায়ের মত যত্ন করেই সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন। অনুপের খাওয়া হয়ে গেলেই মাসীমা এঁটো থালাবাসন নিয়ে উঠে পড়লেন। কাজের বাড়িতে বসে থাকলে চলবে কেন? যাবার আগে অনুপকে বলে গেলেন—এক্ষুনি চলে যাস না কিন্তু—তোর সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে।

আগামীকালের আরো কিছু কাজ হয়তো চাপিয়ে দেবেন ওর উপর। বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করতে হলো।

বিয়ে বাড়ির হৈচৈ তখন কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে। ছাদের প্যাণ্ডেলটা খাঁ খাঁ করছিল। বাড়ির চাকর-বাকরগুলোও নিচে নেমে গেছে।

ছাদের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চিলে ঘরে এসে বসেছিল অনুপ। তক্তাপোষের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে ওর উপর দিয়ে।

নিচে বর-কনেকে নিয়ে তখনও ব্যস্ত সবাই। মাঝে মাঝে উচ্ছল হাসির আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল। বরের সঙ্গে শালী, শালাবৌ-রা হয়তো রসিকতা করছেন।

হঠাৎ কে যেন গান ধরলো—"আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—"

অচেনা মেয়েলী কণ্ঠ। মেয়েটি বাসর ঘরে বসে নিশ্চয় গান গাইছে। ভারী মিষ্টি গলা!···

পূবের খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলো অনুপ। তারার আলোয় রাত্রির অন্ধকার তখন আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে।

আত্মবিস্মৃত হয়ে বসে ছিলো অনুপ। হঠাৎ চমকে উঠল—গলার উপর একটা মৃদু কোমল স্পর্শ! ফুলের স্পর্শ!

পিছন থেকে ওর গলায় কে যেন এসে হঠাৎ একগাছি বেলী ফুলের মালা পরিয়ে দিলে!

চমকে ঘাড় ফেরাতেই মিতার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সরল হাসির আভায় সারা মুখখানি উদ্ভাসিত তার। লাল টুকটুকে বেনারসী শাড়ীতে ওকে ঠিক বিয়ের কনের মতই লাগছিল!···মিতা একেবারে শরৎবাবুর 'ললিতা'র মতই কাণ্ড করে বসলো!

বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গেলেই অনুপ তাড়াতাড়ি গলা থেকে মালাটা খুলে ফেললো। ঘরে আলো থাকলেও গোটা ছাদ তখন অন্ধকারে ডুবে আছে। কেউ এসে পড়তেও তো পারে, এলে ওরা বুঝতেও পারবে না।

শাসনের ভঙ্গিতে তাই মিতাকে বললে—নিচে যাও, কেউ দেখলে কি মনে করবে?

—করুক গে।—মিতা হেসে বেপরোয়া ভঙ্গিতে মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকালো অনুপের দিকে।

অপূর্ব ভঙ্গি! অনুপের রক্তে হঠাৎ যেন সমুদ্রের উচ্ছ্বাস দেখা দিল। হাত বাড়িয়ে মিতাকে সে টেনে নিল নিজের কাছে—বুকের উপর। স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেছে অনুপ।

নিচে তখন কে আবার গান ধরেছে—"চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো···"

অনুপের রক্তে-শিরায়-শিরায় যেন সেই গানের সুর।···

সুরটা হঠাৎ কেটে গেল। বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে অনুপ আচমকা ছেড়ে দিলে মিতাকে।

না, কেউ নয়, ওদের মনের ভুল।

দূরে সরে গেলেও মিতা তখন থরথর করে কাঁপছে।

—যাও, নিচে যাও।—অনুপ বলে উঠলো।

খানিক চুপ করে বসে থেকে মিতা উঠে চলে গেল ওর কথামত।

মালাটা তক্তাপোষের উপরই পড়ে ছিল এতক্ষণ। মালাটা পকেটে পুরে উঠে পড়লো অনুপ। না, এখানে আর থাকা নয়। সোজা বাড়িতে চলে এল সে—মাসীমার অনুমতি না নিয়েই।

তারপর দুটো দিন পেরিয়ে গেল। দু'দিনের মধ্যে অনুপ আর যায়নি মাসীমাদের বাড়িতে। বিপিন ডাকতে এলেও অসুস্থতার ছুতো দেখিয়েছে।

বর-কনে আগের দিন বিদায় নিয়েছে। বিকেলে মাসীমা নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। মাসীমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল অনুপ। এমন বিষণ্ণ-গম্ভীর ওঁকে কখনো দেখেনি সে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই বললেন না। তক্তাপোষের উপর বসে রইলেন চুপ করে।

অনুপের নির্বাক প্রশ্নের উত্তরে মুখখানা আরো কালো করে ছলছল চোখে বললেন—তোকে আমি কখনো এমন ভাবিনি অনুপ।—অনুপ যেন ভীষণ একটা অন্যায় কিছু করে ফেলেছে।

অন্যায় করেছে ঠিকই। তাই প্রথমে সামান্য থতমত খেয়ে গেল অনুপ। সে-ভাবটা সামলে নিয়ে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—আর একটু স্পষ্ট করে বললে ভালো হয়।

মাসীমা হঠাৎ রেগে গেলেন—তাঁর চোখের জল বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

স্পষ্ট করেই তিনি বলে ফেললেন কথাটা।...

অনুপের মুখের উপর একটা ক্ষুব্ধ দৃষ্টি রেখে বললেন—কতখানি অন্যায় করেছিস, বুঝতে পারছিস না?—

চিলেঘরের সেই ব্যাপারটা তাহলে ওরা জেনে গেছেন। মিতার এক আত্মীয়া নাকি স্বচক্ষে দেখেছিল। খবরটা শুনে অবধি মিতার মা চটে আগুন হয়ে আছেন অনুপের উপর।

অনুপের যেন জিদ চেপে গেল। বললে—এত চটাচটির কি হয়েছে? মিতাকে যদি আমি—, তাতে এমন কি দোষের আছে?

মাসীমা এবার যেন একটু আশ্বস্ত হন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—মিতাকে তুই বিয়ে করতে চাস, ওর মাকে আগেই জানানো উচিত ছিল।—একটু থেমে বললেন—এমনিতেই তো উনি মেয়েটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

কথাটা শুনে অনুপ বিস্মিত হয় বইকি। মা তাঁর মেয়েকে দেখতে পারেন না, এ আবার কেমন কথা!

অনুপের চিন্তা অনুসরণ করেই যেন মাসীমা বলে ওঠেন—সেদিন শুধু মারতেই বাকি রেখেছিলেন।···কপালটাই খারাপ করে এসেছে মেয়েটা, না-হলে ছ'মাস বয়েসে কেউ মা হারায়!—

মিতার মা নেই তাহলে!

ওর দুঃখের কথা মনে হতেই মাসীমার রাগ যেন জল হয়ে গেল। একে একে সব কথাই বলে ফেললেন তিনি। মিতা ওর মায়ের পালিত-কন্যা। এক বছর বয়স থেকে পালন করলেও ভদ্রমহিলার কোন মায়া পড়েনি মেয়েটার উপর। আশ্চর্য শক্ত প্রাণ।

মাসীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন—বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই ভালো—শুভকাজ ফেলে রাখতে নেই।—একটু থেমে বললেন—তোর কাকা নিশ্চয় অমত করবেন না।

এখুনি বিয়ে করতে হবে! অনুপ বিচলিত হয়ে পড়লো খানিকটা। একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিলে—কাকার মত হবে কিনা বলতে পারছি না।

মাসীমা ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করলেন একটু। তারপর মুখটা গম্ভীর করেই বললেন—কিন্তু খবরটা কাকাকে জানানো দরকার। তবে বিয়ের আগে ও বাড়িতে আর না-যাওয়াই ভালো তোর পক্ষে।

অনুপ চুপ করে রইল—কোন উত্তর দিলে না।

গম্ভীর মুখে মাসীমা চলে গেলেন খানিক বাদেই।

অনুপ মাথা হেঁট করে বসে রইল—মাসীমাকে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দেবার কথাও ভুলে গেল সে।

কতক্ষণ ঐভাবে বসে ছিল, খেয়াল ছিল না তার। বিমলবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললে চমকে উঠল—চা দিতে এসেছিলেন তিনি।

সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকার ঘরে অনুপকে অমনিভাবে বসে থাকতে দেখে হয়তো কৌতুক বোধ করলেন।

চায়ের কাপ ওর সামনে রেখে মৃদু হেসে রসিকতা করলেন—লক্ষণ ভালো নয়, ঘটকালিটা শেষ পর্যন্ত আমাকেই করতে হবে দেখছি।

চায়ের কাপ হাত তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দাঁড়িয়ে গল্প করার তাঁর সময় কোথায়! বাড়িতে অনেকগুলি পোষ্য।

চা খেয়েই অনুপ খাটের উপর চিত হয়ে পড়লো। বিকেল থেকেই আজ আকাশে মেঘ জমেছে। যে কোন সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে।

জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিলো অনুপ। একটা চিন্তা কাঁটার মতই খচখচ করছিল মনের মধ্যে। ওর জন্যেই মিতাকে তার মায়ের কাছে গাল-মন্দ শুনতে হয়েছে। কিন্তু মিতাই বা হঠাৎ তার গলায় মালা পরাতে এল কেন?

বৌদি খাবার নিয়ে এলেন।—নাও, উঠে গরম গরম খেয়ে নাও।—বলেই টেবিলের উপর খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

রাত হলেও খেতে ইচ্ছে করে না অনুপের। ঢাকা-দেওয়া খাবার ঢাকা পড়ে থাকে।

আলো নিভিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো অনুপ। কিন্তু ঘুম এল না চোখে। দারুণ একটা অস্বস্তিতে ছটফট করে সে। বাণী যদি এখন ওর পাশে থাকতো, তার হাতখানি ধরে যদি কাঁদতে পারতো অনুপ।

না, পুরী থেকে কালই চলে যাবে সে। বাণীকে ভুলতে পারলে মিতাকেই বা সে ভুলতে পারবে না কেন?

পরের দিন সকালে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো।

বেলা হলেও অনুপ তখন ঘুমিয়েই ছিলো। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি তাই ভোরের দিকে গাঢ় ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে ছিলো।

একটা আওয়াজ পেয়েই হয়তো ঘুমটা ভেঙ্গে গেলো। ভেজানো দরজা ঠেলে মিতা কখন ওর ঘরে ঢুকেছে, সে টেরও পায়নি।

ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলো অনুপ। খাটের পাশেই চেয়ারে বসে ছিলো মিতা। মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল অনুপ। কেঁদে-কেঁদে চোখ ছুটো লাল হয়ে উঠেছে তার—গালের উপর একটা অস্পষ্ট জলের রেখা। কতক্ষণ ধরে ও কেঁদেছে কে জানে!

—তুমি কাঁদছিলে?—মিতার দিকে তাকিয়ে অনুপ বলে ওঠে।

চোখ ছুটো অমনি জলে ভরে এলো মিতার। অনুপ কি করবে ভেবে পেল না—নির্বোধের মত খাটের উপর বসে রইলো।

মিতা হঠাৎ একটা কাণ্ড করলো। ভাববার একমুহূর্ত সময় না দিয়ে সে এগিয়ে এল অনুপের কাছে। তার ছু' হাঁটুর উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

লজ্জায়-ভয়ে অনুপ আড়ষ্ট হয়ে পড়লো। যে কোন মুহূর্তে বৌদি চা নিয়ে এসে হাজির হতে পারেন।

—কাঁদছো কেন?—অনুপ ওর কাছ থেকে সরে বসার চেষ্টা করে।

মিতাও অমনি সরে গেল। যেমন আচমকা ওর পায়ের উপর এসে কান্না শুরু করেছিল। তেমনি আকস্মিক ভাবেই পা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আঁচলে চোখের জল মুছে আবার চেয়ারে গিয়ে বসলো।

অনুপ পাথরের মূর্তির মতই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

কান্না-ধরা গলায় মিতা বললে—মা অন্য জায়গায় আমার বিয়ে ঠিক করেছেন—কথাগুলো বলতে গিয়েই ঠোঁট ছুটো কেঁপে উঠলো মিতার। কান্না-জড়ানো গলায় কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বলতে পারলো না।

ডাগর ছুটি চোখে তখন অশ্রু টলমল করছিল তার। অনুপ আর স্থির থাকতে পারলো না।

মিতার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা তুলে নিলে নিজের হাতের মধ্যে। মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি কিচ্ছু ভেব না—

মানসীকে পেয়ে আনন্দে-উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল অরবিন্দ।

ব্যাপারটা ও-তো প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারেনি। ওর সেই কথা-গুলো এখনও যেন কানে বাজছে মানসীর—তুমি সত্যি বলছো? আমার কাছে থাকবে, থাকতে পারবে?···কষ্ট হবে না?

মানসী কোন কথা বলেনি, বলতে পারেনি। শুধু মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল। আর তখুনি উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে অরবিন্দ বুকে টেনেছিল মানসীকে।

খানিকবাদেই অবশ্য ছেড়ে দিয়েছিল। ভর সন্ধ্যে, তার উপর দরজাটাও হাট করা, হঠাৎ কেউ এসে পড়লে কি লজ্জায় না পড়তে হতো।

মানসীকে ছেড়ে দিয়ে অরবিন্দ নিজেই গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

বাড়িতে সেদিন আর রান্নার হাঙ্গামা করেনি ওরা। দোকানের পুরী আলুর দম দিয়েই রাত্রের খাওয়া সেরেছে।

শোবার আগে ঐ কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেছল মানসীর। বাড়ি থেকে এককাপড়েই চলে এসেছে সে। সঙ্গে অন্য জামা-কাপড় কিছুই নিয়ে আসেনি।

—জামা-কাপড় কিছুই তো নিয়ে আসিনি।—খানিক ইতস্ততঃ করে মানসী বলেছিল।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।—অরবিন্দ হেসে বলেছিল—কথাটাকে সে কোন গুরুত্বই দিলে না। একটু পরে বললে—ঠিক আছে, কাল সকালেই ব্যবস্থা করা যাবে।—বলেই কাছে টেনে নিয়েছিল ওকে। মানসীর বাধা-আপত্তি সে গ্রাহ্যই করেনি। রাগের ভান করলেও মানসী অবশ্য তাতে সত্যি সত্যি রাগ করেনি।

রাগ করবেন কেন? ওকে সব কিছু দেবার জন্যেই তো সে তৈরি হয়ে এসেছিল। কিছুটা কষ্ট হলেও মানসী ভালোবাসার খাতিরে ওর সব আদর-সোহাগ সেদিন মুখ বুজে সহ্য করেছে। প্রথমে সব মেয়েদেরই নাকি ঐরকম একটু কষ্ট হয়।

পরের দিন অরবিন্দ সত্যিই তার কথা রেখেছিল। সকালে চা খেয়েই

বেরিয়ে পড়েছিল। বেলা দশটা নাগাদ একখানা লাল ডুরে শাড়ি, একটা লাল ব্লাউজ ও একটা সাদা সায়া নিয়ে হাজির। শাড়ির সঙ্গে দিব্যি ম্যাচ করে ব্লাউজ কিনেছে। লাল রঙটার উপরই ওর যত ঝোঁক। তবু ভালো যে শাড়ির খোলটা সাদা। ক্যাটক্যাটে লাল শাড়ি পরতে কেমন লজ্জা লাগে মানসীর।

—পছন্দ হয়েছে তো?—খাটের উপর বসে জিজ্ঞেস করেছিল অরবিন্দ।

—তোমার পছন্দই আমার পছন্দ।—মানসীও হেসে উত্তর দিয়েছিল।

—যাও, চটকরে স্নান সেরে শাড়িটা বদলে নাও।

খানিকবাদে স্নান সেরে শাড়ি-ব্লাউজ পরে অরবিন্দের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল মানসী। অরবিন্দ অমনি পকেট থেকে একটা সিঁদুরের প্যাকেট বের করে মানসীর হাতে গুঁজে দিয়েছিল। বলেছিল—লাল ডুরে শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে কপালে সিঁদুরের টিপ না পরলে মানাবে কেন? দুষ্টুমির হাসি হেসে মানসীকে কাছে টেনে নিয়ে নিজেই ওর কপালে—সিঁথিতে সিঁদুর লেপে দিয়েছিল।

—ইস্ কি করছো, কেউ দেখলে কি ভাববে।

—ভাববে, মেয়েটির নতুন বিয়ে হয়েছে।

হ্যাঁ, বিয়ের ব্যাপারটাও চটপট সেরে নিয়েছিল ওরা। সমাজে বাস করতে গেলে সমাজের রীতিনীতি মেনে না নিলে চলবে কেন।

বাড়ি ফেরার পথে সেদিন গাড়ি থামিয়ে শুধু ফুলের মালা নয়, খাবারের দোকান থেকে একঝুড়ি গরম কচুড়ি, আলুর দম ও কিছু মিষ্টি কিনে ফেললো অরবিন্দ।

খাবারের পরিমাণ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছল মানসী—এত খাবার?

—বাঃ, বিয়ের দিন, বউ দেখতে এসে সবাই শুধু মুখে ফিরে যাবে? মৃদু হেসে অরবিন্দ বলেছিল। সবাইটা কে? মানসী আশ্চর্য হয়ে ভাবে। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরবিন্দ বলে—আমরা নিজেরাই নিজেদের বিয়ের উৎসব করছি, ব্যাপারটা মন্দ নয়।

কথাটা শুনে মানসীও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। বাবার মুখ হঠাৎ মনে পড়ে গেছল। অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিয়েছিল সে।

অরবিন্দর সেটা নজর এড়ায়নি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল—বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে ?

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। অরবিন্দই আবার বলে উঠেছিল—দিন-কয়েকবাদে দুজনে গিয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করে আসা যাবে, কেমন !

—না।—মানসী রাগ দেখিয়ে বলেছিল।

অরবিন্দ অমনি হো হো করে হেসে উঠেছিল। আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে।

দেখতে দেখতে বাড়িতে পৌঁছে গেল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে কমরেডরা দল বেঁধে এসে হাজির হল। ও, এই জন্যেই এত সব খাবারের ব্যবস্থা।…এর মধ্যেই কমরেডদের খবর দেওয়া হয়েছে। বাণীও ছিল তাদের সঙ্গে।

ওদের দেখেই সবাই হৈ-হৈ করে উঠলো।—কন্‌গ্রাচুলেশন…

বাড়ির অন্য ভাড়াটে মিহিরবাবু তিনিও অরবিন্দের বন্ধুমানুষ—সস্ত্রীক এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে।

খাবারগুলি মিহিরবাবুর স্ত্রীর হাতে দিয়ে অরবিন্দ সবাইকে নিয়ে শোবার ঘরে এসে ঢুকলো।

দামী কিছু না হলেও সবার হাতেই ছোট-খাটো উপহার ছিল। নিদেনপক্ষে বই—ফুলের তোড়া তো ছিলই। না, অরবিন্দের বন্ধুদের রুচিবোধ আছে বইকি !

অরবিন্দর সংসারের হাল দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে বাণী। বাড়িতে আসবাবপত্রের বালাই ছিল না বললেই হয়—শোবার ঘরে একখানি তক্তাপোষ ছাড়া। রান্নাঘরে জিনিসপত্রের মধ্যে একটা ছোট ডেকচি, হাতা খুন্তি আর একখানি খাবার প্লেট, একটি কেতলী ও কয়েকটা কাপ ডিস অবশ্য আছে।

হ্যাঁ, চায়ের সরঞ্জামটা ঠিকই রেখেছে অরবিন্দ। চায়ের যা নেশা।…দুপুরে হঠাৎ যদি চায়ের তেষ্টা পায় তখন তো আর দোকানের চা মিলবে না! বিয়ের আগে বাইরেই অরবিন্দ বেশির ভাগ দিন হয়তো খাবার পাট সেরে নিত।

বাণী ওর সংসারের অবস্থা দেখে পরের দিনই সকালে একটা ঠেলা-গাড়ি করে কিছু আসবাবপত্র এনে হাজির করলো। অরবিন্দ তখন বাড়িতে ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই একটা বিরুদ্ধ মন্তব্য করতো।

খাবার টেবিল থেকে শুরু করে চেয়ার বেতের মোড়া এইরকম কতগুলি টুকিটাকি জিনিস। তাছাড়া, রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম তো ছিলই।

মানসীর একটু সংকোচ লাগছিল ব্যাপারটায়। সেটা অনুমান করেই হয়তো বাণী বলে উঠেছিল—এগুলো আমাদের বাড়তি জিনিস, অনর্থক গুদামজাত হয়ে পড়েছিল। তোমাদের এখানে তবু কাজে লাগবে। খরচ করে এসব আবার কিনতে যাবে কেন ?

মানসী খুশিই হ'ল কথাটা শুনে। তাছাড়া বাণী তো ওদের বাইরের লোক নয়, ওদের জিনিস ব্যবহার করতেও কোন লজ্জার কারণ নেই।

যাবার আগে বাণী তার থলি থেকে একটা প্যাকেট বের করে মানসীর হাতে দিয়ে বললে—অত অল্প নোটিশে কাল প্রেজেণ্টেশন্ কেনার সময় পাইনি ; তাই আজ নিয়ে এলাম।

প্যাকেটটা খুলে মানসী অবাক। চমৎকার একটা বেডকভার আর একখানি বুটি দেওয়া টাঙ্গাইল-এর শাড়ি। শাড়ির খোলটা বাসন্তীরঙের।

খুশি হয়ে জিনিসগুলি দেখছিল মানসী। বাণী হঠাৎ বলে উঠল—বিয়েতে সাদা খোলের শাড়ি দিতে নেই—এই রঙটাই তোমাকে ভালো মানাবে !···ওই যা, আসল জিনিসটাই আন্‌তে ভুলে গেছি—সিঁদুর আর আলতা।—বলে মুখ টিপে হাসল একটু। বলতে গেলে মানসীর ঘর সংসার বাণীদিই গুছিয়ে দিয়ে গেল।

যাবার আগে খুশি-খুশি মুখে বললে—এবার চলি, কেমন ? গিয়েই আবার অফিসে ছুটতে হবে।···দরকার পড়লেই আমাকে খবর দিও ঘর-সংসারের ব্যাপারে তুমি তো একেবারেই আনাড়ী। বাণীদি আবার মিষ্টি করে হাসলো একটু। স্নেহের হাসি। কৃতজ্ঞতায় স্নেহে মানসীর চোখেও তখন জল এসে গেছে।

চাকরিটাও জুটে গেল হঠাৎ। চাকরির খবরটাও বাণীদি দিয়েছিল।

ভালো হোক, মন্দ হোক একটা চাকরি তো চাই-ই। তা নইলে সংসার চলবে কি ভাবে। যা আঁকড়াগণ্ডার দিন। অরবিন্দর ঐ টাকায় বড় জোর দুবেলা দুটো ভাত-ডাল জুটতে পারে।...খাওয়া খরচ ছাড়াও তো মানুষের খরচ আছে! মানসী মহাভাবনায় পড়ে গেছল।

বাড়ি থেকে চলে আসার আগে গায়ের গয়নাগুলোও সব খুলে মায়ের দেরাজে রেখে এসেছে সে। একরতি সোনাও গায়ে নেই। গা-ভর্তি গয়না নিয়ে অরবিন্দর কাছে আসতে সেদিন সত্যিই সংকোচ লেগেছিল। সোনাদানা, ধনঐশ্বর্য সম্পর্কে ওঁর অদ্ভুত একটা বিদ্বেষ আছে।

হাতের বালা দুটো আর গলার হারগাছি খুলতে অবশ্য ইচ্ছে হয়নি, তবু ঝোঁকের মাথায় খুলে ফেলেছে। না, সঙ্গে ঐশ্বর্যের কোন ছাপ নিয়ে অরবিন্দর কাছে যাবে না সে—ভিখারিণীর বেশেই যাবে। গায়ে গয়না দেখলেই হয়তো অরবিন্দ আবার 'রাজকন্যে' বলে ঠাট্টা করবে।

চাকরিটা পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেল মানসী। স্কুলের চাকরি, শিক্ষার লাইনই পছন্দ করে সে। স্কুলটা অবশ্য একটু দূরে—সেই ভবানীপুর অঞ্চলে। তা হক, তবু তো স্কুলের চাকরি।

ইনটারভিয়ু দেবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরিতে বহাল হয়ে গেল মানসী।

খবরটা শুনে অরবিন্দ ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। বলেছে—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

—যাও।—মানসী ওর পিঠে একটা তাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

—চাকরি পেয়ে গায়ের জোরও বেড়ে গেছে দেখছি।—অরবিন্দ টিপ্পনি কেটে বলেছে।

মাস দুয়েক বাদে। মর্নিংস্কুল চলছে তখন।

স্কুল থেকে ফেরার পথে গড়িয়াহাটা বাজারের কাছে হঠাৎ ভজুয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মানসীর। বেলা তখন দশটা বেজে গেছে।

বাজার নিয়ে ফিরছিল ভজুয়া। মানসীকে দেখে আঁতকে উঠল যেন। বললে—দিদিমণি, একি চেহারা করেছো গো।

—কেন, কি এমন খারাপ হয়েছে ?—মানসী বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলে।

—খারাপ নয় তো কি ? চেনাই যায় না।—একটু ঢোক গিলে বললে —তারপর এই দুপুর রোদে বইপত্তর নিয়ে কোথা থেকে আসছো ?

—স্কুল থেকে—চাকরি করছি।

—তাই বলো। তাই চেহারাটার এই হাল হয়েছে।—ভজুয়ার গলায় আক্ষেপের সুর বাজলো : শেষকালে তোমাকে চাকরি করে খেতে হচ্ছে দিদিমণি ?······কর্তাবাবুর কানে গেলে—

কাঁদ-কাঁদ স্বর ভজুয়ার। মনটা খারাপ হয়ে গেল মানসীর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—তা কর্তাবাবুর কানে কথাটা তোলার দরকার কি ?—আচমকা ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—তারপর তোমরা সবাই ভালো আছ তো ?

—ভালো আর কি করে থাকি বল ? তোমরা দু'ভাই-বোন মিলে যা কাণ্ড করলে !—

কথাটা শেষ না করেই ভজুয়া চুপ করে যায়।

—বাবা কেমন আছেন ?—ইচ্ছে করেই মায়ের কথাটা তুললো না মানসী।

মুখ কালো করে ভজুয়া বললে—কর্তাবাবুর মুখের দিকে তাকানো যায় না। কর্তামা তো রাগ করে ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে বসে আছেন। কর্তাবাবুর উপরই তাঁর যত রাগ।···তা তুমিও তো বাপকে একেবারে ভুলে গেছ দিদিমণি !

কথাটা শুনে বুকের ভেতর কেমন মোচড় দিয়ে উঠল মানসীর। মুখে কথা যোগাল না। খানিক পরে বললে—বাপকে কি কেউ ভুলতে পারে ? নিজের কানেও গলাটা কেমন ভাঙ্গাভাঙ্গা লাগলো।

ভজুয়াও বুঝি অভিভূত হয়ে পড়লো, বললে—সে কি আমি জানি না ! তোমাকে সেই এতটুকু বয়স থেকে দেখছি,···তোমার মন আমি জানি না !—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—তা একদিন গিয়ে দেখে এস কর্তাবাবুকে—তবে হ্যাঁ, ঐ অরবিন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যেও না খবরদার। ওঁকে দেখলেই কর্তাবাবুর ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যেতে পারে—চটে আগুন হয়ে আছেন ওঁর উপর।

মানসীও চটে যায় কথাটা শুনে। বলে—না, আমার সময় নেই বার। স্কুল আছে, বাড়ির কাজ-কর্ম আছে—

—রবিবার তো স্কুল নেই। ছুটির দিন বেছেই না হয় যেও।

—দেখা যাবে।—বলেই মানসী হাঁটতে শুরু করলো।

ভজুয়াও অমনি উলটো রাস্তা ধরলো। বাজার নিয়ে ওকে তাড়াতাড়ি ড়ি পৌঁছুতে হবে।

মানসীও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল।

কাপড়-জামা বদলে রান্নাঘরে এসে ঢুকলো। অরবিন্দ তখনও ফিরে াসেনি। এখুনি এসে যাবে মনে করেই সদর দরজাটা বন্ধ করলো না।

উনুনে রান্না চড়িয়ে বাবার কথাই ভাবছিল মানসী। ঠাকুর-চাকর য়েই এখন ওঁর সংসার। মায়ের জেদটা বড় বেশি। বাবাকে একলা ন্লে ছোটমামার বাড়িতে গিয়ে ওঁর বসে থাকা কি ঠিক হয়েছে? মা াছে থাকলে হয়তো বাবার ব্লাডপ্রেসারটা স্বাভাবিকই থাকতো।

মানসীর যদি উপায় থাকতো যাবার। ইচ্ছে করলেই অবশ্য যেতে রে সে, বাধা দেবার কেউ নেই। এসব ব্যাপারে ভারী উদার অরবিন্দ, ারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দেয় না। কিন্তু অরবিন্দর যেখানে কোন ম্মান নেই, সেখানে ও যায় কি করে?

না, মানসীর পক্ষে কখনই সম্ভব নয় ওখানে যাওয়া। তাছাড়া ওর বা একবারও তো ওকে যেতে লেখেননি। ঠিকানা জানেন না তা তো ।। বাণীর কাছ থেকেই ঠিকানা পেয়ে গেছেন।···বাণীও বেশ অসন্তুষ্ট য়ে আছে ওঁর উপর। ওদের বাড়িতে এসে মানসীকে উপদেশ দিয়ে াছে—কক্ষনো যাবি না ও বাড়িতে—কাকাবাবু নিজে যেচে মেয়ে-ামাইকে নিতে না এলে কিছুতেই যাবি না।···অরবিন্দ আমাদের কি ফলনা ছেলে।···

দোরগোড়ায় বাণীকে দেখে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল মানসীর।

—অরবিন্দ ফেরেনি এখনও?—রান্নাঘরে ঢুকে বাণী জিজ্ঞেস করে।

বাণীর কথা শেষ হতে না হতেই আনন্দে টগবগ করতে করতে রবিন্দ এসে ঘরে ঢুকলো। ওকে দেখেই বাণী মুখ টিপে হাসলো কটু। বললে—অনেকদিন বাঁচবে, তোমার কথাই হচ্ছিল।

—আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল বুঝি ?—অরবিন্দ বলে।

—সাম্যবাদীরা ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করে না এটাও ভুলে গেছ ?—বা সঙ্গে সঙ্গেই টিপ্পনী কাটে।

—পাশে সর্বক্ষণ তোমাদের মত মনে করিয়ে দেবার লোক থাক ভুলে যাবো না ? একটু চুপ করে থেকে অরবিন্দ বলে—সত্যি ক্রম কেমন যেন পরনির্ভর হয়ে পড়ছি—দোষটা কিন্তু তোমাদেরই।—ব আড়চোখে মানসীর দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে সে।

মানসী চুপ করে থাকেনি। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা উত্তর দেয়।—নিজে অকর্মণ্য সেটা স্বীকার করতে চাওনা, দোষটা তাই অন্যের উপর চাপা চাও।

—ঠিক বলেছ।—বাণী হেসে সমর্থন করে মানসীকে। তার একখানি পাঁচ টাকার নোট অরবিন্দর হাতে দিয়ে বলে—যাও, দো গিয়ে মিষ্টি নিয়ে এসো। মিষ্টি না খেয়ে আজ উঠছি না।

অরবিন্দ বাধ্য ছেলের মতই ছুটে বেরিয়ে গেল মিষ্টি আনতে—এত সংকোচ করলো না।

মানসীও কোন প্রতিবাদ করতে পারলো না। বাণীদির সঙ্গে স ওদের কোন formality—লৌকিকতার সম্পর্ক নেই।

দিন পনের বাদে। বিকেলবেলা। রান্নাঘরে জলখাবার তৈ করছিল মানসী। অরবিন্দ তখনও বাড়ি ফেরেনি। হঠাৎ ভজুয়া এ হাজির। মানসীদের বাড়ির ঠিকানা ও যোগাড় করলো কার ক থেকে ? বাণীর কাছ থেকে নিশ্চয়। বারীণকাকার ওখানে দু যেতে না পারলেই তো ও হাঁপিয়ে ওঠে। বারীণকাকাকে কে ভালোবাসে।

রান্নাঘরের দোরগোড়ায় ভজুয়াকে দেখে মানসী অবাক হয়ে গে দিদিমণিকে পরোটা ভাজতে দেখে ভজুয়াও কম আশ্চর্য হলো না।—ব দিদিমণি তুমি পরোটা ভাজছো ?

মানসী ওকথার ধার দিয়েও গেল না। তাওয়া নামিয়ে রেখে ভজু সামনে এগিয়ে এল। বললে—তুমি হঠাৎ কি মনে করে ?

—তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?—ভজুয়ার গলায় অভিমানের ্র

মানসীর একটু দুঃখ হয় বইকি। মুখে হাসি এনে বলে—চল, বসবে ল। বাইরের কেউ এলে অরবিন্দ ঘরের লাগোয়া ফালি বারান্দাতেই সতে দেয়। মাদুরের ওপর বসেই তাদের সঙ্গে কথা বলে। বারান্দায় চয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা নেই। বারান্দায় খান দুয়েক চেয়ার রাখা একান্ত রকার। কিন্তু অরবিন্দর এসব দিকে কোন খেয়াল নেই। সামনের াসে মাইনে পেয়েই মানসী চেয়ারের ব্যবস্থা করবে। অরবিন্দকে আগে থকে কিছু বলে দরকার নেই। কথাটা শুনলেই তো হেসে উঠবে— র্জোয়া বলে হয়তো ঠাট্টাই করবে।

ভজুয়া বারান্দাতেই বসে পড়ে। মাদুরটা পর্যন্ত পাততে দিলে না— া, মাদুরের আবার দরকার কি?

মানসীর মুখের দিকে নির্বাক হয়ে খানিক তাকিয়ে থেকে বললে— কটা কথা বলবো দিদিমণি, রাগ করবে না তো?

—বল।

—তোমার চেহারা দেখে সেদিন বড্ড দুঃখ হয়েছিল। কর্তাবাবুকে াই তোমার কথা বলে ফেলেছিলাম।

মানসী চুপ করে ওর কথা শোনে।

ভজুয়া বলে—সংসার চলে না বলেই তো তুমি ইস্কুলে চাকরি করতে লগেছ—কিন্তু এত খাটাখাটুনি তোমার শরীলে সহ্য হবে কেন?

—এসব কথা তুমি বাবাকে বলতে গেছ কেন? মানসীর কণ্ঠে বিরক্ত র।

—ঐ তো তুমি রাগ করছো। সবটা আগে শুনে নাও। তোমার রীলের কথা শুনে কর্তাবাবুর চোখ ছলছল করে উঠল।...আমার হাতে াই লোটগুলি গুঁজে দিয়ে বললেন—যা, তোর দিদিমণিকে দিয়ে আয় -কিন্তু খবরদার আমার নাম করিস না। বলবি, ওর মা পাঠিয়ে দিয়েছেন

ভজুয়া একতাড়া নোট মানসীর দিকে এগিয়ে ধরে।—নাও, ধর।

—টাকার দরকার নেই আমার।—মানসী গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়।

—না নিলে কর্তাবাবু মনে খুব দুঃখু পাবেন।

—বাজে বকো না।—ভজুয়াকে ধমক দেয় মানসী।

—সত্যিই নেবে না?—হতাশভাবে ভজুয়া বলে।

—না।

খানিক চুপ করে থেকে নোটগুলি গাঁটে বেঁধে নিয়ে ভজুয়া বলে—তা হলে উঠি আজ?

—চা খেয়ে যাও।—বলেই মানসী রান্নাঘরে গিয়ে চা করতে বসে।

ভজুয়া মাথায় হাত দিয়ে বারান্দাতেই বসে থাকে। চা-পরোটা নিয়ে মানসী যখন বারান্দাতে ফিরে এল, ভজুয়া তখনও মাথায় হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে গভীরভাবে। ওর দুঃখী দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে মানসীর কেমন মায়া লাগলো।

চা-খাবার ওর সামনে রেখে একটা মোড়া নিয়ে কাছে এগিয়ে বসে বললো।—খাও।

ভজুয়া তখনও কি যেন ভেবে চলেছে।

মানসী আবার তাড়া দিলে—খাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে যেন জেগে উঠল ভজুয়া।—ও, চা এনেছ?—বলেই চায়ে কাপ হাতে তুলে নিলে সে।

চায়ে চুমুক দিয়ে খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বললে—পরোটা আবার কেন দিদিমণি?

—আমি নিজে তৈরী করেছি, কেমন হল খেয়ে বলবে তো! ভজুয়াকে খুশি করার জন্যে মানসী বলে।

—তুমি নিজেই রান্না করো বুঝি?

—আমি ছাড়া কে করবে?···গরীব মানুষ, ঠাকুর-চাকর রাখা কি আমাদের সামর্থ্য আছে?—মানসী হাসতে হাসতে বললে কথাগুলো কিন্তু মুখখানা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল ভজুয়ার—দারুণ একটা দুঃখের সংবাদ শুনলো যেন!

চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রেখে দুঃখ-স্নেহ ভরা চোখে ভজুয়া তাকিয়ে রইল মানসীর মুখের দিকে।

—ওকি, খাও।

পরোটার প্লেটটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলে ভজুয়া। খেতে-খেতে বললে—খুব ভালো হয়েছে। মুখে দিতেই গলে গেল—তুমি তৈরী করেছ, বিশ্বাসই হচ্ছে না।

—আমাকে এত অকর্মণ্য মনে করছো কেন ভাই? আমি এখন সব কাজই করতে শিখে গেছি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।—বলেই ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভজুয়া। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল মানসীর। কাজ করার মধ্যে এত শোকের কি দেখলো ও? তাছাড়া, কারো অনুকম্পা মানসী আজকাল আর বরদাস্ত করতে পারে না। একটু চুপ করে থেকে বললে—কাজ করতে আমার ভালোই লাগে।

সত্যিই তো মেয়েরা আজকাল ঘরে-বাইরে সমানে পরিশ্রম করছে, পুরুষের সঙ্গে। এর মধ্যে দুঃখ-অপমানের কি আছে! বরং প্যারাসাইটের মত ঘরে নিষ্কর্মা হয়ে অন্যের অন্ন ধ্বংস করাই অসম্মানের।

খালি কাপ ও প্লেট হাতে নিয়ে ভজুয়া উঠোনে কলতলায় নেমে গেল। বাসনগুলো ধুয়ে নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে রেখে এল।

কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে-মুছতে মানসীকে লক্ষ্য করে বললে—তাহলে আমি এখন যাই, দিদিমণি? একটু ইতস্ততঃ করে বললে—টাকাটা রেখে দিলে কিন্তু ভালো করতে।

—না।—মানসী বেশ কড়াভাবেই উত্তর দিলে।

—তুমি যা ভালো বোঝো।—বলেই ভজুয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। একটু চুপ করে থেকে বললে—কর্তাবাবুর উপর আর অভিমান করে থেকো না, দিদিমণি, একদিন গিয়ে অন্ততঃ দেখা দিয়ে এসো।

—বলেই আস্তে উঠোনে নেমে গেল সে।

উঠোন পেরিয়ে সোজা রাস্তায় গিয়ে নামলো। পিছন ফিরে আর একবার তাকিয়েও দেখলো না।

মানসীর ব্যবহারে ভজুয়া নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছে। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মানসীর চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ কেমন ঝাপসা হয়ে এল।

একদিন একদিন করে পুরো একটা সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, তবু অনুপের দেখা নেই। বাণী চিন্তিত হয়ে পড়লো ওর জন্যে। নিশ্চয়ই বেশি কোন অসুখ-বিসুখ করেছে। না, কালই ওর একটা খবর নিতে হবে।

পরের দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই অনুপের কথা মনে পড়লো বাণীর। ব্রেকফাষ্ট সেরেই বাণীর বাবা বেরিয়ে গেলেন—সাক্ষী গোপাল যাবেন। ধর্মপ্রবণ মন না হলেও ধর্মের পীঠস্থান সম্বন্ধে আশ্চর্য একটা কৌতূহল আছে বাণীর বাবার। তীর্থস্থানগুলির একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে বৈকি!

ইচ্ছে করেই বাণী ওঁর সঙ্গে গেল না।

অনুপের আস্তানা ওঁদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। পুরীতে এসে পাণ্ডার সঙ্গে ওরা একদিন ঐ অঞ্চলে ঘুরে এসেছে। অনুপের ঠিকানা তো নোটবুকে লেখাই আছে। ঠিকানা জানলে বাড়ি খুঁজে নেওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

সাইকেল রিক্সা করে বাণী রওনা হল অনুপের বাড়ির উদ্দেশে।

জগন্নাথ মন্দির ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে এসে রিক্সা থেকে নেমে পড়লো সে। রিক্সাওয়ালাই ওকে দেখিয়ে দিলে বাড়িটা।

মাঝারি রকমের একতলা হলদে রঙের বাড়ি। বারান্দায় বসে হু'টি ছেলে-মেয়ে মুড়ি চিবুচ্ছিল।

মানুষের সাড়া পেয়ে আধা-বয়সী এক মহিলা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। মহিলার কপালে বড় একখানা বাতাসার মত সিঁদুরের টিপ তাঁর এয়োত্ব ঘোষণা করছিল সগৌরবে।

বাণীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে মহিলাটি বললেন—কাকে চাই?

—অনুপ, অনুবাবু থাকেন এখানে?

কৌতুকের হাসি হেসে মহিলা উত্তর দিলেন—থাকেন, কিন্তু আপাততঃ নেই।

সামান্য ইতস্ততঃ করে বাণী জিজ্ঞেস করে—কোথায় গেছেন, বলতে পারেন?

—শ্বশুরবাড়ি।—মহিলা সশব্দে হেসে উঠলেন: নতুন শ্বশুরবাড়ির টান নিজের বাড়ির চেয়েও বেশি কিনা!

বাণী হতভম্ব হয়ে গেল। অনুপ শ্বশুরবাড়ি গেছে, বলে কি!

—কবে বিয়ে করলো?

—তা দিন পনেরো হবে।—হাসি থামিয়ে মহিলাটি উত্তর দিলেন: বউকে বরণ করে আমিই তো ঘরে তুললাম। মা নেই, কে আর আনন্দ করবে বউ নিয়ে!—একটু চুপ করে থেকে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—অনুপ তোমার কেউ হয় নাকি?

—না!—গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়ে বাণী চুপ করে রইলো।

—একসঙ্গে পড়তে বুঝি?—মহিলা আবার প্রশ্ন করেন। অন্যের ব্যাপারে মহিলাদের সত্যি বড় বেশি ঔৎসুক্য।

ওঁর ঔৎসুক্য দেখে বাণীর রাগ ধরে গেল।—হ্যাঁ।—সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে চলে আসছিল। মহিলাটি বাধা দিলেন। বললেন—এসেই চলে যাবে কেন ভাই? একটু বসে যাও। বিদেশে বাঙালীর মুখ দেখলেও ভালো লাগে। বল তো অনুপকে খবর দিতে পারি, শ্বশুরবাড়ি তো দূরে নয়।

—না, থাক, আর একদিন আসা যাবে।

—চা না খেয়ে যেতে পারবে না।—মহিলা হাত ধরে অনুনয় করলেন।

বাধ্য হয়েই বসতে হলো। চা তৈরীই ছিল হয়তো। দু'মিনিটের মধ্যে চা নিয়ে ফিরে এলেন মহিলা।

বাণীর মুখোমুখি হয়ে বসে পরম আন্তরিকতার সুরে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নামটি বললে না তো?

—বাণী। চায়ে চুমুক দিয়ে বাণী বললে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মহিলা বললেন—তা বিয়েটা অনুপ ভালোই করেছে। সোনার প্রতিমার মত চেহারা। অমন রূপ দেখলে মহাদেবেরও ধ্যানভঙ্গ হতো।

বাণী হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। উত্তর দিতে ভুলে গেল। কাপের চা টুকু একচুমুকে নিঃশেষ করে উঠে পড়লো সে।—চলি।

অন্যমনস্কভাবেই রাস্তায় এসে নামলো বাণী। ধুলোয়-ধুলোয় পুরীর রাস্তা তখন ধূসর হয়ে উঠেছে।

মাথার উপরে কড়া রোদ। রিক্সায় চেপে বাড়ির দিকে রওনা হল বাণী। রাস্তায় যানবাহন, দোকানপাট, লোকজন কিছুই নজরে পড়লো না তার। খেয়াল হল যখন বাড়ির দরজায় রিক্সাটা এসে থামলো।

ভাড়া চুকিয়ে বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকলো বাণী। কোনরকমে খাওয়ার পাট চুকিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। চোখ বুজে শুয়ে থাকলেও ঘুম এল না কিছুতেই। অনুপ শেষ পর্যন্ত একটা বিয়ে করে বসলো। বিয়ের খবরটা পর্যন্ত জানালো না! বাণীকে তাহলে ও একেবারেই ভুলে গেছে।

নিজের অজান্তেই বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বাণীর না, একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। বাণীর সঙ্গে জীবনটা জড়িয়ে ফেললে হয়তো দুঃখই পেতো সে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেলের আলোও ম্লান হয়ে এল তারপর একসময় সন্ধ্যে নামলো।

বাণীর বাবা তখনও ফিরে আসেননি। একলা বিছানাতেই চুপচাপ পড়ে রইলো বাণী। উঠে ঘরের আলোটা জ্বালাতেও ইচ্ছে করে না। অদ্ভুত একটা ইনারসিয়া-আলসেমিতে যেন আজ পেয়ে বসেছে ওকে।

পরের দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেবি হয়ে গেল বাণীর। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। বাণীর বাবা কখন উঠে চা খেয়ে বেরিয়ে গেছেন, সে টেরও পায়নি। ওকে ঘুমুতে দেখেই হয়তো ডাকেন নি।

ভেজানো দরজায় টোকা পড়তেই পাতলা ঘুমের আমেজ কেটে গেল বাণীর। ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলো সে। গায়ের কাপড় সামলে নিয়ে বললে—এসো।

ভেবেছিল, বিশ্বনাথ বুঝি চা নিয়ে এসেছে। পুরীতে এসেই রান্না-বান্নার জন্যে বিশ্বনাথকে বহাল করেছে বাণী। রামলালকে কলকাতায় বাড়ির দেখাশুনার জন্য রেখে এসেছে।

কিন্তু বিশ্বনাথ নয়, ভেজানো দরজা ঠেলে অনুপ ঘরে ঢুকলো। ছুটে গিয়ে তখুনি ওর হাতটা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু বাণী সামলে

নিলে নিজেকে। খাটের পাশে চেয়ারটা দেখিয়ে বললে—বোস।… কি ছেলে বাবা, এতদিন বাদে আসার সময় হল।

চেয়ারে বসে বাণীর দিকে অনুপ তাকিয়ে রইলো প্রাণখোলা-আলো করা চোখে। কলকাতায় থাকতে ঠিক এমনভাবেই তাকাতো সে। এতটুকু পরিবর্তন হয়নি ওর। চেহারাটাও ঠিক তেমনি আছে—সামান্য একটু মোটা হয়েছে, এই যা। তাতে কিন্তু ভালোই লাগছে ওকে।

—চায়ের কথা বলে আসি।—অনুপকে বসিয়ে রেখে বাণী রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে শোবার ঘরে ফিরে এল আবার। বিশ্বনাথ ততক্ষণে চা রেখে চলে গেছে।

চা খেতে খেতে অনেক কথাই হলো। ওর কাকার কথা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি পর্যন্ত।

দেশের রাজনীতি আলোচনা করতে করতে বাণী জিজ্ঞেস করলে—কলকাতায় তাহলে আর ফিরছো না?

– পাগল।—বাণী যেন একটা আজগুবি কথা বলে ফেলেছে এইভাবে হেসে উঠল অনুপ ঃ নিজের প্রভিন্স ছেড়ে বাঙালী থাকতে পারে কখনো? একটু চুপ করে থেকে বলে—একটা চাকরি পেলেই চলে যাবো।

আজেবাজে কত কথাই তো হল। বিয়ের প্রসঙ্গটা হয়তো ইচ্ছে করেই তুললো না অনুপ।

কথাটা বাণী নিজেই তুললো শেষ পর্যন্ত।—বউকে নিয়ে এলে না কেন?

কানদুটো সামান্য আরক্ত হয়ে উঠলো অনুপের। রাগলে বা লজ্জা পেলে চিরদিনই ওর ওরকম হয়ে থাকে।

ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বাণী হাসির ছলে বললে—শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী।

অনুপ চট করে কোন উত্তর দিলে না। একটু পরে বললে—গিয়েই দেখে এসো না।

অনুপ সলজ্জভাবে মুখ নীচু করেছিল।

—নামটি বললে না তো?—বাণী জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ।

—মিতা। নীচু গলায় একরকম ফিসফিস করেই নামটি উচ্চারণ করলো অনুপ।

যাবার আগে বাণীকে ওদের বাড়িতে বেড়াতে যাবার জন্যে অনুরোধ করে গেল সে। সরল উজ্জ্বল দৃষ্টি ওর মুখের উপর রেখে বললে—তুমি না গেলে মিতা খুব দুঃখ পাবে।

মিতাকেও আমার কথা বলেছো তাহলে ?

—বলবো না ?···তোমার ঋণ আমি জীবনেও—শুধু আমি নই একদিক থেকে মিতাও তোমার কাছে ঋণী।—কথাটা অসমাপ্ত রেখেই থেমে যায় অনুপ।

বাণী ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। অনুপ ওকে ভুলে যায়নি, যেতে পারে না।

বাণী সত্যিই অসাধারণ। ওকে যত দেখে ততই আশ্চর্য হয়ে যায় অনুপ। কত সহজভাবে সে গ্রহণ করলো অনুপকে। বিয়ে করেছে বলে মনে এতটুকু উষ্মা নেই ওর বিরুদ্ধে। ঠিক আগের মতই আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো অনুপকে দেখে। একমুখ হাসি নিয়ে বললে—কি ছেলে বাবা। এতদিন বাদে আসার সময় হলো।

অনুপ কোন উত্তর খুঁজে পেল না। একটু হাসলো শুধু।

—বউকে নিয়ে এলে না কেন ?—তেমনই হেসেই বাণী জিজ্ঞেস করলে অনুপকে : খুব সুন্দরী শুনলাম।

—নিজে গিয়েই দেখে এসো না।—অনুপ মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছে। সংকোচটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে।

—ঠিক আছে, নিজেই যাবো। কলকাতায় ফেরার আগে তোমার বউ, ঘর-সংসার নিশ্চয়ই দেখে যাবো।

হ্যাঁ, বাণী তার কথা রেখেছিল।···

রবিবার সকালের দিকে ওদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল—আগে জানিয়ে যায়নি। ও আসবে জানলে অনুপ বাড়ি থেকে বের হত না।···

ছুটির দিন বলেই ব্রেকফাষ্ট সেরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। এদিক-ওদিক খানিকটা ঘোরাঘুরি করে ফেরার পথে বাণীদের ওখানে

গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু গিয়ে বাণীর দেখা মিললো না। বাপ-মেয়ে দুজনেই বেরিয়ে গেছেন বাড়ি থেকে।

অনুপ তখন করে কি? এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে করবে কি? মিতা তো এখন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। ওর সঙ্গে বসে গল্প করাও চলবে না। তার চেয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে বসা যাক। নোটবুকটা তো সঙ্গেই আছে। গতকাল রাত্রে যে আইডিয়াটা মাথায় এসেছে, সমুদ্রের পারে বসে তাই নিয়েই নয় একটা কবিতা লিখবে। বিকেল নাগাদ ওঁরা নিশ্চয়ই বাড়িতে ফিরে আসবেন।

বেলা তখন এগারটা বেজে গেছে। অনুপ উঠে পড়লো। না, এবার ঘরে ফেরা যাক। বেশি দেরি করলে মিতা হয়তো রাগ করে কথাই বলবে না। এমনিতে ভারী মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু দারুণ অভিমানী। মনে হিংসা নেই। আছে অভিমান। বিশেষ করে বাণীর কথাটা শোনার পর থেকে অভিমান আরো বেড়ে গেছে। কথায় কথায় চোখে জল আসে। বলে—আমাকে নিয়ে মন ভরবে কেন, আমি তো তোমার বাণীর মত বিদুষী নই।...

মিতার রান্নাবান্না নিশ্চয় এতক্ষণে সারা হয়ে গেছে।

বাড়িতে ফিরে অনুপ নিঃশব্দে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। ঢুকেই বিস্ময়ের এক চমক। বাণী! কখন এল। দুটিতে তক্তাপোশের উপর বসে মশগুল হয়ে গল্প করছে—কতকালের যেন পরিচিত ওরা।

অনুপকে দেখে দুজনেই হেসে ফেললো।

বাণীই প্রথম কথা বললে—কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, তা বাবুর দেখাই নেই।

অনুপ সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। সে ভাবটা সামলে নিয়ে উত্তর দিলে—তুমি আজ আসবে, সেদিন বলনি তো, তাহলে তো বাড়িতেই থাকতাম।

—সেদিন ঠিক করিনি। আজ সকালে উঠেই তোমাদের কথা মনে পড়লো। ভাবলাম, যাই, একবার শ্রীমতীর সঙ্গে আলাপ করে আসি।

—আলাপ তো বেশ জমে উঠেছে দেখছি।—অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে অনুপ বলে।

মিতা আচমকা একলাফে নেমে পড়লো খাট থেকে। বললে—তোমরা গল্প কর, আমি ততক্ষণে খাবার জায়গা করে ফেলি।—বলেই ব্যস্ততার সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

বাণীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিল অনুপ। নীরবতা ভেঙ্গে বাণী হঠাৎ বলে উঠল—তুমি সত্যি ভাগ্যবান—মিতার মত বউ পেয়েছ। —মিষ্টি হেসে বললে—শুধু চেহারা নয়, মনটিও ওর বড় সুন্দর।... আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না। আজ তিনজনে একসঙ্গে বসে নাকি খেতে হবে।

অনুপ মুখ নীচু করেছিল। বাণী বললে—রান্নাঘরে নিজের কাছে আমাকে বসিয়ে রেখে কতরকম যে রান্না করলো।

—তা সম্মানিত অতিথিকে আপ্যায়িত করতে হবে তো!—যা মুখে আসে তাই বলে ফেললো অনুপ।

কথাটা শুনেই বাণী একটু দুঃখের হাসি হাসলো। বললে—তা যা বলেছ, তোমাদের সংসারে আমি অতিথি ছাড়া কি!

বাণীর কথা শেষ হতে না হতেই মিতা চেঁচিয়ে ডাক দিলে।—কই, তোমরা এসো।

—চলো। বাণীকে নিয়ে অনুপ রান্নাঘরে এসে ঢুকলো।

চেয়ার-টেবিল নয়, মেঝেয় আসন পেতে খাবার জায়গা করা হয়েছে। ছোট হলেও রান্নাঘরটি ছিমছাম—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

পাশাপাশি তিনজনে খেতে বসলো।

মিতা একহাতে সংসারের সব কাজ করে। একটা ঠিকা ঝি পর্যন্ত নেই। গৃহিণীপনায় এর মধ্যেই ওস্তাদ হয়ে উঠেছে সে। ওর রান্না খেয়ে দারুণ খুশি বাণী।—এমন রান্না তুমি শিখলে কোত্থেকে?

—অবাক হয়ে বাণী জিজ্ঞেস করলো মিতাকে।

—কেন খারাপ হয়েছে বুঝি? ভয়ে-ভয়ে মিতা বলে।

—খুব ভালো হয়েছে।...আমি শত চেষ্টা করলেও এত ভালো রাঁধতে পারতাম না।

—বেশি বিনয় ক'র না।—অনুপ বলে বাণীকে লক্ষ্য করে: তোমার রান্না যেন আমি খাইনি কোনদিন।

মিতার মুখে তখন ভাত। হাসতে গিয়ে বেচারা প্রায় বিষম খাচ্ছিল আর কি! সামলে নিয়ে বললে—এখন সুস্থ হয়ে খাও তো। তর্কটা না হয় পরেই কর।

তর্ক মুলতুবী রাখলেও কথা থামলো না।

—লাউঘণ্টটা সত্যি অপূর্ব হয়েছে।—বাণী বলে খেতে খেতে।

—আগে লাউঘণ্টটা রাঁধতে জানতাম না।—মিতা খুশি হয়ে উত্তর দেয়ঃ

বিমলবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে শিখে নিয়েছি—অনুপকে লক্ষ্য করে বলে—শুকতো আর লাউঘণ্ট খেতে ও ভীষণ ভালোবাসে।

বাণীর চোখে-মুখে কৌতুকের হাসি খেলে যায়। বলে—তাহলে তো শিখতেই হবে—কর্তা যখন খেতে ভালোবাসেন। কথায় বলে—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

মিতা সত্যি বড় সরল প্রকৃতির মেয়ে—যা মনে আসে বলে ফেলে।

খাবার পাট চুকে গেলেই বাণী যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে—এবার পালাতে হবে।…বাবা নিশ্চয় পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন।

—চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।—অনুপ প্রস্তাব করে।

—কোন প্রয়োজন নেই—আমি একলাই যেত পারবো—বাণী উত্তর দেয়। মিতাকে সাক্ষী মেনে বলে—দেখেছ আমাদের ওরা এখনও অবলা বলে মনে করে—আমি যেন একলা যেতে পারবো না।

—তাহলে তুমি বোস, আমি রিক্সা ডেকে নিয়ে আসি বলেই অনুপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

পাঁচমিনিটের মধ্যেই রিক্সা নিয়ে হাজির হয় সে।

বাণীর সঙ্গে সদর দরজা অবধি ওরা দুজনেই এগিয়ে এসেছিল। রিক্সাটা ছেড়ে দিলেও দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। আশ্চর্য ব্যাপার, বাণী একবারও ফিরে তাকালোনা ওদের দিকে।

বাণী একলাই চলে গেল। অনুপ সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিয়েছে সে।

ইচ্ছে থাকলেও বাণীর সঙ্গে তাই রিক্সায় উঠে বসতে পারলো না অনুপ। ওর মতের বিরুদ্ধে কিছু করার উপায় নেই। তাছাড়া মিতারও তাতে হয়তো অভিমান হতো। সপ্তাহে মাত্র একটি দিনের ছুটি। সারা সপ্তাহ ও বেচারীকে তো একলাই কাটাতে হয় দুপুরটা।

কিন্তু বাণীও তো আর রোজ রোজ ওদের এখানে বেড়াতে আসছে না। সামনের সপ্তাহেই তো ওরা আবার চলে যাচ্ছে কলকাতায় কথাটা মনে হলেই বুকের ভেতর কেমন যেন হু হু করে ওঠে অনুপের অথচ একথা কাউকে বলার উপায় নেই। বাণীকেও নয়। শুনলে হয়তো হেসে উঠবে, বিশ্বাসই করবে না। বিশ্বাস করা শক্ত বইকি রাগ করে কলকাতা থেকে চলে এলেও বাণীকে যে সে এত সহজে ভুলে যাবে—একটা বিয়ে করে বসবে, ওটা হয়তো ও ভাবতে পারেনি।

কিন্তু বাণীকে কি সত্যি ভুলতে পেরেছে সে? পারেনি। পারা সম্ভব নয়। একটা কেন, সাতটা বিয়ে করলেও বাণীকে কোনদিন ভুলতে পারবে না অনুপ।…বাণী ওর কি নয়! না, কোন সামাজিক সম্পর্ক দিয়ে ওদের বন্ধুতার পরিমাপ করা যায় না। সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে বন্ধুতা অনেক বড়।…ওকে ভুল বুঝে অনুপ শুধু নিজে দুঃখ পায়নি, ওকেও অনেক দুঃখ দিয়েছে। অরবিন্দকে ও তো সত্যি ভালোবাসতো না।…

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে আবোল-তাবোল চিন্তা করছিল অনুপ। এমন সময় রান্নাঘরের কাজ সেরে মিতা শুতে এল।

অনুপের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন আশ্চর্য হয়ে গেল সে।—মুখ কালো করে অত কি চিন্তা করছো?

সত্যি কথা বলতে কি, কথা বলতে তখন ইচ্ছে করছিল না অনুপের। কিন্তু না বলে উপায় আছে? ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মুখখানি গম্ভীর হয়ে গেল মিতার—ঠোঁট ফুলিয়ে বললে—আমাকে আজকাল আর তোমার ভালো লাগে না, না?

অনুপ জোর করেই হাসলো একটু। কাছে এলেই ওকে বুকে জড়িয়ে

ধরে আদর করতে হবে, না হলেই মেয়ের অভিমান। কিন্তু আদর করতে আজ মোটেই ইচ্ছে করছে না। তবু হাত ধরে কাছে টেনে নিতে হল ওকে।

মিতার তাতেও মন ওঠে না। পাশে শুয়ে বলে—তোমার আজ কি হয়েছে বল তো?

অনুপ পারতপক্ষে মিথ্যা কথার ধার ধারে না। তবু কেন যেন হঠাৎ একটা মিথ্যা কথা বলে ফেললো—বড্ড মাথা ধরেছে।

মিতা ওর গা ঘেঁষে শুয়ে কপালের উপর হাত রেখে উত্তাপ পরীক্ষা করলো—না, জ্বর হয়নি।

অনুপের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো সে। আরামে চোখের পাতা বুজে এল। তারপর একসময় মিতার ঐ ভালোবাসায় ভরা ছোট্ট নরম বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়লো।

এই ঘটনার দু-দিন বাদে বিকেলবেলায় স্কুল ছুটি হতেই বাণীর কথা মনে পড়লো অনুপের। ওদের ওখানে আজ বেড়াতে গেলে কেমন হয়? কলকাতায় থাকলে অফিসের পর সে প্রায়ই তো সোজা চলে গেছে বাণীদের ওখানে। বিকেলে কাকাবাবু তখন প্রায়ই বাড়িতে থাকতেন না। ওরা দু'জনে একসঙ্গে চা-জলখাবার খেতে-খেতে কত গল্পই না করতো! আনন্দে-ভরা সেই দিনগুলি চিরদিনের মতই হারিয়ে গেছে অনুপের জীবন থেকে। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো অনুপ।

কিন্তু ইচ্ছে করলে আজ তো সে অনায়াসেই ওখানে গিয়ে তার সঙ্গে বসে চা খেতে ও গল্প করতে পারে। কাকাবাবু বাড়িতে থাকলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। এসব ব্যাপারে উনি দারুণ আধুনিক। কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় তিনি হাত দেন না।···কিন্তু বাণীকে এখন গিয়ে বাড়িতে পাবে কি? কোথাও বেড়াতে যেতেও তো পারে।

গিয়েই না হয় দেখা যাক। দু'দিন আগেই তো দেখা হয়েছে বাণীর সঙ্গে। কিন্তু মনে হয় যেন কত যুগ ওর সঙ্গে দেখা হয় না।

অথচ কলকাতার থেকে এসে এতদিন তো দেখা-সাক্ষাৎই ছিল না। ···দেখা হবার পর ওর প্রতি আকর্ষণটা যেন আরো বেড়ে গেছে। রোজই

ওর সঙ্গে গিয়ে গল্প করতে ইচ্ছে হয়। জোর করেই নিজেকে সামলে নিয়েছে অনুপ।···বাণীর সঙ্গে কথা বলে সত্যি আনন্দ আছে। এত পড়াশুনা, কিন্তু বিদ্যার কোন ভার নেই ওর চরিত্রে। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব, চিন্তা-ভাবনাগুলো সে কত হালকা-সহজভাবে আলোচনা করে। শুধু বুদ্ধির দীপ্তি নয়, মনের মধ্যেও ওর একটা আশ্চর্য সরল সৌন্দয!

বাণীর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে বাণীদের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে অনুপ খেয়াল করেনি। বাড়ির দোরগোড়ায় এসে হঠাৎ খেয়াল হল। আর তখুনি দেখা হয়ে গেল বাণীর সঙ্গে। বাজারের থলি হাতে সে-ও বাড়িতে ঢুকছে তখন।

—আরে। তুমি!—অনুপকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো সে।

বাণীর সেই খুশি-খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেবার কথা ভুলে গেল অনুপ।

—একি, এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে চল।—বাণী বললে।

দুজনে একসঙ্গে এসে বাড়িতে ঢুকলো। বাণীর বাবা তখন বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। বাজারের থলিটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে অনুপকে নিয়ে বাণী সোজা শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললে—বসো।

অনুপ চেয়ারে বসে পড়ে। বাণী গিয়ে খাটের উপর বসে। খুশিতে উজ্জ্বল দৃষ্টি অনুপের মুখের উপর রেখে বলে—আজ দুপুরেই বাবা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

—আমার কথা!—অনুপ একটু লজ্জা পেয়ে যায়। ওঁর সঙ্গে এর মধ্যে একদিন এসে দেখা করে যাওয়া উচিত ছিল তার।

জোর করে মুখে হাসি এনে বলে—আমার কথা তাহলে এখনও ওঁর মনে আছে?

কৌতুকের ভঙ্গিতে ভুরু টান করে বাণী উত্তর দেয়—বাবার স্মরণশক্তি এমন দুবল মনে করার হেতু?

—না!—অনুপ থতমত খেয়ে বলে—আমার মত একটা অপদার্থ ছেলেকে—কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সে চুপ করে যায়।

মৃদু হেসে বাণী বলে—হয়েছে, আর বিনয়ে কাজ নেই।...আমি আগে চায়ের জোগাড় দেখি। স্কুল থেকে সোজা চলে এসেছো মনে হচ্ছে।—বলেই বাণী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অনুপ চুপচাপ বসে থাকে। দেয়ালের গায়ে তাকের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে, তবু সঙ্গে একগাদা বই নিয়ে এসেছে। বই ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারেন না কাকাবাবু। বাণীও কি পারে? ফুরসত পেলে সেও বইয়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। জীবনে অন্য কোন নেশা নেই বাপ-মেয়ের। ওঁদের মত সুখী কে সংসারে!...

বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বাণীর কথাই চিন্তা করছিল অনুপ। চিন্তায় হঠাৎ বাধা পড়ল।

ঘরে ঢুকে অনুপের সামনে টিপয়ে চায়ের কাপ দুটি নামিয়ে রেখে দুষ্টু হেসে বাণী বলে উঠল—বেড়াতে এসেও বউয়ের সুন্দর মুখখানির ধ্যান করছো?

অনুপ চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলে। ম্লান হেসে বলে—এই একটা জায়গায় মেয়েরা সবাই এক—জেলাসী জিনিসটা তাদের মজ্জাগত।

—চায়ে চুমুক দিয়ে বাণী অন্য কথা তোলে। বলে—তুমি আজ আসবে, আমার আগেই মনে হয়েছিল।

—সত্যি? অনুপ উত্তর দেয়—আমার কথা তাহলে এখনও মনে পড়ে?

—ইচ্ছে করলেই কি সব কিছু ভুলতে পারে মানুষ?—মৃদু হেসে বাণী বলে।

একচুমুকে বাকী চা-টুকু নিঃশেষ করে অনুপ বলে—আমি জানতাম—

বাণী হঠাৎ কেমন আনমনা ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। চায়ের খালি কাপটা নামিয়ে রেখে বলে—জানতে?...তাহলে অমন পাগলামি করে কলকাতা থেকে চলে এলে কেন?

অনুপ হঠাৎ কোন উত্তর খুঁজে পায় না। খানিক বাদে বলে—কেন এলাম তা কি তুমি জাননা?...দাবিটা আমার যে বড় বেশি ছিল,—আকাশের অসীম বিস্তারকে কেউ কি হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারে?

কথাটা বলতে গিয়ে অনুপ কেমন অভিভূত হয়ে পড়ে। গলাট নিজের কানেও যেন ভারী শোনায়।

অনুপের কথা শুনে বাণী আরো অভিভূত হয়ে পড়ে। ওর মুখে দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। বাণীকে এমন করে কোনদি কাঁদতে দেখেনি অনুপ।

অনুপ কি করবে ভেবে পায় না। বাণী অল্প সময়ের মধ্যে সামলে নেয় নিজেকে। আঁচলে চোখের জল মুছে বলে—তুমি আমাকে এম করে আর কাঁদিও না, অনুপ।

অনুপ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। বাণীর কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। ওর হাত দুটি হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—তোমাকে ছেড়ে সংসারে আমার কোন সুখ নেই বাণী।

বাণী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—ছেলেমানুষি কোরনা অনুপ।···সুখী না হবার কি হয়েছে?

বাণীর কণ্ঠস্বরে যেন ধমকের সুর। লজ্জিত হয়ে অনুপ চেয়ারে এসে বসলো আবার।

বাণীর মুখে ততক্ষণে হাসি ফুটেছে। চোখ দু'টি তখনও কান্নাভেজা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে—আমি কি মরে গেছি যে এখুনি শোক করতে শুরু করেছো?—একটু থেমে বলে—শুধু শুধু কেন দুঃখ করছো? যা ছিল তা তো ঠিকই আছে।

বাণীর কথা শেষ হতে না হতেই বারীণকাকা এসে ঘরে ঢোকেন।—আরে, এ যে নতুন লোক দেখছি।—বলেই অনুপের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

অনুপের পাশের চেয়ারখানি অধিকার করে আন্তরিকতার হাসি হেসে বললেন—তারপর তোমার খবর বল।···কবিতা লেখা ছেড়ে দাওনি তো

অনুপ কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে বলে—কবিতা লেখার সময় কোথায়!

—কবিতা লেখার সময় নেই!···তুমি অবাক করলে দেখছি—বারীণ কাকা সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করেন।—কবিতার ভূত ঘাড়ে চাপলে সময়ে অভাব হয় কখনো?

—তোমরা তর্ক করো, আমি ততক্ষণে চা নিয়ে আসি।—বাণী স্মিত হেসে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বারীণকাকা আপনমনে বলে যান।—তা ভালো, চা না হলে কি জমিয়ে বসে গল্প করা যায়!—বলেই আবার হেসে ওঠেন। ওঁর চির অভ্যস্ত উদাত্ত প্রাণখোলা হাসি।

মনের মধ্যে ওঁর যেন সর্বক্ষণ একটা আনন্দের স্রোত বইছে। কাছে এলে আপনা থেকেই মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

অরবিন্দর কাছেই প্রথম খবরটা শুনলো মানসী—অনুপ নাকি বিয়ে করেছে! অরবিন্দকে বাণীই সরবরাহ করেছে ঐ খবরটা। দিন কয়েক আগে পুরী থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছে ওরা।

পুরীতে গিয়েই আবার নতুন করে প্রেমে পড়ে গেল অনুপ! এতদিন তো বাণী বলতে অজ্ঞান ছিল। একদিন দেখা না হলেই অস্থির হয়ে উঠতো।

বাণীদি রাজী হলে অনেক আগেই হয়তো ওদের বিয়ে হয়ে যেত। অসবর্ণ বিয়েতে মানসীর বাবা অবশ্য মত দিতেন না। তাতে কি এসে যেতো। অভিভাবকের মত নিয়ে আজকাল আর কটা ছেলেমেয়ে বিয়ে করছে!

কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে বাণীদির কোন গরজই ছিল না। আসল কথা, অনুপকে সে ছেলেমানুষ বলেই মনে করতো। বলতো—তোমার এই দাদাটি কোনদিনই আর সাবালক হবে না।—ইনোসেন্ট চাইল্ড, অর্থাৎ নিষ্পাপ শিশু।

'ইনোসেন্ট চাইল্ড' কিন্তু পুরীতে গিয়েই প্রেমে পড়ে গেল! আশ্চর্য ছেলে! অনুপকে কত নিরীহ ভালো ছেলে বলেই না মনে করেছিল মানসী।

খবরটা শুনেই মানসীর রাগ ধরে গেল। না, অমন ছেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয় বাণীদির। কিন্তু বাণীদি এ ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার। পুরীতে নিজে গায়ে পড়ে ওদের বাড়িতে গিয়ে কি অনুপের বউকে দেখে এসেছে।

পুরী থেকে ফিরেই সন্ধ্যেবেলায় বাণী সেদিন বেড়াতে এসেছিল ওদের বাড়িতে। অরবিন্দ তখন বাড়িতে ছিল না।

মানসী অনুপের কথা জিজ্ঞেস করতে বাণী রসিকতা করে বলেছিল- তা তোমার ভায়ের পছন্দ আছে। বউটি দারুণ রূপসী। অমন রূপ দেখলে মহাদেবেরও ধ্যান ভঙ্গ হত।

বাণী হাসতে হাসতেই অনুপের বউয়ের কথা বলছিল। মানসী তখন চোখের জল রাখতে পারেনি।

বাণীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল।

—ওমা, কাঁদছিস কেন?—বাণী আশ্চর্য হয়ে বলে।

মানসী কোন উত্তর দেয়নি বাণীর কথার।

এই ঘটনার সপ্তাহ দু'য়েক বাদে।

সন্ধ্যে হয় হয়। অরবিন্দ তখনও বাড়ি ফিরে আসেনি। ওর উপর রাগ করে মানসী বিকেলে আজ চা খায়নি।

চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিল। সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়েই ছুটে গিয়ে দরজা খুললো।

না, অরবিন্দ নয়, বাণী!—ওমা, তুমি।

—তাই তো মনে হচ্ছে।—বাণী মিষ্টি হেসে বলে।

দু'জনে এসে শোবার ঘরে ঢুকলো।

—অরবিন্দ ফেরেনি এখনও! ঘরে ঢুকেই বাণীর সেই পুরোনো প্রশ্ন।

মাথা নেড়ে মানসী উত্তর দেয়।

দু'জনে তক্তাপোষের উপর মুখোমুখি হয়ে বসে।

মানসী বলে—মনে করে তবু তুমি এলে,—সন্ধ্যে বেলায় একা থাকতে বড় খারাপ লাগে!

—তা তুমিও তো ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লে পারো।

—ওর মত আমি কি রাত দশটা পর্যন্ত টো-টো করে ঘুরে

পারি ?···তাছাড়া বাড়িতে এসে খাওয়ার ব্যবস্থাও তো আমাকে করতে হবে।

—তা-ও তো বটে।—বাণী ওর কথায় সায় দেয়। একটু চুপ করে থেকে বলে—এখনও রাত দশটায় বাড়ি ফেরে ?

—এগারটাও হয় কখনো-কখনো।—মানসী হেসে উত্তর দেয়ঃ বাড়ি থেকে বের হলে ওর কি বাড়ির কথা মনে থাকে!···আমি অনর্থক ভেবে মরি।

—ভাবনা রেখে এখন একটু চায়ের যোগাড় কর তো। চল, আমিও তোমাকে সাহায্য করছি।

দু'জনে এসে রান্নাঘরে ঢোকে। স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে মানসী বলে—আমাকে এত অকর্মণ্য ভাবছো কেন ?···একহাতে আমি এখন সব কাজ করতে পারি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বাণী মুখ টিপে হাসে। বলেঃ তবে ঘরের লোকটিকেও একটু-আধটু কাজ করতে দিও, তা নইলে শিক্ষা খারাপ হয়ে যাবে।

সদর দরজাটা খোলাই ছিল। বাণীর কথা শেষ হতে না হতেই অরবিন্দ এসে ঘরে ঢুকলো—ব্যস্ত সমস্ত ভাবে। বাণীর কথার জের টেনে বললে—রান্নাঘরটিকেও দেখছি তোমরা শিক্ষালয় করে তুললে।

বাণীর পাশেই চেয়ারখানি অধিকার করে বসে পড়লো সে। অসময়ে ওকে বাড়ি ঢুকতে দেখে বাণী মৃদু হেসে মন্তব্য করে—এ কি করেছ ? আজ যে বড় তাড়াতাড়ি ফিরে এলে ?

—তাড়াতাড়িই আবার বেরুতে হবে, তাই।—রসিকতার হাসি অরবিন্দের মুখে। একটু থেমে বলে—শান্তিনগরে যেতে হবে। রাত্রে হয়তো ফিরতেই পারবো না। কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল মানসীর। বাণীর সেটা নজর এড়ায় না। অরবিন্দকে লক্ষ্য করে বলে—রাত্রে ফিরবে না ?···মানসী তাহলে একলা থাকবে ?

—একলাটা কোথায় শুনি ? আশেপাশে এতগুলি লোক রয়েছে। বাণীর কথার কোন গুরুত্বই দিল না অরবিন্দঃ একটু চুপ করে থেকে বললে—আসল কথা, শান্তিনগরে না গিয়ে উপায় নেই।···মারের শোধ

তুলবো না ?—গম্ভীর হয়ে নিজের মনে কি যেন একটু ভাবে অরবিন্দ। তারপর বলে—চাষী ভাইয়েদের ওঁরা এখন আর ঘাটাতে সাহস পাচ্ছে না —একেই বলে মেহনতী মানুষের ঐক্য।

চায়ের কাপ সামনে এগিয়ে দিয়ে মানসী বলে—চা-টা আগে খেয়ে নাও তো, বক্তৃতা না হয় পরে শোনা যাবে।

বাণী হেসে ফেলে। হাসি মুখেই বলে—বক্তৃতা না দিয়ে ও থাকতে পারে ? স্বয়ং গ্লাডস্টোন্ সাহেবও ওর বক্তৃতার কাছে হার মেনে যাবেন। স্মিত হেসে অরবিন্দ চায়ে চুমুক দেয়।

চায়ের পাট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাণীকে লক্ষ্য করে বলে—আমি তাহলে চলি, পরে আবার দেখা হবে।

মানসীর দিকে চেয়ে বলে—তুমি খেয়ে নিও—আমার জন্যে বসে থেকোনা···কাল সকালে প্রথম ট্রেনেই ফিরে আসবো,—বলেই হনহন করে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

মানসী নির্বাক হয়ে ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর বিমর্ষভাব লক্ষ্য করেই হয়তো বাণী বলে ওঠে—বাবাকে বলে এলে আজ রাতটা এখানেই থেকে যেতে পারতাম।

বাণীদি চলে গেলে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল মানসীর। রাত্রে একলা থাকতে ওর কষ্ট হবে, বাণীদি বুঝতে পারলো, কিন্তু অরবিন্দর খেয়ালই হল না ! একেই বলে রাজনীতির নেশা। রাজনীতির নেশার চেয়ে বড় নেশা নেই মানুষের জীবনে।

মানসী দুঃখ পাবে জেনেও শান্তিনগরে চলে আসতে হ'ল অরবিন্দকে। কাজের দায়িত্ব সে এড়ায় কিভাবে ! ঘর-সংসার অন্য কমরেডদেরও তো আছে। তারা কি প্রতিদিন বউয়ের আঁচল ধরে ঘরে বসে থাকতে পারে ? বড়লোক বাপের আদুরে মেয়ে মানসী, অরবিন্দর সঙ্গে ঘর করতে এলে দুঃখই পাবে। এটা অরবিন্দ আগেই বুঝতে পেরেছিল। আর বুঝতে পেরেছিল বলেই তো ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল সে। বিয়ের মধ্যে যেতে রাজী হয়নি।

মানসীই সব গোলমাল করে দিল। কিন্তু তাই বলে অরবিন্দ তো তার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না। দু'জনে একসঙ্গে পার্টির কাজ করবে, এই কথাই তো ছিল। কিন্তু স্কুল আর সংসারের ব্যবস্থা করেই তো মানসী এখন হাঁপিয়ে পড়ে। পার্টির কাজ করার সময় কোথায় ওর! এমনকি, ছুটির দিনেও কোথাও বেরুতে চায় না। কোথাও যাবার নাম করলে বলে—বাস-ট্রামের ভিড় ঠেলে যেতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে বাড়িতে বসে দু'জনে নিরিবিলিতে দু-দণ্ড গল্প করাও ভালো। অরবিন্দর তো গাড়ি নেই, যে গাড়ি করে বেড়াতে যাবে।

ছুটির দিনে সে সর্বক্ষণ অরবিন্দকে ধরে আটকে রাখতে চায়। কিন্তু সর্বক্ষণ বাড়িতে বসে থাকা ধাতে পোষায় না অরবিন্দর। ছল-ছুতো করে বেরিয়ে পড়ে।

রাত্রে আজ বাড়িতে ফিরবে না শুনেই মুখখানা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল মানসীর। বাসে উঠেও তাই অরবিন্দ ওর কথা ভুলতে পারছিল না। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত ওকে ঘরকুনো করে ফেলবে দেখছি। কিন্তু শান্তি-নগরে মিটিং সেরে আজ রাত্রে কি আর টালীগঞ্জে ফেরা সম্ভব হবে?

শান্তিনগরে এসে সব ভুল পড়ে গেল। চাষী ভাইদের সংগঠন-উৎসাহ দেখে অরবিন্দও উৎসাহিত হয়ে উঠল। এই তো চাই। সংগঠনই তো মেহনতী মানুষের একমাত্র হাতিয়ার।

মিটিং ছিল হারান মণ্ডলের বাড়িতে। তাড়াতাড়িই মিটিং শেষ হয়ে গেল। ইচ্ছে করলে গ্রামের মধ্যে খানিকটা ঘুরে যেতে পারে সে। লাষ্ট ট্রেনেই না-হয় কলকাতায় ফিরে যাবে।

অবিনাশবাবুর বাড়িতে অনেকদিন যায়নি অরবিন্দ। মিটিং সেরেই কলকাতায় ফিরে গেছে। রমার সঙ্গেও দেখা হয়না অনেকদিন—অরবিন্দর উপর নিশ্চয় রাগ করে আছে। ওদের বিয়ের ব্যাপারটা গৌরী দেবীই বা কি ভাবে গ্রহণ করেছেন কে জানে! একবার গিয়েই দেখা যাক না। দেখতে-দেখতে অবিনাশবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেল। অবিনাশবাবুর মেয়ে দু'টি বারান্দায় বসে লেখাপড়া করছিল—ওকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো। ফ্রক ছেড়ে মেয়ে দুটো এখন শাড়ী ধরেছে।

—ও পিসী, দেখ কে এসেছে—

ভাইঝিদের ডাক শুনেই রমা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।—ও মা, কি ভাগ্যি আমাদের।—ওকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠল : আজ কোনদিকে সূর্য উঠল!

—তারপর তোমরা ভালো আছ তো?—অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করে। রমা যেন শুনতেই পেল না কথাটা।

অভিমানে-ক্ষুব্ধ গলায় বললে—একযুগ বাদে আমাদের হঠাৎ মনে পড়ল?

অরবিন্দ ওর কথার কি উত্তর দেবে।—যাই, তোমার বউদির সঙ্গে দেখা করে আসি—বলেই সোজা গৌরীদির ঘরে গিয়ে ঢুকল। খাটের উপর বসে উল বুনছিলেন তিনি।

অরবিন্দকে দেখে তিনিও আশ্চর্য হলেন।

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীর মুখে বললেন—অনেকদিন পরে এলে।—বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সম্পর্কে অরবিন্দ এখন ওর ভগ্নীপতি। কিন্তু নতুন সম্পর্কটা উনি হয়তো মেনে নিতে পারছেন না। মনের মধ্যে যেন একটা অভিযোগ জমা হয়ে আছে ওঁর। অরবিন্দকে উনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না যেন। বড়লোক কাকার একমাত্র মেয়ে মানসী। বড় ঘরেই তার বিয়ে হবার কথা ছিল। সেই মেয়ের কিনা অরবিন্দর মতো একটা চাল-চুলাহীন ছেলের সঙ্গে—

কিন্তু অরবিন্দকে একদিন তো উনি কত স্নেহ করতেন।···সংসারে স্নেহ-মমতাও শ্রেণীভিত্তিক—যাকে বলে ক্লাস-সিম্প্যাথি!

—আপনার শরীর ভালো আছে তো?—জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলে।

—ভালো আর কোথায়! বাতের ব্যথায় প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছি। রমা ছিল তাই রক্ষে।

অরবিন্দ চুপ করেই ছিল। গৌরীদি আবার বলে উঠলেন—তা এলেই যখন মানসীকে নিয়ে এলেই পারতে।

—আমার আসার আগে তো ঠিক ছিল না। হঠাৎ চলে এলাম।—অরবিন্দ উত্তর দিলে।

গৌরীদি মুখ নীচু করে আবার উল বুনতে লাগলেন।

—অবিনাশবাবু কোথায় ?—নীরবতা ভেঙ্গে অরবিন্দ প্রশ্ন করে।

সেলাই পাশে সরিয়ে রেখে গৌরীদি যেন জোর করেই হাসলেন একটু। বললেন—কাছেই কোথাও গেছেন। এখুনি এসে পড়বেন হয়তো।

কথাটা শেষ হতে না হতেই রমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে টুলু, বুলু। অরবিন্দর সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে রমা চলে গেল। কিন্তু ঐ মেয়ে দুটো সঙ্গ ছাড়লো না অরবিন্দর।

—এতদিন আসোনি কেন ?—টুলুর গলায় অভিমানের সুর।

—তোমাকে আজ কিছুতেই যেতে দেব না।—বুলু আবদার করে।

অরবিন্দ চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয়, কোন কথা বলে না।

গৌরীদিই কথা তুললেন। ক্লান্ত-বিষণ্ণ দৃষ্টি অরবিন্দর মুখের দিকে তুলে বললেন—তেমন অসুবিধা না হলে থেকে যাও না ?

অরবিন্দ দোটানায় পড়ে যায়। কি বলবে ভাবছে, এমন সময়ে রমা এসে দাঁড়াল। অরবিন্দকে লক্ষ্য করে বললে—তোমার জন্যেও চাল নিয়েছি, না-খেয়ে হুট করে আবার চলে যেও না।

—যেতে দিলে তো ?—টুলু বলে ওঠে জোর গলায়।

রমা চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে অরবিন্দর দিকে তাকায়—কি থেকে যাবে নাকি—ভাবটা এই রকম।

অরবিন্দ রাজী হয়ে যায়। বলে—ঠিক আছে রাতটা আজ এখানেই কাটিয়ে যাবো। সকালে ফাষ্ট ট্রেনেই না হয় যাওয়া যাবে।

মেয়ে দুটো হাততালি দিয়ে অমনি লাফিয়ে উঠলো। রমার মুখেও একটা প্রসন্ন হাসির আভা খেলে গেল।

গৌরীদি বললেন—হ্যাঁ রাত-ও তো হয়েছে। বাড়ি পৌঁছোতে দেরী হয়ে যাবে।

রমা খুশি হয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—কোন কথা বললে না। ব্যাপারটা এত স্পষ্ট যে কথার কোন প্রয়োজন ছিল না।

টুলু-বুলুর সঙ্গে আজেবাজে খানিকটা বকবক করে অরবিন্দ উঠে পড়ল। গৌরীদিকে লক্ষ্য করে বললে—একটু ঘুরে আসছি।

মেয়ে দুটোও ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল—গৌরীদি কষে ধমক

দিলেন—তোরা আবার চললি কোথায় ? বই নিয়ে পড়তে বোস্, দু'দিন বাদে পরীক্ষা।

কাঁচুমাচু মুখে টুলু-বুলু আবার এসে বই নিয়ে পড়তে বসলো।

অরবিন্দ উঠোনে এসে দাঁড়াল। মনে হয় কতদিন যেন একযুগ বাদে সে আবার এই বাড়িতে এসেছে—তার নিজের ঘরে।

উঠোনে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কলকাতায় জ্যোৎস্না রাত তো চোখেই পড়েনা। জ্যোৎস্নার আলোয় গাছপালাগুলো পর্যন্ত কেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আলো, আকাশ, বাতাস, এমনকি মানুষের সঙ্গেও যেন ওদের ভালবাসার সম্পর্ক। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এখানে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক—কোন ডিসকর্ড—সংঘাত নেই।

পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে হঠাৎ আজ যেন নজর পড়ে অরবিন্দর। আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। রমার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল।—এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন ? ঘরে গিয়ে বসবে চল—তোমার পুরনো ঘরটা দেখবে না ?

রমার পিছন পিছন অরবিন্দ তার পুরনো ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হ্যাঁ, এই ঘরটিতে অনেকদিন কাটিয়ে গেছে সে।

ঘরে ঢুকে রমা মৃদু হেসে বললে—তোমার ঘরটি এখন আমি অধিকার করে বসেছি। তক্তাপোশের উপর মুখোমুখি হয়ে বসে পড়ে দু'জনে।

বাড়ির অন্য অংশ থেকে এই ঘরটা একটু দূরে। রাত্রে রমা এখানে থাকে।—ভয় করে না রাত্রে একলা থাকতে ?—অরবিন্দ জিজ্ঞেস করে।

—ভয়ের কি আছে ?—রমার মুখে ঠাট্টার হাসি। হ্যারিকেনের আলোতে ওর মুখের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রমা কথাটা শেষ করে না। চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর বলে—তোমার এই তক্তাপোষখানিও আমার দখলে।…তুমি একদিন এই ঘরে থাকতে, ভাবতেও যেন আমার আনন্দ লাগে।

রমার কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেমন ভারী হয়ে এল।

অরবিন্দ কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

রমা হঠাৎ বলে উঠল—ওই যা, ভাত চড়িয়ে এসেছি। পোড়া লাগলো কিনা, কে জানে। তুমি বোস।—বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

অরবিন্দ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। রমা ওকে এখনও ভুলতে পারেনি। আগের চেয়েও যেন গভীরভাবে ভালোবাসে।...কিন্তু অরবিন্দর কাছে কি পেয়েছে ও? না, কোন প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না রমা। ভালো-বেসেই যেন ওর আনন্দ। আশ্চর্য মেয়ে।

রমার কথা ভাবতে ভাবতে দূরমনস্ক হয়ে পড়েছিল অরবিন্দ। অবিনাশবাবু হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকলেন—এ যে নতুন কুটুম্ব দেখছি! বলেই অরবিন্দর সামনে এগিয়ে এলেন: তবু যাক, এতদিন বাদে আমাদের কথা মনে পড়ল।—বলে ওর পাশে বসে পড়লেন।

অরবিন্দ চেষ্টা করে একটু হাসলো।—তারপর এদিকের খবর বলুন।

—খবর তো এখন তোমাদেরই।...নতুন জীবন শুরু করেছো, একটু থেমে অবিনাশবাবু বলেন: বিয়ের নেমন্তন্ন তো ফাঁকি দিলে।...ছেলের অন্নপ্রাশনের খাওয়াটা যেন বাদ না পড়ে।

কথাটা শুনে অরবিন্দ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সম্পর্কে ভায়রাভাই হলেও বয়সে অবিনাশবাবু কত বড় ওর চেয়ে। ওর সঙ্গে এই ধরনের গ্রাম্যরসিকতা—

অরবিন্দ চুপ করেই ছিল। অবিনাশবাবু বললেন—যাই, হাত-মুখ ধুয়ে নেই।...রমা এখুনি এসে আবার খাবার জন্যে তাগাদা দেবে।—বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অরবিন্দও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

এই অল্পদিনের মধ্যেই কেমন বুড়িয়ে গেছেন অবিনাশবাবু। লগ্নী কারবার করেই আর্থিক অবস্থা দ্রুত ফিরিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু অবস্থা সচ্ছল হবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু ভুড়িটাই মোটা হয়নি অর্থের প্রতি লোভও যেন আরো বেড়ে গেছে ওঁর। বিষয়-আশয়, জমাজমি ছাড়া নাকি এখন আর কিছুই চিন্তা করেন না উনি। খবরটা গ্রামের লোকজনের কাছেই শুনেছে অরবিন্দ।...এই মানুষই একদিন বাস্তুহারা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন কে বিশ্বাস করবে?

—খেতে এস।—রমা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে।

অরবিন্দ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। রমার সঙ্গে রান্নাঘরে এসে ঢোকে।

মেঝেয় পাশাপাশি পিঁড়ি পেতে খাবার জায়গা করা হয়েছে। অরবিন্দ আর অবিনাশবাবু খেতে বসলো। টুলু ওরা আগেই খেয়ে নিয়েছে।

গৌরীদির হাঁটুতে ব্যথা, হাঁটতে কষ্ট হয়, তাই তাঁর খাবার রমা ওঘরেই পৌঁছে দিয়ে এসেছে। সবদিকেই তীক্ষ্ণ নজর মেয়েটার। নিজের সম্পর্কেই শুধু উদাসীন। সবাইকে খাইয়ে তবে নিজে খেতে বসবে। রাত্রের খাওয়া মানে তো সেই দুধ-সাবু আর কলা। রুটি-তরকারীও তো খেতে পারে। রুটি-তরকারী কেন, অনেক বিধবাই তো আজকাল ভাত খায় রাত্রে। রমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি!

খাওয়া-দাওয়ার পর অরবিন্দ গৌরীদির ঘরে এসে বসলো। অবিনাশ-বাবু তখন বারান্দায় মাদুরের উপর চিত হয়ে একমনে বিড়ি টেনে চলেছেন। অবস্থা সচ্ছল হলেও বিড়ি খাওয়ার অভ্যাসটি এখনও ছাড়তে পারেননি তিনি।

গৌরীদি খাটের উপর বসে-বসে পান চিবুচ্ছিলেন। মেয়েদুটো ততক্ষণে মায়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। অরবিন্দকে লক্ষ্য করে গৌরীদি বললেন—তুই বাইরের ঐ ঘরটাতেই গিয়ে ঘুমো।···রমা আজ নাহয় আমার ঘরেই শোবে।

—ঠিক আছে।—অরবিন্দ সায় দিয়ে যায় ওঁর কথায়।

দিদি আর কথা বলেন না—বড় ক্লান্ত-অবসন্ন মনে হচ্ছিল ওঁকে। অরবিন্দ বলে—তুমি তাহলে শুয়ে পড়, আমি যাই।

দ্বিরুক্তি না করেই গৌরীদি শুয়ে পড়েন। অরবিন্দও আস্তে বেরিয়ে আসে ওঁর ঘর থেকে। অবিনাশবাবু তখন মাদুরের উপর শুয়ে দিব্যি নাক ডাকতে শুরু করেছেন।

অরবিন্দ উঠোনে নেমে এল। আর রান্নাঘরের কাজ সেরে রমাও বেরিয়ে এল তখুনি।

জ্যোৎস্নার আলোয় অরবিন্দর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রমা বললে—যাও, তোমার ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি, শুয়ে পড় গিয়ে।

—ঘরটাতো এখন তোমার, আমি তো একরাত্রের অতিথি মাত্র। অরবিন্দ ঠাট্টার ছলে উত্তর দেয়।

রমা অমনি ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে--চল, তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অরবিন্দ আবার সেই পুরনো ঘরটিতে এসে ঢুকলো। সঙ্গে রমাও।

ঘরে ঢুকেই রমা বলে—তবু একটি দিনের জন্যেও তোমাকে তো কাছে পেলাম। গলাটা হঠাৎ যেন কেঁপে গেল রমার।

অরবিন্দ কি বলবে ভেবে পায় না। চুপ করে বসে থাকে। তক্তা-পোশের উপর রমা পরিপাটি করে এর মধ্যেই কখন যে ওর জন্যে বিছানা পেতে রেখেছে। মাথার কাছে টুলের উপর এক গেলাস জল—ঢাকা দেওয়া।

—তুমি এবার শুয়ে পড়, আমি যাই।—রমা বলে।

—একটু বসো না।—অরবিন্দ বলে।

রমা প্রতিবাদ করে না। খাটের পাশেই মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

অরবিন্দ চুপ করে থাকে। মনের মধ্যে অসংখ্য কথা—কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না।

নীরবতা ভেঙ্গে রমা বলে ওঠে—কি কথা ছিল তোমার সঙ্গে ?

অরবিন্দ মনে করতে পারে না। নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

রমা বলে—কি, মনে পড়ছে না ? তা পড়বে কেন ? একটু থেমে বলে—বিয়ের সময় আমাকে নেমন্তন্ন করার কথা ছিল না ?

—ও।—অরবিন্দ হেসে ফেলে : নেমন্তন্ন করার মত তখন কি অবস্থা ছিল।

—আনন্দে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়েছিলে ?—রমা খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসিটা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকে অরবিন্দর কানে। এ যেন সেই রমা নয়। রমা তো কখনও এমন বিদ্রূপের হাসি হাসতে পারতো না।

অরবিন্দ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বলে—কাল ভোরের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরতে হবে। যাবার আগে তোমার হাতের এককাপ চা খেয়ে যাবার ইচ্ছে আছে।

—নাও, তাহলে শুয়ে পড় এখন।

—বলেই, রমা ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আচমকা এভাবে ছুটে চলে গেল কেন? ধীরে-সুস্থে গেলে এমনকি ক্ষতি ছিল।

কালরাত্রে ভালো ঘুম হয়নি মানসীর। রাত্রে অরবিন্দ কাছে না থাকলে ওর ভালো ঘুম হয় না। অভ্যাসটা সত্যি বড় খারাপ হয়ে পড়ছে। অরবিন্দকে এ নিয়ে কিছু বললে সে উল্টো ঠাট্টা করে। বলে -না মেয়েরা দেখছি কোনদিনও স্বাবলম্বী হতে শিখবে না—চাকরী করলেও না।

মানসী তর্ক করতে ছাড়েনি। বলেছে—স্বাবলম্বী মেয়েদের কি স্নেহ-ভালোবাসা বলে কিছু থাকতে নেই?

মিষ্টি হেসে অরবিন্দ উত্তর দিয়েছে—যে স্নেহ মানুষকে এমন অসহায় করে ফেলে তাকে কখনও আস্কারা দিতে নেই।—বলেই কাছে টেনে নিয়েছে ওকে। মানসী আর তর্ক করার সুযোগ পায়নি।

কিন্তু অরবিন্দ যত উপদেশই দিক না কেন, রাত্রে ও বাড়িতে না থাকলে মানসীর মনে কোন আনন্দ থাকে না।

সারাদিন খেটে খুটে এসেও যদি ওকে কাছে না পায়—

দেখতে-দেখতে বেলা প্রায় ন'টা বাজতে চলল। তবু অরবিন্দর দেখা নেই। সকালে প্রথম ট্রেনে রওনা হলে এতক্ষণে এসে পড়ার কথা। প্রথম ট্রেনে হয়তো রওনা হতে পারেনি। ঘুম থেকে উঠতে হয়তো দেরী করে ফেলেছে।

গা ঝাড়া দিয়ে মানসী উঠে পড়ল। রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। হ্যাঁ, কেতলীতে দু'কাপ জলই দিয়েছিল সে। চা তৈরী হবার আগেও তো অরবিন্দ এসে যেতে পারে।

কিন্তু এল না শেষ পর্যন্ত। মানসী একা-একাই বসে চা খেলো। অরবিন্দর কাপটার দিকে তাকিয়ে অভিমানে চোখে জল এল। না, আর কোনদিন আগে থেকে ওর জন্যে চা তৈরী করবে না।...বন্ধু-বান্ধবদের

আড্ডায় বসে অরবিন্দ এতক্ষণে কত কাপ চা ধ্বংস করেছে, তার কি ঠিক আছে !

চা খেয়েই মানসী রান্না চড়িয়ে দিলে। ডাল-ভাত একটা তরকারী তো চাই-ই। নিজে দুটি খেয়ে স্কুলে যাবে, অরবিন্দর জন্যেও খাবারের ব্যবস্থা করে যেতে হবে। সকালে না এলেও দুপুরের মধ্যে নিশ্চয় এসে যাবে।

মানসী স্নান সেরে খেয়ে-দেয়ে স্কুলে চলে গেল। ইচ্ছে করলেই তো যখন-তখন ছুটি নেওয়া যায় না। নেওয়া উচিতও নয়। নতুন চাকরী। ছুতো পেলে কখন বরখাস্তের নোটিশ দেবে তার ঠিক আছে ? আর আজকালকার বাজারে চাকরী যোগাড় করা কি সহজ কথা ?

তেমন ঠেকায় না পড়লে মানসী তাই স্কুল কামাই করে না। তাছাড়া বাড়িতে একলাটি বসে থেকে করবেই বা কি ? দুপুরবেলায় অরবিন্দ বাড়িতে খেতে এলেও কতক্ষণই বা থাকে ? স্কুলে থাকলে সময়টা কোথা দিয়ে কেটে যায় মানসী টেরও পায়না।

কিন্তু আজ স্কুলে এসেও থেকে থেকে ওর বাড়ির কথা মনে পড়ছে। অরবিন্দ শান্তিনগর থেকে ফিরে এল কিনা কে জানে। অনেক সময় সে বাসেও ফেরে ওখান থেকে। কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো ? সকালে ফাষ্ট ট্রেনেই রওনা হবে বলে গেল, বেলা দশটার মধ্যেও না আসার কারণ কি ? আজেবাজে চিন্তা মাথায় মানসীর ভিড় করে।

স্কুল ছুটি হলেই তাড়াতাড়ি বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে গেল সে। প্রথমে যে বাস পেল, ভিড় ঠেলে তাতেই উঠে পড়লো। প্রচণ্ড ভিড়, সারা পথ দাঁড়িয়েই যেতে হবে হয়তো।

তা হক, তবু তো, তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছুতে পারবে। অরবিন্দ নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়িতে ফিরে এসেছে। মানসীর জন্যে অপেক্ষা করছে নিশ্চয়।

বাড়িতে এসে অবাক হয়ে গেল সে। অরবিন্দর কোন পাত্তাই নেই। রান্নাঘরে টেবিলের উপর ঢাকা-দেওয়া খাবার ঢাকা পড়ে আছে। দুপুরে এসে খায়নি তাহলে। শান্তিনগর থেকে এখনও কি তাহলে ফিরে আসেনি ?

জামা-কাপড় বদলে কলঘরে গিয়ে ঢুকলো মানসী। ভেবেছিল, এর মধ্যে নিশ্চয়ই এসে যাবে।

কিন্তু স্নান সেরে ঘরে ঢুকেও মানসী অরবিন্দর দেখা পেল না। দুঃখে-রাগে-অভিমানে মানসীর কান্না পায়। তক্তাপোশের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লো সে। আলোটাও জ্বালাতে ইচ্ছে করলো না। না, আজ আর কোন কাজেই হাত দেবে না সে।···এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই মানুষটার। ওকে একলা রেখে গেছে তা নিয়ে কোন ভাবনা নেই। চিন্তায় হঠাৎ বাধা পড়ল মানসীর—সদর দরজায় জোর কড়া নাড়ার আওয়াজ। দরজাটা খুলে দিতেই হন্তদন্ত হয়ে অরবিন্দ ঘরে ঢুকলো। ঘরটা অন্ধকার দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে—তুমি ঘুমোচ্ছিলে নাকি? কথা বলা দূরে থাক। মানসী ওর দিকে ফিরেও তাকালো না। সুইচ টিপে আলোটা অরবিন্দই জ্বালিয়ে দিলে। মানসী যেমন চুপ করেছিল তেমন চুপ করে শুয়ে রইল। কিন্তু অরবিন্দ শুয়ে থাকতে দিলে তো? একেবারে গা ঘেঁষে এসে বসে পড়ে।

—চা করবে না?···আজ দুপুরে কিছু খাইনি।

—খেতে কে বারণ করেছিল?—অন্যদিকে তাকিয়ে মানসী বলে।

অরবিন্দ ওকে আদর করে বলে—ঘাট হয়েছে—আর কোনদিনও যদি—মানসীর রাগ পড়ে যায়।

দুজনে রান্নাঘরে এসে ঢোকে একসঙ্গে।

কেতলীতে চা ভিজিয়ে দিয়ে অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে মানসী বলে—এমন কর কেন, বলতো? আমাকে ভাবনায় ফেলতে তোমার খুব আনন্দ লাগে, না?···মানুষের হঠাৎ কোন অ্যাকসিডেন্ট্ তো হতেই পারে।

—অ্যাকসিডেন্ট্? আমার? আমার হঠাৎ অ্যাকসিডেন্ট্ হতে যাবে কেন?—অরবিন্দ হো হো করে হেসে ওঠে: এমন উদ্ভট সব চিন্তা তোমার মাথায় আসে কোত্থেকে বলো তো?

চায়ের কাপ অরবিন্দর হাতে এগিয়ে দিয়ে মানসী বলে—বাঃ সারা-দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরলে না, এতে চিন্তা হয়না?

অরবিন্দ চিন্তা করলে তো পার্টির কাজ ছেড়ে দিতে হয়।

কোনদিন পার্টির কাজ ছেড়ে দিতে বলছে কে?—মানসী উত্তর দেয়: পার্টি

রলে কি বাড়ির—নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায় না ?···মার্কস কি লেছিলেন, মনে নেই ?

উৎসুক—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মানসীর দিকে তাকিয়ে থাকে অরবিন্দ।

মানসী বলে—কার্ল মার্কস তাঁর স্ত্রী জেনীকে একটি চিঠিতে লিখে-ছিলেন—নিজের সবচেয়ে প্রিয়জনের প্রতি গভীর ভালবাসাই মানুষকে ানবিকতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিতে পারে।

চায়ে চুমুক দিয়ে অরবিন্দ বলে—অত্যন্ত খাঁটি কথা। নিজের প্রিয়তমকেই যদি আমরা যথার্থ ভালবাসতে না পারি—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই চুপ করে যায় সে।

চায়ে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে অরবিন্দ আবার পুরানো কথায় ফিরে যায়। লে—তবে চিন্তা-ভাবনাটা একটু কম কোরো। মনে শান্তি থাকবে।

মানসী কোন উত্তর দেয় না।

না, ওকে কিছু বলে লাভ নেই। চা খাওয়া হয়ে গেলেই আবার রুনোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো অরবিন্দ। বললে—একটু ঘুরে াসছি—তুমি তো এখন রান্না নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

রান্না নিয়ে ব্যস্ত না থাকলেই যেন উনি ঘরে বসে থাকতেন। মানসী প করে থাকে। যাক্, যেখানে ওর মন চায়, সেখানেই যাক্। মানসীর াছে বেশিক্ষণ থাকলে ও যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

স্কুল থেকে মাইনে পেয়ে মানসী এবার জামা-কাপড়ের পিছনেই ানেকগুলি টাকা খরচ করে ফেলেছে।

দুবেলা পেটপুরে খেলেই তো হয়না। সভ্য সমাজে বাস করতে গেলে পরণ-পরিচ্ছদেরও প্রয়োজন আছে এবং সংখ্যায় জামা-কাপড় য়েকটা বেশি না থাকলে চলে ? অরবিন্দর অবশ্য এসব দিকে খেয়ালই নই। যা খুশি একটা কিছু পরে থাকলেই হলো, সেটা ফাঁটা না ছেঁড়া া দেখলেও চলে। ফাঁটা-ছেঁড়া তবু সহ্য হয়, কিন্তু ময়লা জামা-কাপড় ানসী বরদাস্ত করতে পারে না। দেখলেই গা ঘিনঘিন করে। কষ্ট লেও রাত্তিরবেলায় সে তাই জামা-কাপড়গুলি গরম সাবান-জলে ভিজিয়ে রাখে—সকালে কেচে শুকোতে দেয়। বিছানার চাদর অবশ্য

ওর পক্ষে কাচা সম্ভব নয়, সে চেষ্টাও করে না। বাড়ির কাছাকাছি যে লণ্ড্রিটা আছে, সেখানেই দিয়ে আসে। দাম একটু বেশি পড়ে, পড়ুক, তবু তো পরিষ্কার বিছানায় শোয়া যায়। খবরের কাগজে জড়িয়ে নিজে গিয়েই দিয়ে আসে। অরবিন্দ বেচারীকে এসব কাজে আটকাতে ইচ্ছে করে না মানসীর। ততক্ষণে ও হয়তো কয়েকখানা জার্নাল ঘেঁটে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলতে পারে! ঘরকন্নার ব্যাপারে ওর মনও নেই, কিন্তু বাঁচতে হলে সবই তো প্রয়োজন মানুষের, আর মানুষের জন্যেই তো সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন। একথাটা যেন ওর মাথায় ঢোকেনা। লেখা এবং বক্তৃতা দেবার বেলায় তো দিব্যি কেমন সব বড় বড় কথা বলে।—বড় কিছু নিয়ে যারা থাকে—বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখে, তারা বোধহয় এই রকমই হয়। সংসারের ছোট-খাটো ব্যাপার তাদের নজরে আসে না।

কিন্তু মানসীকে তো সংসার করতে হবে। স্কুলে চাকরী করলেও সংসারের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে এসে ও বেচারী যদি সময়মত খাবার—ভাত জলটুকুও না পায়! না, মানসী তা সহ্য করতে পারে না। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই সে তাই রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। চটপট জলখাবার তৈরী করে ফেলে। বিকেলে বাড়ি ফিরেই অরবিন্দ যাতে হাতের কাছে খাবারটা পায়।

অরবিন্দ ফিরে এলে তু'জনে একসঙ্গে বসে চা-জলখাবার খায়। জলখাবার আর কি? পরোটার সঙ্গে একটু আলুর চচ্চড়ি। ঐ খাবারেই খুশি অরবিন্দ। ইচ্ছে হলেও রোজ তো আর চায়ের সঙ্গে ওমলেটের ব্যবস্থা করতে পারে না মানসী। অত পয়সা কোথায়? খেতে অসম্ভব ভালোবাসে অরবিন্দ। খেতে বসে তু-চারপদ রান্না দেখলে মুখে হাসি ধরে না। বলে—আজ দেখছি একেবারে নেমন্তন্ন!

হ্যাঁ, ভালো খাবার দেখলে অরবিন্দ সত্যিই খুশি হয়। কিন্তু জামা-কাপড়ের যেন কোন মূল্যই নেই ওর কাছে। ও সবের পেছনে টাকা খরচ করা ও অপব্যয় বলে মনে করে হয়তো।

তা করুক গে, ওর যা-ইচ্ছে মনে করুক। স্কুলে মাইনে পেয়ে মানসী এবার অরবিন্দর জন্যে একটা সাদা ট্রাউজার আর ক্রীমরঙের বুশ

সার্ট কিনে এনেছে—অরবিন্দর গায়ের মাপ তো ওর জানাই ছিল। সাদা ট্রাউজারের উপর ক্রীমরঙের বুশসার্ট ওকে খুব ভালো মানাবে। নিজের জন্যও একখানা তাঁতের শাড়ী কিনে ফেলেছে মানসী—পিঙ্ক রঙের। ম্যাচ করে ব্লাউজও কিনেছে একটা। এই রঙটাই সব থেকে পছন্দ করে মানসী। রঙটা গায়ের সঙ্গে যেন মিশে থাকে। লাল রঙের মতো ক্যাট্‌ক্যাট্ করে না। পোষাক হল, মানুষকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্যে। মানুষকে ছাপিয়ে নিজেকে জাহির করার জন্যে নয়।

ঝোঁকের মাথায় জামা-কাপড়গুলি কিনে ফেলেছে মানসী। কিন্তু কথাটা অরবিন্দর কাছে গোপন করে গেছে সে। বলেনি ইচ্ছে করেই—অরবিন্দকে একেবারে অবাক করে দেবে। তু'দিন বাদেই তো ওদের বিয়ের তারিখ। ঐ দিনটার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে মানসী।

দেখতে-দেখতে বহুপ্রতীক্ষিত সেই দিনটি এসে গেল। ছুতো করে স্কুল কামাই করলো মানসী।

তুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে অরবিন্দ বেরিয়ে গেলে সে বসে-বসে মাটন কাট্‌লেট তৈরী করলো। মোগলাই পরোটার ময়দাটাও মেখে রাখলো। বিকেলে অরবিন্দ ফিরে এলে গরম-গরম ভেজে দেবে। কাট্‌লেট আর মোগলাই পরোটা এই তুটি জিনিসই অরবিন্দর খুব পছন্দ।

কাজকর্ম সেরে অরবিন্দ বাড়ি ফেরার আগেই মানসী কলঘরে গিয়ে স্নান সেরে নিলে। পরিপাটি করে চুল বেঁধে নতুন কেনা শাড়ী-ব্লাউজ পরলো। ছোট্ট করে একটি সিঁতুরের টিপ পরলো কপালে।

আজ ওদের বিয়ের তারিখ অরবিন্দর খেয়ালই নেই। শাড়ী-ব্লাউজ পরে মানসীকে সেজেগুজে বসে থাকতে দেখে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, অরবিন্দ আশ্চর্য হল বৈকি ওকে দেখে। অবাক হয়ে ওর দিকে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলে—ব্যাপার কি বলতো?···কোথাও যাবে নাকি?

—কোথায় যাবো আবার?—মানসী অভিমানের সঙ্গেই বললে: আজ আমাদের বিয়ের দিন, মনে নেই?

—তাই বল।—অরবিন্দ হো হো করে হেসে উঠলো।

একটু থেমে হাসতে হাসতেই বললে—তা বিয়ের উৎসব তো আমাদে প্রতিরাত্রেই মানসীর অভিমান জল হয়ে যায়।—হয়েছে, এখন চটপা স্নান সেরে এসো দেখি।

বিকেলে বাড়ী ফিরে অরবিন্দরও রোজ স্নান করা চাই—শীত, ক গ্রীষ্ম।

স্নান সেরে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো সে। পরনে সেই সা পুরনো নীল রঙের লুঙ্গি।

মানসী বাক্স থেকে নতুন ট্রাউজার ও বুশসার্টটা বের করে ওর হাতে এগিয়ে দেয়। বলে—লুঙ্গি ছেড়ে এগুলো পরে নাও। আমি ততক্ষণে চায়ের ব্যবস্থা করি গিয়ে।

—এ আবার কবে কিনলে?—অরবিন্দ যেন হকচকিয়ে গেল জামা প্যাণ্ট দেখে।

মানসী হাসি চেপে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কোন উত্তর দিল না। রান্নাঘরে ঢুকে চটপট পরোটা ভেজে ফেললো, বাকী শুধু চা তৈরি করা।

টিপটে চা ভিজিয়ে টেবিলে খাবারগুলি সাজিয়ে মানসী আবা শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। ওমা, অরবিন্দ তেমনি বসে আছে সে পুরনো লুঙ্গিটা পরে। খবরের কাগজ পড়ছে। মানসীর কথাগুলো কি এর মধ্যেই ভুলে গেছে! মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মানসীর।

—ও. চা হয়ে গেছে?—মানসীকে দেখে বলে উঠলো অরবিন্দ।

—হ্যাঁ, দয়া করে খেতে এসো।...খবরের কাগজ তো পরে পড়লে চলবে।—বলেই মানসী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। অরবিন্দও ওর স নিলে।

ঘরে ঢুকে খাবারগুলি লক্ষ্য করে বলে উঠলো—এ যে দেখা রাজকীয় ব্যাপার, এসব আবার কখন করলে?

ওর ছেলেমানুষী দেখে মানসীর হাসি পায়। চেষ্টা করেই গম্ভীর হয়ে থাকে।

—ঐ যা, জামা-প্যাণ্ট তো—

—নাও, খাও তো আগে, ওগুলি পরে পরলেও চলবে।—মানসী খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলো ওর সামনে। আর অরবিন্দ তখুনি আবার একটা ছেলেমানুষী করে। প্লেট থেকে কিছুটা খাবার তুলে মানসীর মুখের কাছে ধরে।—নাও, হাঁ কর তো, আমি আজ খাইয়ে দেবো তোমাকে।

হয়েছে, আর আদরে কাজ নেই। নিজে সুস্থ হয়ে খাও তো।

—উঃ হুঃ তা হবে না।—অরবিন্দ জোর করেই ওর মুখে খাবার গুঁজে দেয়।

অরবিন্দর এই ছেলেমানুষিটুকু ভারী ভালো লাগে মানসীর। আর এইটেই হল ওর বৈশিষ্ট্য। কোন সময়েই মুখ কালো করে থাকে না।·· মনের জোর অসাধারণ। শত অসুবিধের মধ্যেও প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে।

একপ্লেটেই তুজনের খাবার। একসঙ্গে খাবার খাচ্ছিল ওরা।

খেতে খেতে মানসীকে দেখছিল অরবিন্দ—যেন নতুন দেখছে আজ। খাবারের প্লেট তখন খালি হয়ে এসেছে।

—হাঁ করে কি দেখছো এত? চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।—মানসী বলে।

চায়ে হাল্কা চুমুক দিয়ে অরবিন্দ উত্তর দেয়।—দেখছি রাজকন্যেকে। ··আজ তোমাকে সত্যি কিন্তু রাজকন্যে বলেই মনে হচ্ছে।

চা খেতে খেতেই মানসী উত্তর দেয়।—কেন? রাজকন্যের কি দেখলে? গায়ে তো একরতি সোনার চিহ্ন নেই।···রাজকন্যে কি তাঁতের শাড়ী আর প্লাসটিকের চুড়ি পরে কখনো?

অরবিন্দ তাতেও রাগ করে না, মুচকি হাসে। চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বলে—রাজার মেয়েকে লোকে 'রাজকন্যে'ই আখ্যা দিয়ে থাকে—তা সাজসজ্জা তার যে রকমই হোক না কেন।

মানসীর এবার রাগ ধরে যায়। যখন-তখন ওর বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ভালোলাগে না। বলে—প্রতিদিন আমার বাবাকে নিয়ে খোঁটা দিও না। জেনী মার্কস অভিজাত জার্মান ডিউক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কালমার্কসের জীবনসঙ্গিনী হয়েছিলেন।

অরবিন্দ যেন কৌতুক বোধ করে কথাটা শুনে। মিটিমিটি হাসতে থাকে।—মার্কস জেনী তো ইতিহাসে এক তুর্দান্ত ব্যতিক্রম। মানসীর

জেদ চেপে যায়।—ব্যতিক্রম না বলে নজীরও তো বলা চলে। একটু থেমে বলে—কিন্তু প্রলেটারিয়েট্ লিডার শ্রমিক-নেতা হয়ে রাজকন্যেকে তুমি গ্রহণ করলে কেন?

—তা যা বলেছো।—অরবিন্দ রসিকতার হাসি হেসে বলে—রাজকন্যে যখন স্বয়ং পায়ে হেঁটে গরীবের আস্তানায় এসে ঢুকলেন, মাথাটা ঘুরে গেল। কবি সুকান্তর মত বুকের পাটা থাকলে বলতে পারতাম ঃ

"হে রাজকন্যে
তোমার জন্যে
এ জনারণ্যে,
নেই কোন ঠাঁই
জানাই তাই।"

—বললেই পারতে, কে মানা করেছিল?—মানসী রাগের ভাবেই বলে।

অরবিন্দ কোন গুরুত্বই দেয়না ওর কথায়। চায়ের খালি কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে স্মিত হেসে বলে—এবার যাই, পোষাকটা বদলে নেই। বিয়ের তারিখ, পুরনো লুঙ্গি পরে থাকা শোভা পায় না।—বলেই উঠে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল সে। আশ্চর্য লোক। ওকি রাগ করতেও জানেনা! অমন মানুষের উপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায়?

প্রায় একযুগ পরে অনুপের চিঠি পেল গৌরী। ভাইয়ের সঙ্গে এতদিন তো কোন যোগাযোগই ছিল না।

যোগাযোগ অনুপ কার সঙ্গেই বা রেখেছে। হুট করে সেই যে কলকাতা থেকে চলে গেল তারপর কারুর কাছেই কোন খবর দেয়নি। বিয়ের খবরটা অবশ্য গৌরী পেয়েছে অরবিন্দর কাছে। অরবিন্দর কাছে চিঠি লিখতে পারলো আর নিজের সহোদরা বোনের কাছে দুটো লাইন লেখার সময় হল না!

দিনকালই যেন সব বদলে গেছে! আত্মীয়স্বজনের চেয়ে আজকাল বন্ধুবান্ধবই বেশি আপন। তবু যাহক্, একটা বেজাতের মেয়েকে যে

বিয়ে করে বসেনি। জাত-গোত্র সবই ঠিক আছে। মেয়েটা দেখতেও নাকি পরমা সুন্দরী। সুন্দরী বউ পেয়ে দিদির কথা ভুলে গেছে।

এতদিন বাদে তবু দিদিকে মনে পড়েছে। একনিঃশ্বাসে অনুপের চিঠিখানা পড়ে ফেললো গৌরী। পুরীতে নাকি অনুপের আর মন টিকছে না। তাই কলকাতায় চলে আসছে। আসার চেষ্টা অনেকদিন থেকেই নাকি করছে। চাকরি ঠিক না করে আসে কিভাবে? সম্প্রতি কলকাতায় এক স্কুলে নাকি একটা মাষ্টারী পেয়েছে—সামনের মাস থেকেই কাজে যোগ দেবে। সামনের মাসের তো মাত্র দিন পনের বাকি। গৌরীকে এর মধ্যে একটা বাড়ি যোগাড় করতে লিখেছে।

কিন্তু বাড়ি যোগাড় করা কি মুখের কথা? তা-ও আবার ঐ অল্প ভাড়ার মধ্যে। পুনশ্চ দিয়ে অনুপ লিখেছে: বাড়ি ঠিক না হলে কিন্তু তোমাদের ওখানেই উঠবো। সেই বিপদের কথা স্মরণ রেখে চটপট ব্যবস্থা কোরো। ইতি—

চিঠিখানা পড়ে গৌরীর আনন্দ হল বৈ-কি! মা-মরা ভাই। ভাই বলতে তো ঐ একটাই। ও এলে ভালোই লাগবে।

বিকেলবেলা, অনুপের চিঠিখানা হাতে নিয়ে খাটের উপর চুপচাপ বসে ছিল গৌরী। এমন সময় চা নিয়ে রমা ঘরে ঢুকলো। ওর দাদা চা-খাবার খেয়ে আগেই বেরিয়ে গেছেন।

—নাও, চা-টা খেয়ে নাও আগে।

অনুপের চিঠিখানা বালিশের তলায় গুঁজে রাখল গৌরী। গৌরীর সামনে টুলের উপর চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে রমা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চিঠির কথা ভুলেও একবার জিজ্ঞেস করলে না। চিঠিটা কি নজরে আসেনি ওর? হবে হয়তো। এ সব ব্যাপারে ওর যেন কোনরকম ঔৎসুক্যই নেই। আজকাল সর্বক্ষণ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। মনমরা ভাব। কি যেন ভাবে নিজের মনে। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। কাজকর্ম অবশ্য সবই করে যায় আগের মতই। বরং বেশিই করে। গৌরী অশক্ত হয়ে পড়ার পর থেকে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তো ঐ মেয়েটার উপরই পড়েছে। ও ছিল বলেই রক্ষে।

গৌরী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে ওর দাদার মেজাজও কেমন বিগড়ে গেছে। পান থেকে চুন খসলেই হয়েছে। এতদিনেও পুত্র সন্তানের মুখ দেখতে পেলেন না, এ জন্যে গৌরীকে উঠতে বসতে উনি বাপান্ত করেন। অরবিন্দ যতদিন এখানে ছিল—সমিতির কাজকর্ম নিয়ে থাকতেন। তখন যেন অন্য মানুষ ছিলেন তিনি। ভালো কাজের মধ্যে থাকলে মানুষের মনও ভালো থাকে—রমা মিথ্যে বলেনি।

দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা হল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। সাইটিকার ব্যথা সন্ধ্যার পরই বেড়ে যায় গৌরীর।

রাত আটটা বাজতে না বাজতেই রমা ওর জন্য রুটি-তরকারী নিয়ে হাজির হল।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে গৌরী। ওষুধটা খেলে ব্যথা অনেক কম থাকে। রমার দাদা বাড়ি ফিরলে অনুপের চিঠির কথা বলবে, ভেবে রেখেছিল, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। নিজের অজান্তেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত তখন কত জানে না গৌরী। তা দশটা তো হবেই। তার আগে উনি বাড়ি ফেরেন না তাসের আড্ডা থেকে। তাসের নেশায় ইদানীং পেয়ে বসেছে ওকে।

কিন্তু রাত দুপুরে শুতে এসে ওর পাতলা ঘুমটা ভেঙ্গে দেবার কি দরকার ছিল? ঘুমিয়ে থাকলে পায়ের ব্যথাটা তবু ভুলে থাকা যায়। তা কি বোঝেন মানুষটা!

পাশে শুয়েই ভালোবাসা জানাতে শুরু করলেন। রাগের মাথায় গৌরী তাই বলে ফেলেছিল—বিরক্ত কোরো না, আমাকে সুস্থ হয়ে একটু ঘুমোতে দাও।

—সারাদিনই তো ঘুমচ্ছ। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই।

—রাত্রেই তো আমার ব্যথা বাড়ে।

—তাহলে আমি বাইরে গিয়ে শুই—কাছেই যদি না আসবে!

কথাটা শুনে বড় দুঃখ হল গৌরীর। কি স্বার্থপর মানুষ। স্ত্রী সাইটিকা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, আর উনি নিজের কথাই ভাবছেন।

রাগের ভঙ্গিতে স্বামী বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে

গেলেন। উঠে গিয়ে বাধা দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু তার আগেই উনি বারান্দায় বেরিয়ে গেছেন।

বিছানায় শুয়েই গৌরী কাঁদল কিছুক্ষণ। তারপর মরিয়া হয়েই উঠে পড়লো। মানুষটা রাগ করে চলে গেল, আর গৌরী ঘুমোবে কি করে। বাইরে বারান্দায় দড়ির খাটিয়ার উপরই হয়তো গিয়ে শুয়ে আছেন। খোলা বারান্দায় সারারাত শুয়ে থাকলে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগবে—মশাও কামড়াবে। না, ওঁকে ঘরে ডেকে নিয়ে আসতে হবে—বুঝিয়ে-সুঝিয়ে।

গৌরী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়। যা ভেবেছে বারান্দায় এক কোণে সেই ছোট্ট দড়ির খাটিয়াটার উপরই তিনি শুয়ে আছেন। এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন? না, ঘুমাননি নিশ্চয়। ঘুমলে তো ওঁর নাক ডাকতো।

হঠাৎ রমার ঘরটার দিকে দৃষ্টি পড়লো।

এত রাত্রে দরজা খুলে ওর ঘর থেকে কে বেরিয়ে এল! সঙ্গে রমাও। হাতে হ্যারিকেন। ওমা, ও দেখি অরবিন্দ। এত রাত্রে ওর ঘরে ঢুকেছিল কি করতে? সোমত্ত মেয়ে, রাত দুপুরে ওর কাছে হঠাৎ কি দরকার পড়লো! উত্তেজনায় বুক টিপটিপ করতে লাগলো গৌরীর। চেঁচিয়ে রমাকে ডাক দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গলা দিয়ে ওর স্বর ফুটল না।

চোখের নিমেষে হনহন করে বেরিয়ে গেল অরবিন্দ বাড়ি থেকে। আর রমাও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।···দুপুরের দিকেও তো অরবিন্দ আজ একবার এসেছিল ওদের বাড়িতে। গ্রামে নাকি চাষীদের মিটিং ছিল গৌরীর এখানেই খেয়েছিল দুপুরের খাওয়া।··· কিন্তু এত রাত্রে আবার এ বাড়িতে এসে ঢুকলো কেন? তা-ও রমার ঘরে। না, ব্যাপারটা মোটেই সুবিধার নয়।

দুশ্চিন্তায় মাথার শিরা দপদপ করতে থাকে গৌরীর। কিছু না ভেবেই স্বামীর কাছে এগিয়ে যায় সে। চাদরের ঢাকা তুলে তাঁর মাথায় হাত রেখে বলে—এই ওঠ, চল, ঘরে গিয়ে শোবে। এখানে ঠাণ্ডা লাগবে।

গৌরী ঠিকই আন্দাজ করেছিল—চাদর মুড়ি দিয়ে থাকলেও মানুষটা কিন্তু জেগেই ছিল তা নইলে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে অমন একলাফে উঠে পড়তে পারে।

উঠেই গৌরীকে জাপটে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন—তুমি আবার কষ্ট করে উঠে এলে কেন?···অসুস্থ শরীর।

বিছানায় গৌরীর পাশে শুয়ে মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু ওর অসুস্থতার কথা ভুলে গেলেন। জোর করেই কাছে টেনে নিলেন গৌরীকে। কষ্ট হলেও গৌরী চুপ করে রইল। চুপ করে না থেকে উপায়ই বা কি। হিন্দুঘরের সধবা নারী, স্বামীর ইচ্ছাই তার ইচ্ছা।

শান্তিনগরে চাষী সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। কিন্তু এখানে এসে আজও যে অরবিন্দ এমন আটকে পড়বে, আগে বুঝতে পারেনি। বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে মানসীকে এ সম্পর্কে কিছু বলেও আসেনি সে। রাত্রে না ফিরতে পারলে সেদিনকার মত নিশ্চয় আবার চটে যাবে। গত মাসেও একদিন মিটিং করতে এসে আটকে পড়েছিল অরবিন্দ। রাত্রে বাড়ি ফেরেনি। ভোরে উঠেই চলে আসবে ঠিক করেছিল, তা রমা সব ভেস্তে দিলে।···

উঠতে অবশ্য কিছুটা দেরী করে ফেলেছিল অরবিন্দ। রমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। চায়ের কাপ হাতে দিয়ে বললে—চা খেয়ে তৈরী হয়ে নাও। আমি ভাতে-ভাত চাড়িয়ে দিয়েছি—এতবেলায় শুধু মুখে যাবে কেন?

অরবিন্দকে প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ না দিয়েই সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

স্নান সেরে অরবিন্দ ঘরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এসে তাড়া দিলে—চল, খেতে চল।

অরবিন্দ রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। গরম ভাত—ডিম সেদ্ধ, আলু-সেদ্ধর সঙ্গে বাড়িতে তৈরী সর-বাটা ঘি, এসব ফেলে চলে আসা যায়!

অরবিন্দকে খেতে বসিয়ে দিয়ে রমা বেগুন ভাজছিল। বললে—আস্তে-আস্তে খাও, ভাজাটা হয়ে গেল বলে।

গরম-গরম বেগুনভাজা পাতে দিতেই অরবিন্দ খুশির ঝোঁকে বলে উঠেছিল—তুমি দেখছি, আমাকে একেবারে বড়লোক করে ফেলবে।

মৃদু হেসে রমা অমনি উত্তর দিয়েছিল—বড়লোকেরা এসব বেগুন-ফুলুরি ভাজা খায় না। তারা খায় কোরমা-কোপতা।

খাওয়া হয়ে গেলেই অরবিন্দ চলে আসছিল। হারান ওরা এসে আরো কিছুটা দেরি করিয়ে দিলে।

কলকাতায় ফিরতে তাই এগারটা বেজে গেল। মানসী এতক্ষণে স্কুল চলে গেছে। তাই বাড়ির দিকে না গিয়ে অরবিন্দ সোজা কমরেড চ্যাটার্জীর ওখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। জমিয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাবে। খাবার পাট তো একরকম চুকিয়েই এসেছে শান্তিনগর থেকে। দুপুরে বাড়ি ফেরার তাই প্রয়োজনই বোধ করেনি সে।

তারপর সন্ধ্যেবেলায় যখন বাড়ি ফিরলো, মানসীর সে কি রাগ।

গত রাত্রে অরবিন্দ বাড়ি ফিরতে পারেনি কারণ বিকেলে রমার হাতের চা খেয়েই মিটিং করতে চলে যায়। মিটিং শেষ হতে রাত হয়েছে বইকি। বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ ফাইলটার কথা মনে পড়লো। হ্যাঁ, ওটা রমার ঘরেই নিশ্চয় ফেলে এসেছে। দুপুরে খাওয়ার পর ঐ ঘরেই তো সে বিশ্রাম নিয়েছে। এমন কিছু অমূল্য জিনিষ নয়, পরে সুযোগমত আর একদিন এসে নিয়ে গেলেই হতো।

কিন্তু খেয়ালের মাথায় হঠাৎ অবিনাশবাবুর ডেরায় আবার এসে উপস্থিত হল সে। ফাইলটা নিয়েই চলে আসবে। পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপার।

বাড়িতে ঢুকে অরবিন্দ আশ্চর্য হয়ে গেল। বাড়ির লোকজন এর মধ্যেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। পাড়াগাঁ, মানুষ এখানে একটু তাড়া-তাড়িই ঘুমোয়।

রমার ঘরেই শুধু আলো জ্বলছে, ও তাহলে নিশ্চয় জেগে আছে।

যা ভেবেছিল তাই। অরবিন্দ দরজায় টোকা দিতেই বলে উঠলো—কে?

—আমি।

গলাটা চিনতে একমুহূর্তও দেরি হল না রমার। সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকে বিছানার উপর খোলা বইটা লক্ষ্য করে অরবিন্দ বললে—এখনও ঘুমোওনি, বই পড়ছিলে বুঝি ?

—হ্যাঁ, গম্ভীর গলায় উত্তর দিলে। বিস্মিত দৃষ্টিটা অরবিন্দর মুখের দিকে তুলে প্রশ্ন করলে—কিন্তু তুমি এমন অসময়ে ?

—আমার ফাইলটা ভুলে এখানে ফেলে গেছি—নিতে এসেছি।

ফাইলটা রমার ঘরে কাঠের টেবিলটার উপরই পড়েছিল। নিয়েই চলে যেতে পারতো অরবিন্দ।

কিন্তু হঠাৎ একটা খেয়াল চাপল অরবিন্দের মাথায়। রমার খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে খোলা বই খানার দিকে হাত বাড়ালো। রমা অমনি ছোঁ মেরে বইটা তুলে নিলে।

—দেখি, কি বই পড়ছিলে ?

—না।—রমা প্রতিবাদ করে ওঠে। বইটা পিছনে লুকোবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারলো না।

অরবিন্দ জোর করেই বইখানা ছিনিয়ে নিলে ওর হাত থেকে।—'চোখের বালি'। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' পড়ছিল রমা। তা লুকোবার মত কিছু ব্যাপার নয়। বইখানা ওদের পাড়ার কোন মহিলার কাছ থেকে যেন যোগাড় করেছে। বইয়ের প্রথম পাতায় তাঁর নাম ঠিকানা।

বইটা রমার হাতে ফিরিয়ে দিতেই রমা বলে উঠে—ফাইল নিতে এসে আমার বই নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করলে কেন ?—একটু চুপ করে থেকে ঠাট্টার হাসি হেসে বললে—তুমি দেখছি, অনেকটা চোখের বালির মহেন্দ্রর মতই কাণ্ড করলে।

কথাটা শুনে অরবিন্দ একটু কৌতুক বোধ করে। বলে—কিন্তু তফাৎ আছে—মহেন্দ্রকে চোখের বালির বিনোদিনী সত্যিই তো আর ভালোবাসতো না। ভালোবাসার খেলা খেলছিল।

কথাটা শুনেই রমা বুঝি চটে গেল।—আর তোমাকে আমি বুঝি সত্যি-সত্যি ? উত্তেজনায় সে কথা গুলিয়ে ফেলে। ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপতে থাকে। প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

অরবিন্দ কি করবে ভেবে পায় না। থতমত খেয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বলে—আমার ঘাট হয়েছে, মাপ করো।

অরবিন্দর কথা কানে ঢুকলো কিনা বোঝা গেল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। অরবিন্দ তখন করে কি!

আস্তে রমার হাত ধরে বলে—কেঁদোনা লক্ষ্মীটি।

রমা চট করে সামলে নিলে নিজেকে। হাত সরিয়ে নিয়ে বললে—ঐ যে টেবিলের ওপর তোমার ফাইল, নিয়ে যাও।

ফাইলটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে অরবিন্দ নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ওর ঘর থেকে। আসার আগে ওর সঙ্গে বারান্দায় হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এলেও রমা আর একটি কথাও বলেনি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল অরবিন্দর।

অনর্থক কেন যে ঐ ছেলেমানুষি করতে গেল সে! রমার কথা ভাবতে ভাবতে মোড়লের আস্তানায় এসে আবার ঢুকলো অরবিন্দ। না, এতরাত্রে আর কলকাতায় ফিরে যাবার চেষ্টা না করাই ভালো।

মানসীর জন্যই অপেক্ষা করছিল ভজুয়া। বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই ভজুয়ার সঙ্গে দেখা। দরজার সামনে চুপচাপ বসেছিল সে।

মানসী তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করে—কখন এলে?

—এই তো।—ভজুয়া দুঃখী দুঃখী মুখ করে উত্তর দেয়।

মানসী চিন্তায় পড়ে যায়। কোন দুঃসংবাদ নিয়ে আসেনি তো। বাবার শরীর অনেকদিন থেকেই তো ভালো যাচ্ছে না।

দরজা খুলে ভজুয়াকে নিয়ে মানসী বাড়িতে ঢোকে। দু'জনে বারান্দাতেই বসে পড়ে—মাদুর পেতে।

—সবাই ভালো আছেন তো?—মানসী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে ভজুয়াকে।

—না, ভালো আর থাকবেন কি করে?—হতাশার সুরে ভজুয়া বলে কর্তাবাবুকে দেখবার কেউ নেই। ওদিকে মায়েরও বাড়াবাড়ি অসুখ।

—মা এখন বাড়িতে ফিরে এসেছেন?—মানসী জিজ্ঞেস করে।

ঠোঁট উল্টে ভজুয়া আক্ষেপের ভাবে বলে—কর্তাবাবু একবার গিয়ে

নিয়ে এসেছিলেন। দু'দিন বাদেই আবার রাগারাগি করে ছোট মামার বাড়িতে চলে গেছেন। কর্তাবাবুর উপরই ওঁর যত রাগ।

খবরটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল মানসীর।

—ছোটমামীমা একবার তোমাকে যেতে বলেছেন।—বলেই ভজুয়া তার জামার পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে মানসীর হাতে দেয়।

মানসী এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে চিঠিখানা। মায়ের অসুখের খবর দিয়ে ছোটমামীমা চিঠি দিয়েছেন—মানসীকে একবার গিয়ে দেখে আসতে বলেছেন।

মাকে দেখতে কি মানসীর ইচ্ছে করে না?

করে। বিয়ের পর থেকে মা-বাবার কারো সঙ্গেই তো ওর যোগাযোগ নেই। কিন্তু যোগাযোগ না থাকলেই কি সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়?

যায় না। ওঁদের কথা মনে হলে এখনও মানসীর চোখে জল আসে—মা-বাবাকে দুঃখ দিয়ে ও নিজেও কি কম দুঃখ পেয়েছে!

—কি ভাবছো দিদিমণি?—ভজুয়া ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করে: অভিমান ত্যাগ করে একদিন গিয়ে কর্তাবাবুকে দেখে এস। জামাই-এর উপর যত রাগই থাক না কেন, নিজের মেয়েকে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারবেন না।

কথাটা শুনেই মেজাজ গরম হয়ে উঠল মানসীর। বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই উত্তর দিলে—সে আমি বুঝবো 'খন।

ভজুয়া কেমন লজ্জি* হয়ে পড়লো। বললে—রাগ কোরনা দিদিমণি, বুড়ো মানুষ, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। কর্তাবাবুর দুঃখু দেখে—

ভজুয়ার দুটি চোখ ছলছল করে উঠলো।

মানসীর চোখে জল এসে গেল। অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিয়ে বললে—তুমি বোসো, আমি চা করে আনি।

—চা আবার কেন? ভজুয়া আরো কিছু হয়তো বলতো। কিন্তু পারলো না।

অরবিন্দ এসে উপস্থিত হল। ওকে দেখেই ভজুয়া উঠে পড়লো—আমি তাহলে এখন যাই।

ভজুয়া চলে গেল। চায়ের জন্য আর অপেক্ষা করতে রাজী হল না।

তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মনটা কেমন হুহু করে উঠল মানসীর।

ওর বিষণ্ণভাব লক্ষ্য করেই হয়তো অরবিন্দ ঠাট্টার ছলে বললে—বাপের বাড়ীর লোক দেখে বুঝি মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মানসী কোন উত্তর না দিয়েই নিজের কাজে চলে যায়।

স্নান সেরে রান্নাঘরে এসে ময়দা মাখছিল, অরবিন্দ ঘরে ঢুকে বলে উঠল—একি, এখনও চা হয়নি।

—এই তো এলে বাপু। একটু সবুর করো।—মানসী গম্ভীরমুখে উত্তর দিলে।

কথাগুলোয় সামান্য ঝাঁজ ছিল হয়তো। ভুরু কুঁচকে অরবিন্দ অমনি বলে উঠল—থাক্। আমার চায়ের দরকার নেই।—বলেই আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ময়দা মাখা ফেলে মানসীও বেরিয়ে এল ওর সঙ্গে। ওকি, ও দেখি চলে যাচ্ছে।

—কোথায় যাচ্ছ? চা খেয়ে যাবে না?

—না, জরুরী কাজ আছে।

কাজটাই সব থেকে বড় হয়ে গেল? মানসীর রাগ ধরে যায়। অরবিন্দ সেটা লক্ষ্যও করে না।

উঠোন পেরিয়ে সোজা গিয়ে রাস্তায় নামলো। যাবার আগে মানসীর দিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

অভিমানে-দুঃখে-রাগে মানসীর চোখ ফেটে কান্না এল। রাগ করে মানসী না হয় দুটো কড়া কথাই বলে ফেলেছে। বলার ইচ্ছে না থাকলেও মুখ ফস্কে কথাগুলো হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। তাই বলে চা না খেয়েই চলে যাবে।

ভজুয়ার মুখে মায়ের অসুখের খবর শোনার পর থেকেই মেজাজ খারাপ হয়েছিল মানসীর। না, সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গেছে। অরবিন্দকে ঐভাবে কথাগুলো বলা ওর উচিত হয়নি।

একসঙ্গে বসে চা খাবে বলে বাড়িতে ছুটে এসেছিল বেচারা, আর মানসী ওকে কড়া কথা বলে—

ময়দাটা ঢাকা দিয়ে মানসী শোবার ঘরে এসে বিছানায় চিত হয়ে পড়লো। না, অরবিন্দ ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আর বিছানা থেকে উঠবে না। বাড়ি ফিরে ও চা না খেলে মানসী নিজেও আজ আর চা খাবে না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল। সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘন হয়ে এল। ঘরে আলো না জ্বাললে কিছুই নজরে আসছে না। আশ্চর্য লোক এতক্ষণেও ফিরে এল না! মানসী ভেবেছিল রাগের মাথায় চলে গেছে, রাগ পড়ে গেলেই ফিরে আসবে। মানসীর উপর কতক্ষণ আর ও রাগ করে থাকতে পারে!

মানসী শেষপর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। উঠে আলো জ্বাললো। টেবিলের উপর টাইম্-পিসটা নির্ভুল গতিতে এগিয়ে চলেছে। রাত আটটা বাজতে চললো। তবু ফেরার নাম নেই অরবিন্দর।

বেশ ঠিক আছে। মানসীও আর যেচে কথা বলতে যাবে না ওর সঙ্গে। কথা না বললেও খাবার না-দিয়ে তো থাকতে পারবে না। রাতের খাবারটা ও আসার আগেই তৈরী করে রাখা ভালো। ময়দাটা মাখা পড়ে আছে। পরোটা ভেজে না রাখলে অনর্থক নষ্ট হয়ে যাবে। না, রান্নার পাটটা অরবিন্দ আসার আগেই সেরে ফেলা দরকার। মুখে যতই রাগ দেখাক, পেটে খিদে থাকলে না খেয়ে তো থাকতে পারবে না। অরবিন্দর স্বভাব জানা আছে। মানসী বরং না খেয়ে থাকতে পারে—অভিমান হলে।

হ্যাঁ, বেশি রাগ দেখালে মানসী তখন তাই করবে। তখন? তখন তো বাছাধনকে বাধ্য হয়েই হার মানতে হবে। মনে-মনে অরবিন্দর সঙ্গে ঝগড়া করতে-করতে মানসী বারান্দায় বেরিয়ে এল। ওমা, মনের ভুলে বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে সে। রান্নাঘরে আলোটাও কি সে জ্বালিয়ে রেখে গেছল?

রান্নাঘরে ঢুকেই চক্ষুস্থির মানসীর। অরবিন্দ স্টোভের উপর কেটলীতে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে বসে সিগারেট ধ্বংস করছে।

মানসীকে দেখে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললে—যাও, তুমি আবার এখানে কেন? শুয়ে পড় গিয়ে—আমি চা নিয়ে আসছি।

মানসীর রাগ অমনি পড়ে গেল। যাও, আর কাজ দেখাতে হবে না।
-অরবিন্দর কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো সে।

-কি কেমন জব্দ! —মানসীর চিবুক ধরে অরবিন্দ হাসতে-হাসতে

না, অরবিন্দ সত্যি-সত্যি রাগ করেনি ওর উপর।

মায়ের অসুখের সংবাদটা শোনার পর থেকে ঘুরে ফিরে ঐ কথাটাই নে পড়ছিল মানসীর। মা এখন কেমন আছেন কে জানে। না, কবার গিয়ে দেখেই আসবে মানসী। অরবিন্দকে জানানোর দরকার ? যেতে ও অবশ্য নিষেধ করবে না, তবু ওর কাছে কথাটা বলতে মন সঙ্কোচ লাগছিল।

ঠিক আছে, ওকে না জানিয়েই ছোটমামার বাড়িতে গিয়ে মাকে দেখে াসবে সে। কতক্ষণেরই বা ব্যাপার।

শনিবার স্কুল থেকে তাই একটু আগেই বেরিয়ে পড়লো মানসী। ড়িতে না এসে সোজা ছোটমামার ওখানে রওনা হল। শনিবার না য়ে রবিবার অনায়াসেই যেতে পারতো সে। কিন্তু তাহলে অরবিন্দকে কি দেওয়া চলতো না। কথাটা বলতেই হতো। ওর কাছে মিথ্যে থা বলে তো বেরুতে পারতো না।

মাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ভেবেছিল মানসী। কিন্তু খানে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। মায়ের শরীরের অবস্থা দেখে য়ের কথা ভুলে গেল সে।

খাটের উপর চিত হয়ে শুয়েছিলেন মানসীর মা। মুখখানা শুকিয়ে য়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

মানসী ওঁর পাশে গিয়ে বসলো। ওকে দেখেই মা কেমন চমকে ঠলেন—যেন চিনতে পারছে না।

অবাক হয়ে খানিক তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—মানু,··· কে দেখতে এসেছিস ? আমাকে ভুলে যাসনি ?—বলেই হু হু করে দে উঠলেন।

মানসী তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—তাড়াতাড়ি ভালো হ ওঠ।

কান্নাধরা গলায় মা বললেন—না, আমি আর ভালো হবো ন আমার যে কেউ নেই সংসারে। ছেলে-মেয়ে-স্বামী সবাই চলে গে আমাকে ছেড়ে

অনেক কষ্টে মানসী কান্না সামলায়! বলে—কেউ তোমাকে ছে যায়নি মা—

কথাটা শুনে মায়ের মুখে হাসি ফুটলো। হাতের চেটোয় চো জল মুছে বিছানার উপর উঠে বসলেন তিনি। সস্নেহে মানসীর চি ধরে বললেন—তাই বল, আমাকে তোরা ভুলে যাসনি।

ছোটমামীমা ঘরে ঢুকে টিপয়ের উপর চা-খাবার রেখে নিঃশ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মানসী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল মায়ের মুখের দিকে।

—নে, খেয়ে নে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। —মা বললেন ম্লান হেসে।

মানসী চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলে। মাকে দেখে সত্যি অ আশ্চর্য হয়ে গেছে মানসী। চরিত্রের সেই তেজ গেল কোথায়? মান আজ আর একটুও রাগ নেই ওঁর উপর। ওঁকে দেখলে এখন দুঃখই হ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল মানসী। ঘড়ির কাঁ দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লো একসময়। মা ও মামীমার কাছে বি নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। আর দেরি করলে বাড়ি ফিরতে স হয়ে যেত।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হল বৈকি। বাস থেকে নেমে তাড়াতাড়ি চালালো মানসী। বাড়ি ফিরে অরবিন্দ হয়তো ওর জন্যে অপেক্ষা ক বসে আছে। কিন্তু বাড়ির সামনে এসে অবাক হয়ে গেল। দর তখনও তালা ঝুলছে তার মানে ও এখনও বাড়ি ফেরেনি।

তা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। অরবিন্দর কাছে কোন বলতে হল না। মায়ের অসুখের কথা বললেই হয়তো মনে কর মানসীর বুঝি এখন বাপ-মায়ের কাছে যেতে না পেরে দুঃখ হচ্ছে

রবিন্দকে পেয়ে সুখী হয়নি। মুখে অবশ্য কিছুই বলতো না। কিন্তু নথ্যে একটা ধারণা করে মনে দুঃখ পেত। অনর্থক বেচারাকে দুঃখ দিয়ে াভ কি!

ঘরে ঢুকে মানসী জামা-কাপড় বদলে কলঘরে গিয়ে স্নানটা সেরে নলে। তখনও অরবিন্দর দেখা নেই। বিকেলে তাহলে ও অন্যকোথাও । খেয়ে নিয়েছে।

রান্নাঘরে গিয়ে মানসী রান্নার পাট সেরে ফেললো। এক তরকারী- াত। মন-মেজাজ ভালো না থাকলে কোন কাজই করতে ইচ্ছে করে া। মায়ের অবস্থা দেখে মনটা আজ সত্যি বড় খারাপ লাগছে।

রান্না সেরে মানসী আবার শোবার ঘরে ফিরে এল। এসে শুয়ে ড়লো। ঘড়িতে দশটা বাজল, তবু অরবিন্দ বাড়ি ফিরলো না। বাইরে তক্ষণ কি করছে? ···আজ তো কোন মিটিং নেই! মিটিং না াকলেও প্রায়দিনই তো এমনি রাত করে বাড়ি ফেরে। গেল সপ্তাহে তা শান্তিনগর থেকে ফিরলোই না।

কিছু জিজ্ঞেস করলে হেসে উড়িয়ে দেয় কথাটা। বলে—বৃটিশ ামলে বিপ্লবীদের গৃহবন্দী করে রাখা হতো। আমাকে কি তুমি সেই বেস্থায় ফেলতে চাও?

মানসীর রাগ ধরে যায়। বলে—বাড়ির সঙ্গে তাই বলে কোন ম্পর্ক রাখবে না?

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় মানসীর। াড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে দরজা খুলে দেয়।

অরবিন্দ তার চির অভ্যস্ত ব্যস্ততা নিয়ে বাড়িতে ঢুকলো। তীক্ষ্ণ ষ্টিতে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। —রাগের ভাবেই উত্তর দিলে মানসী।

—তুমি খেয়ে নিলেই পারতে।

মেজাজটা এবার আরো গরম হয়ে উঠলো মানসীর। রাত্রে অরবিন্দকে ফেলে কবে এক একা খেয়েছে সে? অরবিন্দ বাড়ি ফিরে এলে রোজ 'জনে একসঙ্গে বসেই তো খায়। সকালে ওকে অবশ্য আগে-ভাগে খয়েই স্কুলে চলে যেতে হয়। অরবিন্দ প্রায়দিনই তখন বাড়িতে থাকে

না। মানসী ওর খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে যায়। তুপুরে একটার আগে কোনদিনই তো বাড়ি ফেরে না।

—নাও, এবার দয়া করে স্নানটা সেরে এসো। বলেই মানসী রান্না-ঘরে গিয়ে ঢোকে। টেবিলে খাবার গুছিয়ে নিতে না নিতেই অরবিন্দ হাজির হয়। খুব চট করেই স্নান সেরে চলে এসেছে। মাথাটা পর্যন্ত ভালো করে মোছেনি।

—খুব খিদে পেয়ে গেছে দেখছি।—মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে বলে অরবিন্দ।

—খিদে পাবেনা? তোমার মত তো একগণ্ডা বন্ধু নেই আমার যে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে—

কথাটা ওকে আর শেষ করতে দেয়না অরবিন্দ। হাত ধরে টেনে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়ে দেয়—নাও, খেতে শুরু করে দাও।

নিজের ভাতের থালাটা কাছে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে· আমারও দারুণ খিদে পেয়েছে। বন্ধুদের বাড়িতে আজ কিছুই জোটেনি —বন্ধুগুলোও এখন হাড়-কিপটে হয়ে উঠেছে।

তরকারী দিয়ে ভাত মাখতে-মাখতে মানসী বলে—উঃ, খাবার সময়েও কথা!

—খাবার টেবিলেই তো যত গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনা হয়ে থাকে —ইতিহাস তো তাই বলে।

অন্যদিন হলে মানসী হয়তো সঙ্গে-সঙ্গে একটা টিপ্পনী কাটতো কিন্তু আজ আর কোন কথার উত্তরই দিলে না। কথা বলতে কেন যে আজ ইচ্ছেই করছিল না।

খাওয়া হয়ে গেলে তুজনে শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। খাটের কোণে চুপ করে বসে ছিল মানসী। মানসীর মনমরাভাব অরবিন্দর নজর এড়াল না। বিছানায় চিত হয়েই মানসীকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো—মেজাজটা আজ ভালো নেই মনে হচ্ছে। বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে, না?

কথাগুলো শুনেই কেমন কান্না পেয়ে গেল মানসীর। সেভাবটা সামলে নিয়ে উত্তর দিলে—বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে, তোমাকে বলেছে—

—বলার দরকার হয়না। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

মানসী আর কান্না সামলাতে পারলোনা। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো চোখ থেকে।

অরবিন্দ সঙ্গে-সঙ্গে কাছে টেনে নিলে ওকে।

মানসী অমনি সব ভুলে গেল। বাড়ির কথা—মায়ের অসুখের কথা—কিছুই আর মনে রইলো না। অরবিন্দ বুকে টেনে নিলে বিশ্ব-সংসার ভুলে যায় সে।

বিকেলবেলা। চা খেয়েই ভূপেশ আবার শোবার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

শূন্যপুরী। কোন কাজেই মন বসেনা। অনেক সাধ্যসাধনা করে ললিতাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু এসে দু'দিনও থাকতে পারলো না—রাগারাগি করে আবার চলে গেল। ভূপেশকে সে সত্যিই এখন আর সহ্য করতে পারছে না। ছেলে-মেয়ে দুটোর কেউ যদি কাছে থাকতো! মায়ের ধারাই পেয়েছে ওরা। তা নইলে ওরাই বা অমন হবে কেন? বাপ রাগ করেই না হয় দুটো কড়া কথা বলেছে, তাতেই ছেলের অপমান হয়ে গেল! অসুখের খবর পেয়েও একবার দেখতে এলনা। নিজেও তো বাপু এখন ছেলের বাপ হয়েছিস, বাপের দুঃখ বুঝতে পারিস না? সমীরের ছেলে কত আদরের ধন ওদের, তাকে এখন পর্যন্ত একবার চোখেও দেখলো না ভূপেশ। এ দুঃখের কথা কাউকে বলা যায় না, সহ্যকরাও কঠিন। মেয়েটা যদি অরবিন্দর মতো একটা বাউণ্ডুলে ছেলেকে বিয়ে করে না বসতো। কি দেখে যে বিয়ে করলো! পছন্দই যদি করবি উপযুক্ত পাত্রের কি অভাব ছিল দেশে?…আজ-কালকার ছেলে-মেয়েদের পছন্দের কোন বালাই নেই। বউকে খেতে-পরতে দেবার পর্যন্ত মুরোদ নেই ছোকরার। বিয়ে করার শখ আছে—তাও আবার মানসীর মত মেয়েকে।

মানসীকে নাকি এখন চাকরী করে খেতে হচ্ছে। তাছাড়া উপায়কি? বাপের কাছ থেকে টাকা নিতেও ওর অপমান।…অরবিন্দর কথাতেই সে ওঠে-বসে। আর কিছু না থাক অহংকারটা ঠিকই আছে ছোকরার। বিয়ের পর মানসীকে নিয়ে একবার ভূপেশকে প্রণাম করে যাওয়া উচিত ছিল না-কি? না, ওরা গুরুজনকেও প্রণাম করতে অপমান বোধ করে। ওরা যে কম্যুনিস্ট।

—ভূপেশ!—গলা খাঁকারি দিয়ে বারীন হঠাৎ ঘরে ঢুকলো। অপরাহ্ণের আলো তখন ম্লান হয়ে এসেছে। ঘরের আনাচে-কানাচে চাপ-চাপ অন্ধকার।

ঘরে ঢুকেই আলোর সুইচটা অন্ করে দিলে বারীন।

ভূপেশ তাড়াতাড়ি খাটের উপর উঠে বসলো—সন্ধেবেলায় শুয়ে থাকতে দেখলে বারীন বেশ বিরক্ত হয়। মুখে ওর সঙ্গে যতই তর্ক করুক না কেন। বারীন অসন্তুষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ করতে চায়না ভূপেশ।

—বোসো।

খাটের পাশে চেয়ারে বসে পড়লো বারীন। ঈষৎ হেসে জিজ্ঞেস করলে—আজ কেমন আছ?

—ভালো।—কথাটার সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ে ভূপেশের।

বারীন হেসে ফেলে। —ভালো যখন আছ, তখন অত বড় দীর্ঘশ্বাস কেন? ভালো থাকাটা তো কোন শোকের কথা নয়।

সবকিছু নিয়েই রসিকতা করা চাই বারীনের। ভূপেশের মুখের দিকে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে—প্রেসারটা তো এখন স্বাভাবিক হয়েছে—কোর্টে যেতে আরম্ভ কর না কেন?

কথাটা ভূপেশও কয়েকদিন থেকে ভাবছে। কোর্টে গেলে—কাজ-কর্মের মধ্যে থাকলে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়। তাছাড়া, আর্থিক দিকটাও তো চিন্তা করা দরকার। জমানো টাকা বসে খেলে কতদিন থাকে! কথায় বলে—বসে খেলে রাজার গোলাও ফতুর হয়ে যায়।… বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের প্রয়োজন সব সময় টাকার।

—হ্যাঁ, কাল থেকেই কোর্টে যেতে শুরু করবো আবার। একা একা বাড়িতে বসে থাকতে ভালোও লাগে না।

--গিন্নীকে নিয়ে এসো না।···কতদিন আর ভাইয়ের বাড়িতে থাকবেন ?

—নিয়ে তো এলাম, রাখতে পারলাম কই ?

—এবার পারবে !···গিয়েই দেখ না।

ভূপেশ ওর কথা ধরতে পারে না। কি বলতে চাইছে ও ? ভূপেশের চিন্তা অনুসরণ করেই যেন বারীন বলে—ভজুয়ার মুখে শুনলাম, মানসী নাকি তার মাকে দেখতে গিয়েছিল। মেয়েকে দেখার পর থেকেই নাকি অনেক নরম হয়ে পড়েছেন ললিতাদেবী।—একটু চুপ করে থেকে বলে—তুমি আনতে না গেলে নিজেই হয়তো একদিন চলে আসবেন।—বলেই বারীন হো হো করে হেসে উঠলো নিজের রসিকতায়।

মানসী ললিতাকে দেখতে গিয়েছিল খবরটা শুনে ভূপেশ কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। মায়ের কথা এতদিন পরে তাহলে মেয়ের মনে পড়েছে। সত্যি কথা বলতে কি ঐ মেয়ের জন্যই ললিতার আজ এই অবস্থা। মানসী বাড়ি থেকে ঐভাবে চলে না গেলে—

নিজের অজান্তেই আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভূপেশ। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বারীন কি যেন ভাবে একটু। তারপর বলে—কিছু ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বারীনকে চা দেওয়া হয়নি।—ভূপেশের হঠাৎ খেয়াল হয়—এই দেখ, এখনও তোমাকে চা দিল না।···যত সব অকর্মার ধাড়া। বলেই ভূপেশ চেঁচিয়ে ডাক দেয় বেয়ারাকে—সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে আসে সে।

ভূপেশ অসুস্থ হবার পর থেকে ছোকরা দোতলাতে থাকে সর্বক্ষণ। সামনে এলেই ভূপেশ তাকে কষে এক ধমক লাগালো—কাকাবাবুকে এখনও চা দিলি না।

ছোকরা অমনি ছুটে চলে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা-সন্দেশ নিয়ে হাজির হয় আবার।

বারীন চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয়। সন্দেশের প্লেটটা লক্ষ্য করে মৃদু হেসে বলে—এ যে দেখছি মিষ্টি পদার্থ।

চায়ে চুমুক দিয়ে বলে—ললিতাদেবীর অভাবটা আমিও এখন হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।—ভূপেশের দিকে চেয়ে স্মিত হেসে বলে : মিষ্টি খেতে

দিয়ে তিনি কখনো আমাকে এমন শাস্তি দিতেন না।···আর কিছু না হলেও ছু'খানি নোনতা বিস্কুট অন্ততঃ দিতেন চায়ের সঙ্গে।

ভূপেশের সত্যি খেয়াল ছিল না। মিষ্টি পদার্থ বারীন একদম পছন্দ করে না। তাহলে বেয়ারাকে আগেই বলে দিত।···কড়া ঝাল দেওয়া মাংস ওর ভারী পছন্দ। ছুটির দিন ললিতা তাই প্রায়ই ওর জন্যে কড়া ঝাল দিয়ে দোপেয়াজী তৈরী করে রাখতো।

চা খেয়েই উঠে পড়লো বারীন। বারীনকে আজ ওর পছন্দসই কিছু খাওয়ানো গেল না। খেতে ও বড় ভালোবাসে। ললিতাও মানুষকে খাওয়াতে ভালোবাসে।···কাল সকালেই গিয়ে ললিতাকে নিয়ে আসবে ভূপেশ।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে অনুপের চিঠি পেল বাণী। দ্বিতীয় চিঠি। গেল সপ্তাহেও ওর একখানা চিঠি পেয়েছে সে। উত্তর দেওয়া হয়নি। এর মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে আবার চিঠি পাঠিয়েছে। এতদিন তো দিব্যি ওদের সবাইকে ছেড়ে ছিলে-বাপু। চিঠিটা পড়ে নিজের মনে হাসে বাণী। এমন ছেলেমানুষি দেখলে কার না হাসি পায়।

কিন্তু চিঠির শেষের দিকের কয়েকটা লাইন ভাবিয়ে তুললো ওকে। ওখানে নাকি আর মন টিকছে না অনুপের। কলকাতায় চলে আসার প্ল্যান করছে।

কিন্তু কলকাতায় এসে করবেটা কি? ঝোঁকের মাথায় এখানকার চাকরিটি তো ছেড়ে দিয়েছেন। না, হুট করে এখানে চলে এলে মহা অসুবিধায় পড়বে ও। এখন এখানে এসে কি আর চাকরি জোটাতে পারবে? কাকার সুপারিশ ছিল বলেই না অমন চাকরিটা পেয়ে গেছল। চাকরির চেষ্টায় কত বি-এ, এম-এ পাশ ছেলে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাকরি জুটছে?···

তাছাড়া থাকার জায়গাও তো চাই একটা। বউ নিয়ে কাকার সংসারে গিয়ে কি আর থাকতে পারবে? বিয়ের খবরটা পর্যন্ত কাকাকে জানায়নি সে। কাজটা মোটেই ভালো করেনি অনুপ। বাণীর বাবার মুখেই খবরটা প্রথম শুনলেন তিনি। মনে খুবই আঘাত পেয়েছেন নিশ্চয়।

অনুপের চিঠিখানা বালিশের তলায় গুঁজে রেখে বাণী গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। থাক গে ওসব কথা। ওদের ব্যাপার ওরাই বুঝবে। বাণীর মাথা ঘামানোর দরকার কি!

দরকার না থাকলেও ওদের কথা না ভেবে থাকতে পারে না বাণী। স্নানের ঘরে কলের তলায় বসেও অনুপের চিঠির কথা মনে পড়ে। বাণীকে নাকি সে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে।

দিব্যি সুখে-শান্তিতে বউ নিয়ে ঘর করছিল। হঠাৎ মাথায় কলকাতায় আসার খেয়াল দেখা দিল কেন?···না, অনুপের এখন কলকাতায় না আসাই ভালো। বাণীর সম্পর্কে ওর মনে এখনও একটা অহেতুক দুর্বলতা আছে। মিতা জানতে পারলে দুঃখ পাবে বৈকি। কি প্রয়োজন অনর্থক ও বেচারীকে দুঃখ দিয়ে। দূরে আছে, দূরে থাকাই তো ভালো অনুপের পক্ষে। মিথ্যে জীবনে জট পাকিয়ে লাভ কি!

এই ঘটনার দিন পনের বাদে। অফিস খেকে বাড়ি ফিরে বাণী অবাক হয়ে গেল অনুপকে দেখে। চিঠিপত্র না দিয়েই হঠাৎ এসে হাজির হলো। বাণীর বাবার ঘরে বসে দিব্যি গল্প করছে তাঁর সঙ্গে।

—এ কি, তুমি হঠাৎ? বাণী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

অনুপ বোকার মতই উত্তর দেয়।—হঠাৎ আমার ইচ্ছে হলো তাই।

বাণীর বাবা কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।—বাণীকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—যাক; বাঁচা গেল, তুমি এসে গেছ। এবার চটপট একটু চায়ের যোগাড় দেখ তো? রামলালটা কোথায় গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে কে জানে।

বাণী কোন কথা না বলেই বেরিয়ে এল। রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। রামলালকে কাছে-পিঠে কোথাও দেখা গেল না, ছেলেটার কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই। বিকেলে সময়মত বাবাকে যে একটু চা দেবে তাও পারে না।

খানিকবাদে ট্রে করে চা-বিস্কুট নিয়ে বাবার ঘরে ঢুকে বাণী দেখে অনুপ একাই বসে আছে—গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছে নিজের মনে।

বাণীকে দেখে যেন সজাগ হয়ে উঠলো। বললে—কাকাবাবু হাতমুখ ধুতে গেছেন।

—জানি।—চায়ে দুধ মেশাতে-মেশাতে বাণী বলে। বাবার বেরুনোর সময় হয়ে গেছে—আর দেরি হলে না খেয়েই হয়তো বেরিয়ে যেতেন—রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতেন না।

বাণীর কথা শেষ হতে না হতেই বাণীর বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন! বাণীর দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হেসে বললেন—বাবার নামে নালিশ করা হচ্ছিল, না?

—করবো না? তুমি অসুস্থ শরীর নিয়ে এখনও রাত করে বাড়ি ফের—নালিশ করবো না?

—বোকা মেয়ে, বুড়ো বয়েসে কি আর অভ্যাস পালটানো যায়? ···দাও, চটপট চা-টা দাও দেখি। আমার সত্যি দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে তো আবার এসে তোমার বকুনি খেতে হবে।

দু'জনার হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় বাণী।

চায়ে চুমুক দিয়ে বারীন বলেন—শুধু চা বিস্কুট দিয়ে অনুপকে আজ অভ্যর্থনা করলে? ঘরে মিষ্টি পদার্থ কিছু নেই নাকি?

নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বাণী আস্তে মাথা নাড়ে।

—আর কিছু না থাক, আমার জন্য ছানা কেটে যে সন্দেশ বানিয়েছ, তাই না হয় দুটো নিয়ে এস ওর জন্য।

—ওকে আবার সন্দেশ বলে? না পড়েছে ক্ষীর, না পড়েছে ঘি, রোগীর পথ্য। ও জিনিস ওর মুখে রুচবে কেন? শুধু শুধু আমার বদনাম হবে। —বাণী বলে হাসির ছলে: আর একদিন এলে ওকে না হয় ভীমনাগের সন্দেশ খাইয়ে দেওয়া যাবে।

বাণীর বাবার মনটা সত্যি আজকাল কেমন নরম হয়ে পড়েছে। কাউকে খাওয়ানোর জন্যে উনি আগে কিন্তু এমন ব্যস্ত হয়ে পড়তেন না।

অনুপ নীরবে চা খেয়ে যায়। কোন কথা বলে না।

—ওকি, সন্দেশ দিলুম না বলে রাগ করলে নাকি? বিস্কুটটা তো খাবে! —অনুপকে লক্ষ্য করে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলে বাণী।

অনুপ প্লেট থেকে একখানা বিস্কুট হাতে তুলে নেয়।

বাণীর বাবার চায়ের কাপ ততক্ষণে খালি হয়ে গেছে। খালি কাপ টিপয়ে নামিয়ে রেখে খাট থেকে হঠাৎ উঠে পড়েন তিনি। বলেন—তোমরা বসে গল্প কর ; আমি তাহলে চলি।—

বলেই গায়ে একটা জামা চড়িয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যান। যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে অনুপকে লক্ষ্য করে বলেন—ছুটির দিন দেখে আর একদিন এসো—বসে অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে।

তারপর সোজা রাস্তায় গিয়ে নামেন। দুঃখে-স্নেহে বাণীর বুক থেকে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। অনুপের দিকে চেয়ে বলে—বাবাকে নিয়ে সত্যি বড় ভাবনায় পড়েছি, শরীরটা ওঁর কিছুতেই যেন সারছে না।

—কাকাবাবু বড্ড অনিয়ম করেন। —অন্য কথা খুঁজে না পেয়েই যেন অনুপ মন্তব্য করে।

বাণী কিছু বলতে যাবে, এমন সময়ে রামলাল এসে হাজির হয় ব্যস্ত সমস্ত ভাবে। একগাল হেসে বলে—একি, দিদিমণি, তুমি এর মধ্যেই চা করে ফেলেছো ?

—না করে উপায় ? তোর ভরসায় থাকলেই হয়েছে।—ধমকের ভাবে বাণী বলে : যা এখন তাড়াতাড়ি রান্নার যোগাড় কর।

রামলাল ট্রেতে খালি চায়ের কাপগুলি নিয়ে আস্তে বেরিয়ে যায় ওর ঘর থেকে।

অনুপ নির্বাক হয়েই বসেছিল। বাণী তাকে জিজ্ঞেস করলে—তারপর কেমন আছ বল ?

—যেমন দেখছো।

—কোথায় আছ ?

—দিদির ওখানে।

—তা হঠাৎ কলকাতায় চলে এলে যে ?—বাণী আবার প্রশ্ন করে।

—ওখানে আর মন টিকছিল না। —একটু থেমে অনুপ বলে : কেন, আমার চিঠি পাওনি ? তাতেই তো—

—হ্যাঁ, লিখেছিলে, এখানে আর ভালো লাগছে না। কিন্তু সত্যি সত্যি চলে আসবে ভাবতে পারিনি।

—তোমাদের ছেড়ে দূরে থাকতে সত্যি ভালো লাগছিল না।—অনুপ চুপ করে কি যেন ভাবে একটু। তারপর বলে—চাকরিটা না পেলে অবশ্য আসা হত না। দরখাস্ত তো অনেকদিন থেকেই ছাড়ছিলাম এখানে-ওখানে। তবে এই স্কুলের চাকরিই আমার ভালো।

—হ্যাঁ। অফুরন্ত ছুটি মিলবে, অবসর মুহূর্তে কবিতা লেখাও চালিয়ে যেতে পারে।

—কবিতা লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি। —দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুপ উত্তর দেয়।

—বলকি, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছ ?

হাসির মুখ করে অনুপ অমনি আবৃত্তি শুরু করে,—

"কবিতা তোমায় দিলাম ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ॥"

—আশ্চর্য রিয়ালিসটিক্—বাস্তব কবিতা! বাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করে। তুমিও দেখছি এখন কবি সুকান্তর ভক্ত হয়ে উঠেছ।—পরিহাসের ছলে বাণী বলে: আমি তো ভাবছিলাম, তুমি এখন শুধু প্রেমের কবিতাই লিখে চলেছ।

অনুপ ওর ঠাট্টা গায়ে মাখলো না। গম্ভীর মুখে বললে—দরিদ্রের পক্ষে সুকান্তর ভক্ত না হয়ে উপায় আছে ?

—কিন্তু কবি সত্যিই কি কবিতাকে ছুটি দিতে পারে কখনো ?—বাণী পাল্টা জবাব দেয়: "কবিতা তোমায় দিলাম ছুটি···" কি অসাধারণ এক বলিষ্ঠ কবিতা বলোত ?

দু'জনে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বাণীই আবার কথা বললে —না, লেখাটা ছেড়ে দিয়ো না, আমার অনুরোধ।

—ঠিক আছে, কাল সকালে উঠেই আবার কাগজ কলম নিয়ে বসে যাব।—

টাইমপিস্‌টার দিকে নজর পড়তেই হঠাৎ যেন চমকে উঠলো অনুপ। বললে—কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। আমাকে তো অনেক দূরে যেতে হবে।

—হ্যাঁ, শান্তিনগর তো কম দূর নয়। —বাণী বলে : মিতাকেও নিয়ে এসেছে নিশ্চয়। আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে সায় দেয় অনুপ। কথা বলে না। বউ সম্পর্কে ওর এখনও লজ্জা ভাঙ্গলো না। বরাবরের লাজুক স্বভাবের ছেলে অনুপ। ···কিন্তু হুট করে মিতাকে বিয়ে করার বেলায় কিন্তু লজ্জা হল না। বাণী নিজের মনে হাসে। কথায় বলে—"সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।"

—আমি তাহলে এখন চলি। —অনুপ যাবার জন্যে উঠে পড়ে।

বাণীও আর বাধা দেয় না ওকে। সত্যিই তো অনেকটা রাস্তা, বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

অনুপ সত্যিই হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হল বউ নিয়ে। কলকাতায় কাকার অমন বাড়ি থাকতে শেষ পর্যন্ত গৌরীদের টিনের চালায় এসে ওরা উঠবে, গৌরী ভাবতেই পারেনি।

থাকার জায়গার অবশ্য কোন অভাব নেই। বাইরের ঘরটা ওদের ছেড়ে দিয়েছে গৌরী। রমা এদিকে ঠাকুরঘরের পাশে ছোট্ট ঘরটাতে চলে এসেছে। ছোট হলেও এই ঘরটি গৌরীদের ঘরের একেবারে লাগোয়া। সোমত্ত মেয়ে, কাছাকাছি থাকাই ভালো। রাত-বিরাতে আপদ-বিপদও হতে পারে। এ তল্লাটে বাজে লোকের তো অভাব নেই। তাছাড়া, সেদিনকার ঐ ব্যাপারটাতে মনে একটা খট্‌কা লেগে আছে।

উৎসাহ করে রমাই চটপট গুছিয়ে দিয়েছে অনুপের ঘর। অনুপের বউটি এসব ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ী। নিতান্ত ছেলেমানুষ। তবে পরমাসুন্দরী, সাক্ষাৎ ভগবতীর মত চেহারা। কিন্তু দু'বছর পূর্ণ হয়ে এল বিয়ে হয়েছে—কোলে এখনও বাচ্চা এল না। এই যা দুঃখ। আজকাল মেয়েদের তো বিয়ে হতে না হতেই—

তা এ নিয়ে অনুপের কোন ভাবনা নেই। কথাটা সে হেসেই উড়িয়ে দেয়। বলে—এত ব্যস্ত হয়েছ কেন, দিদি? সংসারে ভাইপো-ভাইঝি এলেই দিদির স্নেহে ভাগ বসাবে। আমাদের ভাগের ক্ষীরটুকু, দুধের সরটুকু তাদের পাতেই পড়বে। —বলেই অনুপ বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। এসব সাংসারিক কথা শুনতে ওর ভালো লাগে না। তবে বউকে চোখের

আড়াল করতে পারেনা অনুপ। বউও তাই। অনুপের বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলেই পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। এতটা বেহায়াপন ভালো নয়।

ব্যাপারটা রমার পর্যন্ত নজরে পড়েছে। ভালোবাসা পাবার সত্যি ভাগ্য আছে অনুপের। এই তো ওদের আসার খবর পেয়ে একসপ্তাহের মধ্যেই মানসী এসে হাজির হলো। বিয়ের পর এতদিন এ বাড়ির ছায়াও মাড়ায়নি। বিয়ের পর দিদি-জামাইবাবুকে এসে ওদের প্রণাম করে যাওয়া উচিত ছিল নাকি? এসব সামাজিকতা-জ্ঞান ওদের একেবারেই নেই। গুরুজনকে প্রণাম করতে ওদের অপমান হয়—ওরা যে কম্যুনিস্ট।

অথচ বিয়ের আগে কতদিন অনুপের সঙ্গে এসে দেখা করে গেছে গৌরীর সঙ্গে। অরবিন্দ অবশ্য এখন প্রায়ই আসে। মানসীকেও নিয়ে এলে পারে। মানসীর কথা জিজ্ঞেস করলে বলে—ওর একটুও সময় নেই। স্কুল, বাড়ির কাজ করে একদম সময় পায় না।

কিন্তু এখন তো সময়ের অভাব হল না। ইচ্ছে থাকলে সময়ের অভাব হয় কখনো?

হয় না। ভাইয়ের টানেই আজ বিকেলবেলায় এসে উপস্থিত হয়েছে মানসী। সহোদর ভাইয়ের মতই অনুপকে ভালোবাসে মানসী। কিন্তু যার জন্যে আসা তার কিন্তু দেখা পেল না। ছুটির দিন বলে সকালে বউকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে গেছে অনুপ। বেলা পড়ে এলেও বাড়ি ফিরে আসেনি।

এক মুখ হাসি নিয়ে মানসী গৌরীর ঘরে এসে ঢুকলো।

খাটের উপর গৌরী শুয়েছিল। তার পাশে বসে মানসী নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো—তোমার শরীর এত খারাপ কেউ বলেনি তো!

নিজের মনে গৌরী দুঃখের হাসি হাসে। দুঃখী মানুষের কথা কারো মনে থাকে। একটু চুপ করে থেকে বলে—অরবিন্দ তো প্রায়ই আসে। আমার অসুখের কথা কিছু বলেনি তোকে?

থতমত খেয়ে মানসী উত্তর দেয়—হ্যাঁ, বলেছিল, তোমার শরীরটা

ভালো নেই।...অনেকদিন থেকেই আসবো আসবো করছি, তা একদম সময় করে উঠতে পারিনি।

—হ্যাঁ, শুনলাম তুই নাকি চাকরি করছিস, কিন্তু কতদিন করতে পারবি? কোলে বাচ্চা এলে—

মানসী কথাটা চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস করে—তা, অনুপ ওরা কোথায়?

—দু'জনে আজ সকালে কলকাতায় বেড়াতে গেছে। মানসী কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময়ে রমা গৌরীর জন্য চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো।—ওমা, এ কাকে দেখছি। পথ ভুলে এলে নাকি?

কথাটা শুনেই মুখখানা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল মানসীর। না, এমন খোঁটা দিয়ে কথা বলা উচিত হয়নি রমার। এতদিন বাদে মেয়েটা বেড়াতে এসেছে।

গৌরী বিছানার উপর উঠে বসলো। খাটের পাশে টুলের উপর চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে গৌরীকে লক্ষ্য করে রমা বললে—তুমি খেয়ে নাও, আমি মানসীর জন্যে চা নিয়ে আসছি।—

বলেই দ্রুত পায়ে আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—অনুপের বউ কেমন হয়েছে দিদি? —মানসী জিজ্ঞেস করে: তোমার সেবা-যত্ন করে?

কথাটা শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—গৌরীর। বলে—রুগ্ন মনদের সেবা-যত্ন করার তার সময় কোথায়! অনুপ যতক্ষণ বাড়িতে থাকে চকাচকীর মত দু'টিতে বসে থাকে সর্বক্ষণ। দিদির কাছে ওদের দু-দণ্ড বসতে ইচ্ছে করে না।...তা অসুস্থ লোকের কাছে আসতে কারই বা ইচ্ছে করে।

গৌরীর কথা শেষ হতে না হতেই রমা চা নিয়ে আসে মানসীর জন্যে।

—একি শুধু চা কেন? মুড়ি আর দুটো নারকেলের নাড়ু অন্ততঃ দ।

—না, না, আমি এখুনি খেয়ে বেরিয়েছি। আর খাব না।

রমা আস্তে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মানসী বলে—রমাদি তোমার খুব যত্ন নেয়, না দিদি?

—তা নেয়, তবে কতদিন নেবে কে জানে।

চায়ে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে মানসী প্রশ্নভরা চোখে তাকায় গৌরীর দিকে।

কথাটা গৌরী চেপে রাখতে পারে না। বলে—এতদিন তো দিব্যি ছিল, সংসারের কাজকর্ম নিয়েই থাকতো। এখন কেমন যেন উড়ু-উড়ু মন হয়েছে, সমস্ত বয়স কিছু বলা যায় না।

খালি চায়ের কাপ টুলের উপর নামিয়ে রাখে গৌরী।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে মানসী বলে—কি যে বল তুমি, রমাদির মত মেয়ে হয় না। ওকে তুমি কখনোই ভুল বুঝো না।

—থাক, আমাকে আর তোর উপদেশ দিতে হবে না। সেই বাচ্চা বয়স থেকে ওকে আমি দেখে আসছি, আমার চেয়ে তুই বেশি চিনিস ওকে ?

মানসী চুপ করে যায়।

—তা তুই একলা এলি যে বড় ? গৌরী জিজ্ঞেস করে।

—কলকাতায় আজ ওঁর মিটিং আছে, তাই আসতে পারলো না।

—এমনি তে তো কতদিন এখানেই পড়ে থাকে।

—তা এখানেও তো ওদের পার্টির কাজ আছে।

—রাত্রে তো আর পার্টির কাজ থাকে না। তোকে একলা রেখে অন্যত্র রাত কাটানো—

কথাটা শুনেই মানসী যেন চটে গেল গৌরীর উপর। ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবতে লাগলো। সরল মেয়ে, স্বামীর বিরুদ্ধে ও কোন কথা শুনতে রাজী নয়।

-ওকে তুমি জানো না দিদি।—রাগের ভঙ্গিতেই বলে উঠলো মানসী।

—আমার জেনে আর দরকার নেই। রমার সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না—পুরুষমানুষকে বিশ্বাস আছে ?

গৌরীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ ঝড়ের মত এসে ঘরে ঢুকলো। ভাগ্যিস ঐ কথাগুলো শুনতে পায়নি। ওদের দুজনের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে বলে উঠলো—মুখ গোমড়া করে দুজনে বসে আছো

কন? ঝগড়া করছিলে নাকি?—বলেই হো হো করে হেসে উঠলো।
গৌরী চেষ্টা করে হাসলো।

মানসী কিন্তু হাসতে পারলো না। গম্ভীর হয়েই রইলো।

—অনুপ কোথায়?—অরবিন্দ জিজ্ঞেস করে।

—ওরা কলকাতায় বেড়াতে গেছে।—একটু থেমে গৌরী জিজ্ঞেস রে মানসীকে—তোরা খেয়েদেয়ে যাবি তো?

—না, আমরা এখুনি চলে যাবো। দেরি করার উপায় নেই।

—এখুনি যাবে? মানসীর দিকে চেয়ে অরবিন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে ঠে: অনুপের সঙ্গে দেখা না করেই?

—যাক, সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না।—মানসীর গলায় দস্তুর ত ধমকের সুর। মেয়ে এর মধ্যেই স্বামীকে ধমকাতে শুরু করেছে।

মানসীর মেজাজ দেখে কি অরবিন্দ ঘাবড়ে গেল? অবাক হয়ে ওর খের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললে—বেশ, চল।—বলেই আস্তে রিয়ে গেল ঘর থেকে। রমার সঙ্গে দেখা করতে গেল নিশ্চয়।

মানসী চুপ করে বসে ছিল। গৌরী তাকে লক্ষ্য করে বললে-য়েদেয়ে গেলেই পারতিস।—না, রাত হয়ে যাবে। বলেই মানসী উঠে ড়ল যাবার জন্যে

অনুপের সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল ওরা। গৌরীর কথায় কি গ করেছে মানসী?

শান্তিনগরে কি কুক্ষণেই যে গিয়েছিল মানসী। প্রথমে অনুপদার র যত রাগই হোক না কেন, বউ নিয়ে এতদিন বাদে ফিরে এসেছে ন অবধি ওখানে যাবার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সময়ের াবে কদিনের মধ্যে যেয়ে উঠতে পারেনি।

স্কুল করে বাড়িতে এসেও পরীক্ষার খাতা দেখতে হচ্ছে। তার উপর ারের কাজ তো আছেই। দু'জনার সংসার হলে কি হয়, খুঁটিনাটি কি কম।

শান্তিনগরে গিয়ে অনুপ ওদের না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

গৌরীদির চেহারা দেখেও কষ্ট হল। তা উনি-যদি ঐ সব আজেবাজে কথাগুলো না বলতেন। ওঁর স্বভাবই ঐ রকম—সন্দেহবাতিক চিরকালের ...অরবিন্দ ও রমাদিকে নিয়ে কি জঘন্য ইংগিত করলেন!

কথাগুলো শুনে মেজাজটা বিগড়ে গেছল বলেই না মানসী তাড়াতাড়ি চলে এল ওদের ওখান থেকে। গৌরীদির মুখের ওপর কোন কথা বলতে পারেনি সে। শত হলেও গুরুজন।...গুরুজন, কিন্তু মুখে কোন লাগাম নেই ওঁর।

কথাগুলো শুনে রাগে-লজ্জায় কান গরম হয়ে উঠেছিল মানসীর গৌরীদি খেয়েদেয়ে আসতে বলেছিলেন। অরবিন্দরও তাই ইচ্ছে হয়তো। অনুপ ওরাও এতক্ষণে ফিরে আসতো।

মানসী জিদ করেই অরবিন্দকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে ওদের সঙ্গে দেখা হলনা। তা আর কি করা যাবে।

না, মানসী আর যাচ্ছেনা ওখানে। অরবিন্দকেও নিষেধ করে দে ওখানে যেতে। দেখা করার ইচ্ছে থাকলে অনুপ নিজেও তো এর মধ্যে এসে একদিন দেখা করে যেতে পারতো।

রান্নাঘরে স্টোভে ভাত চড়িয়ে মানসী বসেছিল চুপচাপ। বাড়ির দোরগোড়ায় মানসীকে পৌঁছে দিয়েই অরবিন্দ 'আসছি' বলে সরে পড়েছে। আশ্চর্য মানুষ। শান্তিনগর থেকে এতটা পথ বাসে পাশাপাশি বসে এল, একটা কথা পর্যন্ত বললে না। জোর করে চলে এসেছে বলে হয়তো রাগ করেছে। কিম্বা মানসীর মেজাজ দেখে কথা বলার ভরসা পায়নি। মানসীকে অরবিন্দ সত্যিই কি ভয় করে? ঠাট্টার ছলে অবশ্য সেদিন কথাটা বলেছিল অরবিন্দ: স্বামী হবার সত্যি বড় জ্বালা সর্বক্ষণ স্ত্রীর ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়।

—কিন্তু তুমি তো স্বামী নও, কমরেড।—মানসী হেসে পাল্টা উত্তর দিয়েছিল।

—ব্রিলিয়াণ্ট! উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে মানসীর হাত ধরে তখনি এ ঝাঁকুনি দিয়েছিল অরবিন্দ।

উচ্ছ্বাসপ্রবণ সরলপ্রকৃতির মানুষ অরবিন্দ। এমন লোকের সম্বন্ধে মানুষ আজেবাজে সমালোচনা করে।

ভাতের জল তখন প্রায় শুকিয়ে গেছে। মাড় গালা যাবে না। ভাতটা তাহলে আর ঝুরঝুরে হবেনা আজ। সকালবেলার মাছের ঝোল কিছুটা আলাদা বাটিতে রাত্রের জন্য তুলে রেখেছিল মানসী। প্যাচপ্যাচ ভাত মাছের ঝোল দিয়ে খেতে ভালো লাগবে না। দুটো আলুসেদ্ধও যদি ভাতে ফেলে দিতো। একটু তেল কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাওয়া যেত।

ভাতটা নামিয়ে রেখে মানসী শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। আর অরবিন্দ তখুনি বাড়ি ফিরে এলো। এসেই চায়ের হুকুম—একটু চা পেলে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠতো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মানসী বললে—এমন অসময়ে আবার চা খাবে?

—চায়ের আবার সময়-অসময় আছে নাকি?—অরবিন্দ হেসে উত্তর দিলে।

মানসী রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। শান্তিনগর থেকে ফিরে অরবিন্দ চা না খেয়েই চলে গেছে। চায়ের তেষ্টা পেলেও মানসী তাই আর একলার জন্য চা করেনি। চা খায়নি বলেই মাথাটা টিপটিপ করছিল। সঙ্গদোষে মানসীকেও এখন চায়ের নেশায় পেয়েছে। বাইরে থেকে ঘুরে এলেই আজকাল ওর-ও চায়ের কথা মনে হয়।

রান্নাঘরে টেবিলে বসে দু'জনে চা খাচ্ছিল। মানসীকে লক্ষ্য করে অরবিন্দ হঠাৎ বলে উঠলো—তোমার কি হয়েছে বলোত?···কেমন নেমরা দেখাচ্ছে যেন।

—কি আবার হবে?— অতদূরে গেছি ক্লান্ত লাগবে না?

—অতদূরে তো আমিও গেছি।

—তোমার মত তো আমার লোহার শরীর নয়।—ঝাঁজের সঙ্গেই মানসী উত্তর দেয়।

—তা, ঠিক, শরীরটা তোমার লোহার নয়, মাখনের।—চায়ে চুমুক দিয়ে অরবিন্দ রসিকতার ছলে বলেঃ রাজার দুলালী—জন্মে-ইস্তক রূপোর চামচ মুখে।

রাগে-অভিমানে মানসীর কান্না পেয়ে যায়। সর্বক্ষণ ওর বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ। রাগ করে মানসী অরবিন্দর কথার উত্তর দেয় না।

বিকেলবেলায়। বাণী অফিস থেকে ফিরে আসার আগেই সুলেখা চিঠি পেল বারীন। আজ সকালের ডাকেই ছেড়েছে চিঠিখানা। ছো চিঠি ঃ অনেকদিন দেখা হয়না। শরীর ভালো থাকলে একবার এ দেখা করলে ভালো হয়। জরুরী কথা আছে। ইতি—সুলেখা

হ্যাঁ, আজই গিয়ে দেখা করতে হবে। এই ধরনের অনুরোধ তো করে না বড় একটা। বারীনের শরীর ভালো যাচ্ছে না বলে আজকাল ব ওকে বেশি ঘোরাঘুরি করতেই নিষেধ করে। ঠাট্টা করে একদিন বলেছি —বয়সের কথাটা একটু স্মরণ রাখা উচিত। পঁচিশ বছরের ছোকরাদে মত ছোটাছুটি করার এখন আর বয়স নেই।

বারীন হেসে উত্তর দিয়েছিল—বয়সের কথা ভাবতে রাজী নই আমি …বয়স হলে বয়সের হিসাব না রাখাই ভালো।

স্নেহের হাসি হেসে সুলেখা চুপ করে গেছে। তাছাড়া কি আ করবে সে। উপদেশ দিয়ে বারীনকে সংশোধন করা যাবে না, সে বু নিয়েছে।

সেই সুলেখা আজ ওকে যাবার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। নিয়মি এখন আর ওর ওখানে যাওয়া হয়ে ওঠে না। স্বামীর মৃত্যুর পর একেবা একলা হয়ে পড়েছে—দেখাশুনা করার কেউ নেই বললেই হয় কপালটাই খারাপ সুলেখার, তা নইলে এমন হবে কেন? অফিস থেকে খরচা দিয়ে ভদ্রলোককে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল, বিশেষ ট্রেনিং-জন্য। ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এলে চাকরির আরো উন্নতি হতো।

যাবার আগে ভদ্রলোকের হঠাৎ খেয়াল চাপলো ছেলেকেও নিয়ে যাবেন। গিয়ে ওখানকার য়ুনিভারসিটিতে ভর্তি করে ছেলেকে। ওদেশের শিক্ষাই নাকি আলাদা।

বাধ্য হয়েই সুলেখাকে মত দিতে হলো। তা ওদেশে গিয়ে বা ছেলে দু'জনেই ভালো ছিলেন। হঠাৎ ঐ দুর্ঘটনাটা যদি না হত বাপের মৃত্যুর পরেই তো ছেলের দেশে ফিরে আসা উচিত ছিল।

সে যাই হোক। সুলেখা দেখা করার জন্যে যখন চিঠি লিখে কষ্ট হলেও আজই ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার। বাণী তখনও অফি থেকে ফেরেনি। চা খেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো বারীন

কাকুলিয়া রোড ওদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা পথ। এতখানি পথ হেঁটে যাওয়া তো সম্ভব নয়। অথচ বিকেলের দিকে ট্রামে-বাসে ওঠাও একটা লড়াইয়ের ব্যাপার।

বাসে চেপেই শেষ পর্যন্ত সুলেখাদের বাড়িতে এসে পৌছুল বারীন।

শোবার ঘরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বই পড়ছিল সুলেখা—বারীনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই খুশি হয়ে উঠলো।—আসুন।—স্মিত হেসে বললে।

চেয়ার থেকে উঠে বারীনের দিকে একখানি চেয়ার এগিয়ে দেয় সুলেখা।

চেয়ারে বসে বারীন বলে—কি ব্যাপার? একেবারে জরুরী তলব। সুলেখা সে কথার কোন উত্তর দেয় না। চেয়ারে বারীনের মুখোমুখি হয়ে বসে দুঃখের হাসি হাসে। নির্বাক হয়ে বারীনের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে—শরীরটা এখনও সারেনি দেখছি। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করেন না নিশ্চয়।···দুধ-ফল সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চালু করেনি।

—না, তা করেনি- বারীন হেসেই জবাব দেয়ঃ ব্যাপারটা অতি সহজ—'কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না।

সুলেখা ভুরু কুঁচকে বলে—না, শরীর নিয়ে এমন ছেলেখেলা করা ঠিক নয়—চটপট ভালো করে ফেলা দরকার।

—কিন্তু নতুন বইটাও তো চটপট লিখে ফেলা দরকার।—বারীন হাসির ছলে বলেঃ কবে যাবার ডাক পড়ে তার ঠিক আছে?

সুলেখা কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে। কথা বলে না।

বারীনই বলে যায়—বইটার আয়তন ক্রমশঃ বেশ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে—তা প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠার manuscript—পাণ্ডুলিপি।

—পাঁচশ পৃষ্ঠা!—সুলেখা সবিস্ময়ে বলেঃ আপনি দেখছি টলস্টয়ের War and peace-এর সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছেন।···লেখা হয়ে গেছে?

— লেখা শেষ হয়েছে।···correction, addition and alteration শুদ্ধি, সংযোজন ও পরিবর্তন-এর পালা চলছে এখন। কতটা সময় লাগবে

বলতে পারি না। যতই সংশোধন করছি, কিছুতেই যেন খুশি হতে পারছি না।

—এটাই স্বাভাবিক আপনার পক্ষে।···দাবি যেখানে বড়, অসন্তোষও সেখানে বেশি।

—যাকে বলে divine dissatisfaction

বারীন চুপ করে থাকে। সিগারেট ধরিয়ে সিগারেটে টান দেয়? তারপর সুলেখাকে লক্ষ্য করে বলে—আসল কথাটা এবার শোনা যাক. জরুরী আলোচনাটা কি নিয়ে?

সুলেখার মুখ হঠাৎ আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। বলে—নিজের দুঃখের কথা বলে কাউকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু একজনের কাছে অন্তত বলতে না পারলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।—কথাগুলো বলে সুলেখা একটু থামে। তারপর আবার বলে—ওর বাবা তো হঠাৎ ঐভাবে চলে গেলেন! নিজের ভাগ্যের দোহাই দিয়ে আঘাতটা সামলে উঠে-ছিলাম।···ভেবেছিলাম ছেলেটা একটা ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এলে মনে একটু শান্তি পাবো। এখন দেখছি ও আর এদেশে ফিরে আসবে না।

কথাগুলো বলতে গিয়ে সুলেখার বড় বড় চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠলো। জলভরা দৃষ্টিটা বারীনের মুখের দিকে রেখে বললে—আমার অদৃষ্টে শান্তি লেখা নেই।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বড় দুঃখ হল। তবু পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যেই বারীন বললে—আপনিও দেখছি এখন অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠলেন।

কথাটা শুনে সুলেখার মুখে ম্লান একটা হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।—কোন কথা বললে না। আস্তে উঠে দেরাজ থেকে একখানা চিঠি বের করে বারীনের হাতে দেয়। ওর ছেলের চিঠি।

চিঠিখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো বারীন। চিঠিতে কত অজুহাতই না দেখিয়েছে ছেলে। চাকরি-বাকরির দিক থেকে ওখানে নাকি অনেক ভালো স্কোপ্—সুযোগ আছে। তা, থাক্, তাই বলে নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে পড়ে থাকতে হবে? দেশে ঘোরার সত্যিই

ওর ইচ্ছে নেই, কোন প্রলোভনে পড়েছে নিশ্চয়। তা নইলে ওদেশের এত গুণগান গাইতো না। মা যে এখানে একলা পড়ে আছেন, একথাটাও তো একবার ভাবা উচিত ছিল।

চিঠিটা পড়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বারীনের। তবে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছুই বললো না সে। ছেলের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে উলটো বারীনের উপরই হয়তো বিরক্ত হবে সুলেখা। শত হলেও মা তো।

ওকে নিরুত্তর দেখে সুলেখা বললে—কি লিখবো, তাই ভাবছি।

—কিছু ঠিক করেছেন ?—অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে বারীন বলে।

—ঠিক কিছুই করতে পারিনি, তাই তো আপনকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম—আপনি যদি কিছু—

—এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি বলুন।

সুলেখা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয় কথাটা শুনে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—না, আমি খুব ভুল করেছি, আমার সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে আপনাকে—

কথাটা শেষ না করেই সুলেখা চুপ করে যায়। ওর অভিমান দেখে বারীন হেসে ফেলে। হাসির ছলে বলে—ঠিক ধরেছেন, সাংসারিক ব্যাপার আমি খুব অল্পই বুঝি, বুঝি না বললেই হয়।···ভূপেশ ওরা তো আমার উপর এজন্যে মধ্যে মধ্যে-ক্ষেপে যায়। বলে—

সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে বারীন হঠাৎ থেমে যায়। ওকি, ওর চোখে জল কেন ?

ছলছল চোখে বারীনের দিকে তাকিয়ে সুলেখা বলে উঠলো—আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করা সত্যিই ঠিক হয়নি।

অভিমান !—মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যায় বারীনের।

—না, অভিমানের কথা নয়।···অভিমান-দাবি কিছুই নেই আমার—আমি তো আপনাদের কেউ নই।

কথাটা শুনে বারীন একটু দুঃখ বোধ করে বৈকি ! বলে—কেউ নই।···হ্যাঁ, কিছুই তো দিতে পারিনি—পেয়েছি ছাড়া দেইনি।

সুলেখার চোখের জল ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। মুখে ম্লান হাসির

আভা। খানিক চুপ করে থেকে বারীনের মুখের উপর একটা অনাবিল প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে বলে—না, কিছু দিতে হবে না,…আমাদের সম্পর্ক সমস্ত দায়-দায়িত্বের বাইরে—তাই নয় কি?

বারীন স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সুলেখার মুখের দিকে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'লাবণ্য'! বলছে—"আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না; কোন চিহ্ন রাখার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন। বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।"

নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল বারীন। ঘরের মধ্যে একটা বোবা স্তব্ধতা।

—এত তন্ময় হয়ে কি ভাবছেন? সুলেখার কথায় চমক ভাঙ্গলো। ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে বারীন সিগারেট ধরায়। একমনে সিগারেট টেনে চলছিল, এমন সময়ে ছোকরা চাকরটি চা নিয়ে এলো।

টি পটে চা রেখেই ছোকরা বেরিয়ে যায়।

সুলেখাই চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় বারীনের হাতে।

চায়ে চুমুক দিয়ে বারীন বলে—বাণী কিছুদিন এখানে এসে থাকুক, কেমন?

সুলেখা চট করে উত্তর দিতে পারে না।

—আপত্তি আছে?—ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বারীন জিজ্ঞেস করে।

—আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।—সুলেখা ক্ষীণ-ম্লান হেসে বলে আমার পক্ষে তো খুশি হবারই কথা। কিন্তু আর একজনের দিকটাও তো চিন্তা করতে হবে।…মেয়েকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে না?

—কষ্ট তো অনেক কিছুতেই হয় মানুষের। কষ্টের হাত থেকে মানুষ ইচ্ছে করলেই কি রেহাই পায়?—কথাগুলো বলে একটু চুপ করে বারীন।

সুলেখা নির্বাক হয়ে চেয়েছিলো।

আগের কথার জের টেনে বারীন বলে—এই তো এতদিনের মধ্যে এখানে একবার আসতে পারিনি। আসি-আসি করেও শেষ পর্যন্ত আসা আর হয়ে ওঠেনি।…অদ্ভুত একটা ইনারসিয়া—আলসেমিতে পেয়ে

বসেছে যেন। মানতে না চাইলেও বয়স যে বাড়ছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কথাগুলো বলে বারীন চুপ করে থাকে।

সুলেখাও যেন কোন কথা খুঁজে পায় না। অসহায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

খানিকবাদে বলে—না, শরীরের এরকম অবহেলা করা ঠিক নয়, কলকাতা শহরে ভালো ডাক্তারের তো অভাব নেই।...আপনার হাতের কাছেই তো কত বড় ডাক্তার রয়েছেন।

হ্যাঁ। ডাক্তার মুখার্জী?—বারীন সশব্দে হেসে ওঠে। কলকাতায় ও তো এখন একজন নামজাদা হার্টস্পেশালিষ্ট।—ছেলের বয়সী হলেও ওর মত বন্ধু আমার কমই আছে। দু'দিন ওর সঙ্গে গিয়ে আড্ডা দিতে না পারলে যেন হাঁপিয়ে উঠি। তবে ডাক্তারীর চেয়ে রাজনীতি, দর্শন-সাহিত্য নিয়েই ওর সঙ্গে আমার বেশি আলোচনা হয়।

বারীন কি যেন ভাবছিলো নিজের মনে।

সুলেখা হঠাৎ বলে উঠলো—সত্যিকারের বন্ধু পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা—জীবনে রিয়েল আনডারস্ট্যানডিং—খাঁটি বন্ধুত্ব আর ক'জনের সঙ্গে হয়! সারাজীবন পাশাপাশি বাস করলেও হয়তো একজন আর একজনের মনের নাগাল পায়না।

সুলেখার কথাগুলি শুনে বারীন কেমন দূর-মনস্ক হয়ে পড়ে। কি ভাবছিল, মনে নেই। সুলেখার কথাতেই সম্বিৎ ফিরে এলো।—ঐ যা, আপনাকে তো কিছু খেতে দিলাম না।

—কেন, খানিক আগেই তো চা খেয়েছি।

—চা কি আবার একটা খাবার?

—না, এখন আর কিছু খাবো না। বাড়ি গিয়ে একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ফেলবো। বেশি রাত করে খেলে বাণী আজকাল বড্ড বকাবকি করে।

—তবু ভালো, বকুনি দেবার একজন লোক আছে। সুলেখা মৃদু হেসে বলে।

—তা হলে এখন চলি কেমন?

বারীন উঠে পড়ে। যাবার মুখে সুলেখার দিকে ফিরে বলে—শরীর ঠিক থাকলে শীগগিরই আবার একদিন আসতে চেষ্টা করবো। বলেই রাস্তায় গিয়ে নামে। ধীর-মন্থর পায়ে বারীন বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে যায়। সুলেখাকে দেখে আজ সত্যি বড় দুঃখ পেয়েছে সে। ওর চোখে এর আগে কোনদিন জল দেখেনি বারীন।

বাণীকে নিয়েই এখন যত চিন্তা বারীনের। বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলেই ভাবতে বসে যায়। কিন্তু শনিবার বিকেলে ডাঃ মুখার্জ্জীর চেম্বারে গিয়ে আড্ডায় বসলে কি সময়ের কথা মনে থাকে? আড্ডাটা শুধু ডাক্তারদেরই নয়, অনেক গুণীমানী জার্নালিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকেরাও এসে যোগ দেন সেখানে।

বাড়ি ফিরতে সত্যি আজ বেশ দেরি হয়ে গেছে। বারীনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বাণী বলে ওঠে—যাক, এসে গেছ, আমি তো ভাবছিলাম—

—কি ভাবছিলে মা?—তোমার বাবা বিবাগী হয়ে গেছে?

—নাও, একটু বিশ্রাম নিয়ে চটপট হাত মুখ ধুয়ে এসো।—বাণীর গলায় সস্নেহ শাসনের সুর।

বারীন বিশ্রামের ধার ধারে না। জামা-কাপড় বদলেই বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। শুধু হাত-মুখ নয়, মাথাটাও আজ ভালো করে ধুতে হবে, বেশ গরম লাগছে।

কলের তলায় মাথা পেতে বসে পড়ে সে। দিনদিনই যেন বাপের নেওটা হয়ে পড়ছে মেয়েটা। মরার আগে ওর একটা ব্যবস্থা করে যেতে হবে। ওর মা বেঁচে থাকলে এতদিন নিশ্চয়—ঘরে মা না থাকলে মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভাববে কে! বারীনের ওসব ধাতে পোষায় না। তাছাড়া বাপ-মা ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করবে এ প্রথাটা ওর কাছে কেমন সেকেলে মনে হয়। ব্যাপারটা জুলুমের মতই। বারীন তো ভূপেশ নয় যে মেয়ের মত না নিয়েই বিয়ে ঠিক করে ফেলবে। ছেলেমেয়ে তো বাপ-মায়ের সম্পত্তি নয়, স্বাধীন ইণ্ডিভিজুয়াল। বিয়ের ব্যাপারে ওদের মতটাই প্রধান। নিজে পছন্দ না করে বিয়ে করা অসম্ভব বাণীর পক্ষে।

তা সে রাজার ছেলে হলেই বা। বাণী অন্য ধাতুতে গড়া। অন্য পাঁচটা মেয়ের মত নয়। জীবনে কারো ছায়া হয়ে থাকতে পারবে না বাণী। বারীনই ওকে এই শিক্ষা দিয়েছে—স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে।

কিন্তু নিজে পছন্দ করেও তো বিয়ে করতে পারে বাণী। হ্যাঁ, ওর পছন্দমত পাত্র পাওয়া সত্যিই দুর্লভ এ সংসারে। প্রফেসর বোস তাঁর ভাইপোর সঙ্গে এর মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন—বাণীকে খুবই স্নেহ করেন তিনি।

বাণী সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলে প্রস্তাবটা। বারীনের মুখের উপরই ব'লে বসলো—বিয়ে-ফিয়ের মধ্যে আমার না যাওয়া ভালো বাবা। ···মনের উপর আর একজনের ষোল আনা দখল আমি মেনে নিতে পারবো না।

বারীন মৃদু আপত্তি তুলেছিলো। বলেছিলো—ব্যাপারটা উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মা।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বাণী মাথা নেড়ে বলেছিলো—ও কথা বোলোনা বাবা, এটা পুরুষপ্রধান সমাজ, ভুলে যাচ্ছো কেন? ···আইনের চোখে ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার থাকলেও সমাজে মেয়েদের সমান অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বারীন চুপ করে গেছে। সত্যিই তো ওর কথা না মেনে উপায় নেই। সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য থাকা পর্যন্ত মেয়েদের স্বাধীনতা সম্ভব নয়।···

কিন্তু তাই বলে কি মেয়েটা সারাজীবন আইবুড়ো হয়ে থাকবে?

শুধু বারীন নয়, বাণীর বিয়ের ভাবনা সুলেখাও ভাবছে। একটা কথার পর সেদিন ব'লে ফেললো—মেয়ের বিয়ে দেবেন না?

বারীন হালকা হেসে উত্তর দিয়েছিলো—আজকাল মা-বাবাকে কি আর মেয়ের বিয়ে দিতে হয়? মেয়ে নিজেই বিয়ে করে।

হ্যাঁ, পাত্রের সন্ধানও সুলেখা দিয়েছে। ওর এক ভাসুরপো যাদবপুর য়ুনিভারসিটিতে অধ্যাপনা করছিলো। সম্প্রতি লণ্ডনে গেছে ডক্টরেট করতে। সে ফিরে এলে যদি—

বারীন তেমন গা করেনি। বলেছে—ফিরেই আসুক আগে।

আঃ, মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে এখন। বারীন গা-মাথা মুছে বেরিয়ে

আসে বাথরুম থেকে। এসে দেখে বাণী ততক্ষণে টেবিলে খাবার সাজিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজে। সত্যি আজ বড় দেরি করে ফেলেছে বারীন। না, এবার থেকে আরো আগেই বাড়ি ফিরে আসবে সে। অনর্থক মেয়েটাকে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়।"

সেদিন অল্পসময়ের জন্যে দেখা হলেও রমার সঙ্গে কোন কথা হয়নি অরবিন্দর। রমা ইচ্ছে করেই হয়তো কথা বলেনি। সেদিনকার রাত্রের ঐ ঘটনার জন্যেই বোধহয় চটে গেছে ওর উপর। অরবিন্দ সত্যিই অন্যায় করেছিল। ফেলে আসা ফাইলটার জন্যে অত রাত্রে ওর ঘরে গিয়ে ঢোকা উচিত হয়নি। তারপর বই নিয়ে ওর সঙ্গে কাড়াকাড়ি—।

হ্যাঁ, একটু ছেলেমানুষি করে ফেলেছিলো অরবিন্দ। কিন্তু সেই কথা এতদিন মনে করে রাখবে। অরবিন্দ হেসে দুটো কথা বললেই হয়তো ওর রাগটা পড়ে যেত। কিন্তু কথা বলার সুযোগ পেলো কোথায়? বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই তো মানসী যাবার জন্য তাড়া দিলে। আপত্তি করলেই মেজাজ চড়ে যেত— যা একখানা মেজাজ হয়েছে আজ-কাল।

তারপর আরো বার কয়েক শান্তিনগরে যেতে হয়েছে অরবিন্দকে। মিটিং সেরেই তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। অবিনাশবাবুদের বাড়িতে যাবার সময় পায়নি। বাড়ি ফিরতে দেরি করলে মানসী আজকাল বেশ চটে যায়।

অরবিন্দ তাই এখন তোয়াজ করেই চলে মানসীকে। শান্তিনগর গেলেও সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসে। অরবিন্দ রাত্রে কোথাও থাকে ও পছন্দ করে না। বলে-রাত হলেও বাইরে থেকো না। বাড়িতে একা একা থাকতে আমার ভয় করে।

বা...পর তো আর কথা চলে না।

মতটাই ওন বলেই বিকেলবেলায় বারীনবাবুর ওখানে বেড়াতে গিয়ে-

ছিলো অরবিন্দ। গিয়ে অনুপের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সকালে ব্রেক-ফাস্ট সেরেই নাকি সে বাণীদের ওখানে চলে এসেছে। দুপুরের খাওয়া ওখনেই সেরে নিয়েছে।

অনুপের সঙ্গে বাণী শান্তিনগরে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে। অরবিন্দকে দেখেই উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো—যাক্, তুমি এসে গেছো, ভালোই হলো। চল, আমাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসবে।

—কোথায়।

—কোথায় আবার? —বাণী খিলখিল করে হেসে ওঠে: এমন গোধূলিলগ্নে অনুপ শান্তিনগরে ছাড়া আর কোথায় যেতে পারে, বল?

কৃত্রিম রোষের ভঙ্গিতে অনুপ বাণীর দিকে তাকায়। অরবিন্দ হেসে ফেলে। বলে—কিন্তু সেখানে আমাদের দু'জনকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন।

—এখনও সাবালক হয়নি ও। বাণী ঠাট্টার ছলে মন্তব্য করে: চল, ঘুরে আসি। রাত আটটা নাগাদ আবার বাড়িতে ফিরে আসতে পারলেই তো হল। —বাণী মুখ টিপে হাসে একটু।

-- চল, অরবিন্দ রাজী হয়ে যায়।

তিনজনে বাসে চেপে শেষ পর্যন্ত অবিনাশবাবুর বাড়িতে এসে পৌঁছুল।

সোজা অনুপের ঘরে এসে ঢুকলো সবাই। বলার আগেই ওরা বসে পড়ল খাটের উপর।

মিতা ঐ খাটের উপরই বসেছিলো। ওদের দেখেই উঠে পড়ে।

—যাই, চা নিয়ে আসি।

—না, চা পরে হবে। জরুরি কথাটা আগে সেরে ফেলা যাক।

—বাণী বাধা দেয় মিতাকে।

মিতা আবার বসে পড়ে খাটের উপর।

অনুপের দিকে চেয়ে বাণী বলে--দেরি না করে আসল কথাটা বলে ফেল।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল একটু বাদেই। অনুপের মাথায় হঠাৎ

একটা খেয়াল চেপেছে—গ্রামের গরীব মেয়েদের স্কুলের জন্যে টাকা তোলার উদ্দেশ্যে ওরা একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে চায়।

উদ্দেশ্য মহৎ নিঃসন্দেহে। কিন্তু যে বইটা করছে, তার নায়ক-নায়িকা যোগাড় করাই তো একটা দুরূহ ব্যাপার—বিশেষ করে ঐ গ্রাম গাঁয়ে। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, অভিনয় করা কি চারটিখানি কথা। নায়ক-নায়িকাদের বইএর মর্ম বোঝাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হবে। খাস কলকাতা হলে অবশ্য আলাদা কথা ছিলো—আরটিষ্টএর অভাব হত না। কিন্তু শান্তিনগরে অমিত লাবণ্য কোথেকে জোগাড় করবে অনুপ?

অরবিন্দ অনুপকে সেই প্রশ্ন করে।

—আমরা নিজেরাই না হয় অভিনয় করবো।—অনুপ মরিয়া হয়ে উত্তর দেয়।

—উত্তম প্রস্তাব।—বাণী সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়।

অরবিন্দের তখন রাজী না হয়ে উপায় কি! বলে—তাহলে কাকে কি পার্ট দেওয়া হবে ঠিক করা যাক।

অরবিন্দকে লক্ষ্য করে অনুপ বলে ওঠে—শোভনলালের পার্টটা তুমিই নাও—রাত-দিন বইয়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকার অভ্যাসটা তে তোমার রপ্তই আছে।

বাণী অমনি আপত্তি জানায়। বলে—না, অমিত রায়ের রোলই ওকে ভালো মানাবে। চটকদার কথা—বক্তৃতায় ওর জুড়ি কোথায়?

অরবিন্দ মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে। বলে—বক্তৃতা দিতে পারি কিন্তু ওসব কবিতা-ঠবিতা আমার আসবে না। আমার পক্ষে নিবারণ চক্রবর্তী হওয়া অসম্ভব।—অনুপের দিকে চেয়ে বলে—ও-পার্টটা তোমাকেই মানাবে।

—না, তোমাকে অমিতের রোলেই অভিনয় করতে হবে।—বাণী এককথায় নাকচ করে দেয় অরবিন্দের প্রস্তাব।

—কিন্তু লাবণ্য?—অরবিন্দ প্রশ্ন করে অনুপকে।

অনুপ চুপ করে কি যেন ভাবে একটু। তারপর দোমনাভাবে বলে—তাই তো ভাবছি—।

—কেন, বাণীই তো আছে।—বাণীর দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ বলে।

কথাটা শুনে অনুপের মুখ অমন বিমর্ষ হয়ে গেল কেন? নাটক, নাটক। নাটক তো জীবনের ইতিহাস নয়।

বাণী কিন্তু কোন আপত্তি তুললো না। হেসে বললে—আমাকে দিয়েও তোমরা শেষ পর্যন্ত কবিতা লিখিয়ে ছাড়বে?…"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও আজি তার রথ নিত্যই উধাও…" কিন্তু ঐ কথাটি বাদ দিতে হবে—"হে বন্ধু বিদায়।" বিদায়-ফিদায় আমি কাউকে দিতে পারবো না।…দুদিনের জীবন, এর মধ্যে আবার বিদায়ের প্রশ্ন আসে কি করে!

সবাই হেসে উঠল ওর কথায়।

—কিন্তু 'কেটি'?—অনুপ একটু বাদেই প্রশ্ন করে।

বাণী বলে—মানসীই তো আছে। প্রেমিকার রোলে ওকেই মানাবে ভালো।

—মিতাকে তা হলে 'লিসি'র পার্টটা দেওয়া যাক।—অনুপ বলে।

মিতা হেসে ফেলে। হাসিটা ভারী মিষ্টি।—অত স্মার্ট মেয়ের পার্ট আমি করতে পারবো কি?

—ও জন্যে ভাবতে হবে না। ওটা বাণীর উপরই আমরা ছেড়ে দিলাম।—অরবিন্দ বলে: ও ঠিক শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে।

—আমাকে 'লাবণ্য'র ছাত্রী সুরমার পার্ট-টা দিলেই ভালো হত কিন্তু।—মিতা মিষ্টি করে হাসলো আবার।

—তাতে তোমার অহঙ্কারে আঘাত লাগতো না?—অরবিন্দ ঠাট্টার ছলে উত্তর দেয়।

—কিন্তু যোগমায়া?—মিতা চুপ করে যায়। অনুপ যেন সমস্যায় পড়ে যায়।

—কেন, রমাই তো আছে হাতের কাছে।—অরবিন্দ বলে।

—ওকি রাজী হবে অভিনয় করতে? অনুপের প্রশ্ন।

—কেন হবে না? গরীব মেয়েদের স্কুলের জন্যে অভিনয় করা হচ্ছে! এতো একটা বড় সামাজিক কাজ। না করার কোন কারণই নেই।

অরবিন্দর কথা শেষ হতে না হতেই একখানা কাঁসার থালায় করে চায়ের কাপ নিয়ে রমা ঘরে ঢুকলো। ওকে দেখে সবাই উৎসাহিত হয়ে

ওঠে।—অনেকদিন বাঁচবে। রমাকে লক্ষ্য করে অনুপ বলে : 'তোমা কথাই হচ্ছিল।

—আমার অপরাধ —মুখ বেঁকিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে রমা উত্তর দেয় চায়ের কাপ সবার হাতে এগিয়ে দিয়ে রমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল অনুপ ওকে বাধা দেয়—তোমার চা-টাও এখানে নিয়ে এসো।

—আমি বৌদির সঙ্গে আগেই চা খেয়ে নিয়েছি।

—তা হলে একটু বোস।…তোমার সঙ্গে আমাদের একটা জরুরি কথা আছে।

—জরুরি কথা! আমার সঙ্গে! রমা আশ্চর্য হয়ে খাটের কোণ ঘেঁষে বসে পড়ে।

অনুপ সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করলো রমার কাছে। রমা চুপ করে শুনলো কথাগুলো। দেখতে দেখতে মুখখানা কেমন থমথমে হয়ে উঠলো তার।

অনুপের প্রস্তাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' রমা এর মধ্যে পড়ে ফেলেছে। নাটক-নভেল পড়ার দিকে ইদানীং ওর ঝোঁকটা হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে।

গুম হয়ে বসে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো রমা। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো—আমাকে যোগমায়ার পার্ট-এ অভিনয় করতে হবে?—আশ্চর্য একটা তিক্ত হাসির রেখা ফুটে উঠলো ওর মুখে।

থতমত খেয়ে অনুপ তখন ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে।—হ্যাঁ, এই পার্টটা তোমাকেই ভালো মানাবে—অরবিন্দ বলছিল।

কথাটা শুনেই রমা আচমকা খাট থেকে উঠে পড়ে। বলে—কিন্তু এসব নাটক-নভেলের মধ্যে আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

অরবিন্দর দিকে একটা রোষভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রমা আস্তে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দও।

রমা ওকে না দেখার ভান করে। উঠোনে নেমে ছুটে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকে মেঝেয় এমনভাবে বসে পড়লো কেন!

অরবিন্দ কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করল—তুমি এভাবে হঠাৎ চলে এলে কেন?

রমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—তোমরা সবাই মিলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, আর আমি বসে-বসে ঐ সব কথা শুনবো ?

তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ? কি বলছো তুমি ?

তা নয় তো কি ?···আমি বিধবা বলেই তো তোমরা বেছে বেছে আমাকে ঐ পার্টটা দিতে চেয়েছো। কিন্তু বিধবার পক্ষে অভিনয় করা যে দৃষ্টিকটু এটাও জানো না ?

—না, না, তুমি একেবারে ভুল বুঝেছো। তোমাকে নিয়ে আমরা মোটেই—। বাংলাসাহিত্যে যোগমায়ার মত মহীয়সী নারী অতি অল্পই আছে—ঐ ভূমিকায় অভিনয় কি সবাই করতে পারে ?

রমা তবু চুপ করে থাকে। অরবিন্দ আগের কথার জের টেনে বলে ছাড়া অভিনয় করা এখানে দৃষ্টিকটু হবে কেন ? একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যখন—

অরবিন্দকে আর কথা বলার সুযোগ দিলে না রমা। দস্তুর মত ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে।

—চুপ করো ? বক্তৃতা দিতে হলে অন্য জায়গায় যাও—আমার শান্তি নষ্ট করতে এসো না। বলেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল—সোজা গৌরীদির ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

অরবিন্দ হতভম্ব হয়ে গেল ওর আচরণ দেখে। রমার এই রূপ সম্পূর্ণ নতুন অরবিন্দর চোখে। এ যেন অন্য রমা। ওর মনের কোন দুর্বল জায়গায় ওর হয়তো অজ্ঞাতে আঘাত দিয়ে ফেলেছে।

নায়ক-নায়িকা ঠিক না হলেও বাড়ি ফিরে অনুপের থিয়েটারের পরিকল্পনাটা মানসীকে না জানিয়ে থাকতে পারলো না অরবিন্দ। থিয়েটারের ব্যাপারে মানসীরও কম উৎসাহ নেই। কলেজে পড়ার সময়েও ভূপেশবাবুর কথা অগ্রাহ্য করেই সে ওদের কথায় থিয়েটার করতে গেছে। তা নিয়ে কম অশান্তি হয়নি ওদের বাড়িতে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরেই মানসীর কাছে কথাটা তুললো অরবিন্দ।

—জান, শান্তিনগরে অনুপ একটা নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করছে।

—তাই নাকি!—মানসী উৎসাহিত হয়ে বলে: কি বই?

—রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'।

—শেষের কবিতা?...অনুপের সাহস তো কম নয়: ঐ বইয়ের নায়ক-নায়িকা ওখানে জোগাড় করবে কি ভাবে?

—ওখানে না পেলে এখান থেকেও তো পেতে পারে। একটু থেমে অরবিন্দ হেসে বলে—তোমাকে ওরা 'কেটি'-র ভূমিকায় নামাতে চায়।

—চাইলেই হল?...থিয়েটার করার আমার সময় কোথায়?

অরবিন্দ একটু আশ্চর্য হয় বৈকি। থিয়েটার গান-বাজনা সম্বন্ধে এককালে ওর প্রচণ্ড উৎসাহ ছিলো, কি হল হঠাৎ!

অরবিন্দর ভাবান্তর লক্ষ্য করেই যেন মানসী বলে—আসল কথা, অত ঝুঁকি এখন আর আমার শরীরে সইবে না—অতদূরে গিয়ে রিহার্সেল দেওয়া—

সে কথা পরে ভাবলেও চলবে।—অরবিন্দ উত্তর দেয়: থিয়েটারের পরিকল্পনা হয়তো শেষপর্যন্ত বাতিল করে দিতে হবে।...রমাকে যোগমায়ার পার্ট অভিনয় করতে বলায় সে তো রেগে আগুন।

—রাগবেই তো!...ওকে তোমরা থিয়েটার করতে বললে কোন আক্কেলে?...বিধবা মেয়ে—

—বিধবা মেয়ে বুঝি থিয়েটার করতে পারে না?—অরবিন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে—না, তুমি এখনও সেই পুরনো যুগে পড়ে আছ।

—হয়েছে আর বক্তৃতার কাজ নেই। মানসী থামিয়ে দেয় অরবিন্দকে। কিন্তু ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারে না।

লাবণ্যর পার্ট কাকে দিয়েছিল?

—বাণীকে।

—তোমাকে?

—অমিত রায়।—অরবিন্দ উত্তর দেয়: প্রথমে আমি আপত্তি করেছিলাম। শেষপর্যন্ত রাজী হয়ে গেলাম। একটু থেমে রসিকতার ছলে বললে—তা নইলে 'কেটির' সঙ্গে আমার বিয়ে হত কি করে!

—'কেটি' রাজী হলেও আমি কিন্তু অমিত রায়কে বিয়ে করতে রাজী হতাম না।—মানসী উত্তর দেয়।

—অপরাধ ?

—প্রেম করবে লাবণ্যের সঙ্গে আর ঘর করবে 'কেটিকে' নিয়ে ? সেটি হতে দিতাম না। কি যেন বলেছিল অমিত ? "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালোবাসারই। কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইলো দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

—ও সব আলোচনা কালকের জন্যে মুলতুবী থাক।—বলেই অরবিন্দ ওকে কাছে টেনে নেয়—কথা বলার আর সুযোগ দেয়না।

রবিবার। তা সত্ত্বেও সকালে চা চেয়েই অনুপ ব্যস্ত হয়ে পড়লো কলকাতায় যাবার জন্যে। হাতের খালি কাপটা নামিয়ে রেখে মিতাকে বললে—যাও, রমাদিকে বলে এসো—আজ দুপুরে আমি খাবো না।

—দুপুরে খাবে না ? কেন ?—মিতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—কলকাতায় যাবো। ফিরতে দেরি হবে।

মিতার মন খারাপ হয়ে যায়।—ছুটির দিনেও বাড়িতে থাকবে না ? —মিতা রাগের মাথায় বলে ঃ কলকাতায় কি মধু আছে ?

—ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা।...কলকাতার মর্ম তুমি কি বুঝবে ? —অনুপ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

—তা ওখানে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করলেই তো হয়।

—ইচ্ছে করলেই কি সব কিছু করতে পারে মানুষ !—বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মিতা চুপ করে বসে থাকে। খানিকপরে বলে—তা দুটি ভাতে-ভাত খেয়ে গেলেই তো হয়। সারাদিন না খেয়ে—

অনুপ হেসে ওঠে।—সারাদিন না খেয়ে থাকবো কেন ? কলকাতায় মানুষজন কি না খেয়ে থাকে ?

মিতার জেদ চেপে যায়। বলে—না, না খেয়ে যেতে পারবে না।

—ঠিক আছে, রমাদিকে আমার জন্যে চারটি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে বল।

রমাদি স্নান করতে গেছেন। মিতা নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে ছোট ডেকচিতে আলুসেদ্ধ ভাত চড়িয়ে দেয়।

রমা স্নান সেরে রান্নাঘরে ঢুকে তো অবাক—একি তুমি কি করছো?

—তোমার ভাই এখুনি কলকাতায় যাবেন, তাই—

রমা হেসে ওঠে।—ও, তাই বল!...তা নইলে শ্রীমতীকে আজ রান্নাঘরে—

মিতার গাম্ভীর্য লক্ষ্য করেই হয়তো রমা আর রসিকতা করার চেষ্টা করলোনা। সোজা বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে।

আতপচালের ভাত, সেদ্ধ হতে সময় লাগলো না। ভাত নামিয়ে একটু আলু-পেঁয়াজ ভেজে ফেললো। অনুপও তখনি স্নান সেরে হাজির হল রান্নাঘরে। বললে—তোমাদের ভাতের কতদূর?

—হয়ে গেছে। এখুনি খেতে বসে যেতে পার। মিতা উত্তর দেয়

অনুপের আর তর সইলো না। তখুনি বসে পড়লো পিঁড়ি পেতে।

আলু-সেদ্ধ দিয়ে ভাতটা মাখছিল অনুপ, রমা এসে দুচামচ গাওয়া ঘি ওর ভাতের উপর ঢেলে দিয়ে বললে—নাও, ঘি দিয়ে ভাতটা ভালো করে মেখে নাও।

সরবাটা ঘি বাড়িতেই তৈরী করেছে রমা।

ঘি আর আলুসেদ্ধ দিয়েই প্রায় সব ভাত খেয়ে নিলে অনুপ। মিতার ভাজা আলু-পেঁয়াজ স্পর্শও করলো না।

—ওকি, আলুভাজা পড়ে রইলো যে!—রমা জিজ্ঞেস করে অনুপকে

—না, ওটা এখন আর মুখে রুচবে না।—

—বেচারা এত কষ্ট করে ভাজলো।—রমা বলে মিতাকে লক্ষ্য করে।

অনুপ মুখ টিপে হাসে। বলে—তোমার ভাই-বৌ-এর আলুভাজা, না কাঠের কুঁচি বোঝা শক্ত—

ইচ্ছে করেই আলুটা একটু বেশি কড়া করে ভেজে ছিল মিতা। কড়া ভাজা খেতে, মুচমুচ করবে এই ভেবে। তা গরম গরম খেলে ভালোই লাগতো! ভালো না লাগলেও তো একটু খেতে পারতো

না, মিতার কোন কাজই আজকাল আর ওর পছন্দ হয়না।

বড় হাঁড়িতে রমা সবার ভাত চড়িয়ে দিলো।

অনুপের খাওয়া শেষ হতে না হতেই অনুপকে লক্ষ্য করে বলে—তুমি খাও, আমি ততক্ষণে দিদিকে তেলটা মাখিয়ে দেই গে।—

ছোট একটা বাটিতে গরম তেল নিয়ে রমা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

—বাবা, মানুষের কি সেবাই না করতে পারেন রমাদি।—কিছু না ভেবেই মিতা বলে।

—একটু শিখে রাখো—আখেরে কাজ দেবে।—সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করে অনুপ।

কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে যায় মিতার। যাবার আগে দুটি মিষ্টি কথা বলে যাবে তা নয়—

তাড়াহুড়ো করেই চলে গেল অনুপ। আসবে হয়তো সেই সন্ধ্যেয়। টির দিনেও বাড়িতে মন টেকে না। মন যে কোথায় পড়ে আছে! জিজ্ঞেস করলে সোজাসুজি কোন উত্তর দেয়না অনুপ। বলে—আমার সব বন্ধু-বান্ধবই তো কলকাতায়—তাদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা করলে মন ভালো লাগে!

বাণী-অরবিন্দ ওরা নাকি ওর আত্মীয়স্বজনের চেয়েও বেশি আপন। কথাটা শুনে সেদিন মিতার অভিমান হয়েছিলো বৈকি। বলেছিলো—তাহলে তাদের কাছে গিয়ে থাকলেই পারো। আমার কাছে কেন—

অনুপ সঙ্গে সঙ্গে ওকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলেছিলো—বোকা মেয়ে, ওদের সঙ্গে তোমার তুলনা হয়? ওরা হল আমার বন্ধু আর তুমি হলে আমার প্রেয়সী—

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। অনুপ তবু ফিরে এলো না। একলা ঘরে কি মন টেকে! তাছাড়া শহরে-মানুষ ও, নির্জন গ্রাম্যপরিবেশে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। গল্প করার মত একটি লোক নেই। দিদির মেয়েরা তো তাদের স্কুল, পড়াশুনা, খেলাধুলো নিয়েই ব্যস্ত।…রমাদি চব্বিশ ঘণ্টা রান্নাঘর আর দিদির পরিচর্যা নিয়ে আছেন। দিদির সঙ্গেই বা কি কথা বলবে মিতা। কোন ভালো আলোচনা করতে পারেন না উনি। ঘর-সংসার আর না হয় কাচ্চা-বাচ্চার কথা। মিতার কোলে বিয়ের বছরের মধ্যে বাচ্চা এল না, এ নিয়েও ওর মহাভাবনা।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজতেই মিতা বিছানা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উ পড়লো। বিকেলে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ দিদির কাছে গিয়ে ব দরকার। না হলে দিদি এবং দিদির ভাই দুজনেই অসন্তুষ্ট হন ওর উপর

দিদির ঘরে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই রমাদি চা নিয়ে এলেন ওদে জন্যে, সঙ্গে মুড়ির মোয়া।—নাও, তোমরা খেয়ে নাও, অনুপ কখ ফিরবে তার ঠিক আছে?—চায়ের কাপ দুজনের হাতে এগিয়ে দিলে তিনি।

—তুমি খাবে না?—মিতা জিজ্ঞেস করে।

—সে হবে 'খন। তোমরা খাও তো আগে।

—ওমা, মোয়া আবার কখন করলি?—গৌরীদি খুশি হয়ে বলেন অনুপের জন্যেও রেখেছিস তো?

—অনুপ কেন, তোমার ভগ্নিপতি—অরবিন্দর জন্যেও তুলে রেখে আলাদা করে।

কথাটা শুনে গৌরীদি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যেন। সেকে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ দিদি, ঠাট্টা-রসিকতা একদম পছন্দ করেন না।

রমাদি আস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

চা খাওয়া শেষ হলেই খালি চা-প্লেট তুলে নিয়ে মিতাও বেরি আসে দিদির ঘর থেকে।

বাইরে খোলা আকাশের নিচে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে বেশিক্ষণ অসুস্থ মানুষের কাছে বসে থাকলে ও যেন হাঁপিয়ে ওঠে উঠোনের একপাশে ছোট বাগানটিতে অজস্র লাল সন্ধ্যামালতী ফু আছে। পাশেই বেল ও যুঁই। বাগানটার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। মিতা প্রায় দিনই বিকেলে এই বাগান থেকে কিছু বে যুঁই তুলে প্লেটে করে তাদের শোবার ঘরে নিয়ে রাখে—জলের ছি দিয়ে। দেখতে সুন্দর হলে কি হয়, সন্ধ্যামালতী গন্ধ ছড়ায় না বেল-যু ফুলের মত। সংখ্যায় বেশি হলে, মিতা সেদিন মালা গেঁথে খোঁপ পরে। ফুলের মালা অনুপ বড় ভালোবাসে—মিতার মাথাটা বুকে কাছে নিয়ে বারবার চুমু খায়। বলে রোজ রোজ এরকম মালা মাথ পর না কেন?—রোজই তাহলে আমাদের ফুলশয্যা হতে পারে।

অনুপের মত স্বামী পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। মনটাই যা একটু উড়ু-উড়ু। কবি মানুষ ওদের মনের নাগাল পাওয়াই শক্ত।

যা ভেবেছিলো মিতা। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরলো না। যখন ফিরলো সঙ্গে অরবিন্দ। অরবিন্দকে ছাড়া যেন চলে না ওর। মানিক-জোড়।

মিতা মন খারাপ করে শোবার ঘরেই বসেছিলো। ওদের দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই উঠে পড়লো—যাই, রমাদিকে চায়ের কথা বলে আসি।

—শুধু চা কিন্তু।—অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে মিতাকে লক্ষ্য করে: বাণী যা খাওয়াটা আমাদের খাইয়েছে আজ! বেলা দুটোর পর পেট পুরে খাওয়া হয়েছে, পেটে আর জায়গা নেই।

মিতার একটু দুঃখ হয় কথাটা শুনে। সারাদিন তাহলে ওদের খুব আনন্দে কেটেছে। মিতা উল্টো ভেবেছিল—বেচারা অনুপ হয়তো দুপুরে না খেয়ে শুকিয়ে আছে।

বলার আগেই রমাদি কাঁসার থালায় চা আর মুড়ির মোয়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। খাবারটা লক্ষ্য করে অরবিন্দ অমনি বলে উঠলো—মোয়াগুলি নিয়ে যাও, পেটে আজ আর জায়গা নেই।

চায়ের কাপগুলি টেবিলে নামিয়ে রেখে রমাদি চলে যাচ্ছিলেন, অরবিন্দ অমনি বলে উঠলো—শুনে যাও, তোমার সঙ্গে আমাদের একটা জরুরী কথা আছে। থিয়েটারের প্রস্তাবটা আমরা বাতিল করে দিয়েছি।

প্রশ্নভরা চোখে রমাদি তাকিয়ে থাকেন।

অরবিন্দ বলে—উপযুক্ত নায়ক-নায়িকার অভাব—তাছাড়া ঐ বই করা কি সহজ কথা!

—আমাকে এসব বলে লাভ?

—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সব কিছু নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে হয়, এই আর কি!

—বন্ধু-বান্ধব! রমার মুখে ব্যঙ্গের হাসি: বন্ধু-বান্ধবের হঠাৎ খুব অভাব হয়ে পড়েছে বুঝি?

অরবিন্দ হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—আচ্ছা তুমি আজকাল হঠাৎ হঠাৎ এমন চটে চাও কেন বলোত ?

রমাদি আর দাঁড়ালেন না। রাগের ভঙ্গিতেই ঝট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। রাগটা ওর অরবিন্দর উপরই। কিন্তু কেন!

চা খেয়েই অরবিন্দ যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।—এবার যেতে হয়।

—এখনি যাবে ?—অনুপ বলে।

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। তোমার বোনটিকে তো জান, বাড়ি ফিরতে দেরি হলেই হয়েছে। সারারাত চলবে মানভঞ্জনের পালা।

—তুমিও এসব শিখে ফেলেছ।—অনুপ মিষ্টি করে হাসে।

—কেন, এটা কি শুধু তোমারই মনোপলি—একচেটিয়া ?···বিয়ে করলে ও ব্যাপারটা সব ছেলেকেই শিখতে হয়।

মিতা অনেক কষ্টে হাসি সামলায়।

—না চলি।—অরবিন্দ একলাফে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দিদির সঙ্গে দেখা করেই সোজা রাস্তায় গিয়ে নামে। অনুপ ঘরেই বসে থাকে—মিতার দিকে তাকিয়ে—কতকাল যেন মিতাকে সে দেখেনি।

—অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন ? কাছে এসে বসতে পার না ?—অনুপ বলে।

মিতা এবার অভিমান চাপতে পারে না। বলে, থাক, সারাদিন একলাটি পড়ে আছি, এখন এসে ভারী—

মিতার মান ভাঙ্গানো এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কাছে টেনে নিয়ে একটা চুমু খেলেই ওর রাগ জল হয়ে যায়। তারপর নিজেই আদর করতে শুরু করে।

কিন্তু ভরসন্ধ্যেয় এমন আদর-সোহাগ দেখলে মানুষ বলবে কি !

দরজাটা বন্ধ করার কথাও মনে হয়নি। মিতা তখনও ওর কোলে বসে গলা জড়িয়ে আদর করছে, বাইরে পায়ের শব্দ পেয়েই সরে বসলো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রমা বলে—তোমরা কি ঘুমিয়ে আছ ? ওদিকে দিদি ডেকে ডেকে সারা হচ্ছেন, শুনতে পাওনা ?

থতমমত খেয়ে অনুপ উঠে পড়ে। দিদির ঘরের দিকে রওনা হয় তাড়াতাড়ি। মিতা খাটের উপরই বসে থাকে।

দিদির ঘরে ঢুকে দিদিকে লক্ষ্য করে অনুপ জিজ্ঞেস করে—ডাকছিলে কেন ?

দিদি খাটের উপর বসেছিলেন গম্ভীর মুখে। চট করে কোন উত্তর দিলেন না। খানিকপরে বললেন—সারাদিন কোথায়-কোথায় ঘুরলি ? কাকার বাড়িতে গিয়েছিলি ?

—না।

—তা যাবি কেন ? ঐ কাকার কাছেই একদিন মানুষ হয়েছিস, মনে আছে ?

—থাকবেনা কেন? কিন্তু কোন মুখে ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো বলো ?

দিদি সেকথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললেন—মিতাকে নিয়ে একদিন প্রণাম করে আয়। আমার তো সামর্থ্য নেই। শুনছি, শরীরটা ওঁর খুবই ভেঙ্গে পড়েছে।

—আমি গেলেই কি ভাঙ্গা শরীর জোড়া লাগবে—সমীরকে দেখলে তবু—

দিদি আর কথা বলেন না। রমা দিদির খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে। অনুপকে লক্ষ্য করে বলে—দিদিকে খাইয়েই আমি তোমাদের খেতে দেব। হাত-মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও।

—না, আমি আজ রাত্রে আর কিছু খাবো না।

—বিকেলেও তো কিছু খেলে না।

—দুপুরে গুরুভোজন হয়ে গেছে—বারীনকাকার ওখানে। বাণী যা একখানা মেনু করেছিলো—

—কি খাওয়ালো শুনি ?—গৌরীদি প্রশ্ন করলেন।

—ফ্রায়েড রাইস, চিকেন কাটলেট, ছানার ডালনা, আলুবখড়ার চাটনী, তারপর পায়েস।···লোভে পড়ে বেশি খেয়ে ফেলেছি। রাত্রে উপোশ দেওয়াই ভালো।

গৌরীদি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন কথাগুলো শুনে। বললেন—আচ্ছা মেয়ে যাহক, এত রান্নার আয়োজন করেছে, সঙ্গে বউ নিয়ে যেতে বলা উচিত ছিলো।

—খেয়াল ছিলোনা হয়তো।—অনুপ উত্তর দেয়।

—খেয়াল ঠিকই ছিলো। ইচ্ছে করেই হয়তো বলেনি। আজকাল-কাল মেয়েদের ধরনই ঐরকম। বউকে বাদ দিয়ে তার স্বামীকে নিয়ে ঢলাঢলি।—গৌরীদির গলায় ব্যঙ্গের সুর।

অনুপের রাগ ধরে যায় কথাগুলো শুনে। দিদির ঐ এক স্বভাব—সবটাতেই সন্দেহ। মানসী ঐ জন্যেই তো ওর উপর অত বিরক্ত। পারতপক্ষে এখানে আসতে চায়না।

আশ্চর্য ব্যাপার, বাণীর খাবারের ফর্দ শুনে মিতাও চটে গেল অনুপের উপর। বললে—রাত্রে খাবে না, নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছ আগে বললেই পারতে—রমাদিকে তোমার চাল নিতে নিষেধ করে দিতাম।

মিতা সেই যে গুম হয়ে বসে রইলো আর উঠবার নাম নেই। রমা এসে খেতে ডাকলে আস্তে উঠে গেল। খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে এলেও মুখখানা থমথমে হয়ে আছে।

চুপচাপ টুলের উপর বসে রইলো সে।

—শোবে না?—অনুপ জিজ্ঞেস করলে ঝাঁঝিয়ে উঠলো।—না, তুমি শুয়ে পড়,—আমি আজ মাটিতে আলাদা শোব।

হতভম্ব হয়ে অনুপ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে—রাগ করেছো আমার উপর? কিন্তু কি অপরাধ সেটা তো বললে না।

—এখানে আমি এমন একলাটি পড়ে থাকতে পারবো না।

—বেশ তো, কলকাতায় বাসা পেলেই চলে যাবো।

—সে তো যাবেই। কলকাতায় কত মধু!

যা বাবা! বায়ে গেলেও দোষ, ডাইনে গেলেও দোষ।

অনুপ চুপ করে ভাবে।

মিতা মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ে।

একি, তুমি সত্যিই মেঝেতে শোবে? আমিও তাহলে—

না! মিতা ধমক দিয়ে ওঠে: আমি তাহলে বারান্দায় গিয়ে বসে থাকবো।

নিরুপায় অনুপ তখন করে কি! খাটের উপরই চিত হয়ে পড়ে।

ঘরের আলোটা মিতাই উঠে কমিয়ে দেয়। অনুপের দিকে পিছন ফিরেই শুয়ে থাকে সে। অনুপও আর ওর রাগ ভাঙ্গতে যায় না। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না চোখে। মিতা এত চটে গেল কেন? বারীন-কাকার ওখানে গিয়েছে বলে? বাণী ওকে যত্নকরে খাইয়েছে শুনেই কি! বাণীকে ও হয়তো এখন আর সহ্য করতে পারছে না। অনুপ ওকে ভালোবাসে এর মধ্যে দোষের কি আছে? ভালো তো সে অরবিন্দকেও বাসে। তাতে তো রাগ হয়না ওর।

ওকি, মিতা এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। খাট থেকে নেমে অনুপ ওর পাশে গিয়ে বসলো। গায়ে হাত রাখতেই মিতা রাগের ভঙ্গিতে এক ঝটকায় সরিয়ে দিলে ওর হাত। অনুপেরও রাগ হল। খাটের উপর গিয়ে চিত হয়ে পড়লো। কি ঈর্ষা! ঈর্ষা ওর বাণীর সম্পর্কে। বাণীর চরিত্রে হিংসা বলে কিছু নেই—অন্য ধাতুতে তৈরি সে। বাণীর কথা ভাবতে ভাবতে অনুপ ঘুমিয়ে পড়ে একসময়।

বারীনকাকার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না মানসীর। সকালবেলায় চা-জলখাবার খেয়েই তাই ওঁদের বাড়িতে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিলো সে। স্কুলও ছুটি ছিলো। ফিরে এসে ধীরে-সুস্থে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেই হবে। কিন্তু যাবার মুখেই বাধা পড়লো। ভজুয়া হঠাৎ এসে হাজির ছোট মামীমার চিঠি নিয়ে। মানসীকে এখনই একবার যেতে লিখেছেন, জরুরী প্রয়োজন। মানসী চিন্তায় পড়ে গেল। মায়ের অসুখ আবার বেশি হল নাকি? যাক, ওখানেই যাওয়া যাক এখন। বিকেলের দিকে না হয় বাণীদের বাড়িতে যাওয়া যাবে।

অরবিন্দ তখন বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। মানসীও বেরিয়ে এল ভজুয়ার সঙ্গে। দুজনে বাসে উঠে পড়লো। ভজুয়া কিন্তু নেমে গেল আগেই—বাজার করে বাড়ি ফিরবে।

মানসী শেষপর্যন্ত একলাই এসে ঢুকলো ছোটমামার বাড়িতে।

মানসীকে দেখে একগাল হেসে মামীমা বললেন—বাবা, এতদিনে মেয়ের সময় হল আসার। মায়ের অসুখ দেখে গেলে—

মানসী সে-কথায় কান দিলে না। বললে—মা এখন কেমন আছেন?

—ঘরে গিয়েই দেখনা। মামীমা মুখ টিপে হাসলেন একটু।

মায়ের ঘরে ঢুকে সত্যি অবাক হয়ে গেল মানসী। খাটের উপর দিব্যি সম্রাজ্ঞীর মত বসে আছেন মা। আর খাটের খানিক দূরে গদি-মোড়া ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে স্বয়ং ওর পিতৃদেব।

মানসীকে দেখেই হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন তিনি। মানসী ওঁর পাশেই চেয়ারে বসে পড়লো। বাবাকে প্রণাম করা উচিত ছিলো কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় তাও ভুলে গেল।

—বাবাকে প্রণাম কর। মায়ের কথাতেই খেয়াল হল মানসীর।

তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে বাবাকে প্রণাম করলো সে। মাকেও প্রণাম করতে গেল। মা অমনি বলে উঠলেন—থাক, থাক, অসুস্থ মানুষকে প্রণাম করতে নেই।

—না, তুমি এখন আর অসুস্থ নও। একদম ভালো হয়ে গেছ। ডাক্তারবাবু তো তাই বলেছেন।

—ডাক্তারদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা বোঝে ছাই। গাদা-গাদা ওষুধ দিয়ে মাথাটা শুধু খারাপ করে দেয়।

মায়ের কথার কোন উত্তর দেন না মানসীর বাবা। অপলক চোখে মানসীর দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করছিলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—তোর মাকে আজ বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। যাবার আগে তোকে একবার দেখে যাবার ইচ্ছে ছিলো। আমার ওখানে তো আর যাবিনা।

মানসী কি উত্তর দেবে ভেবে পেলনা। সত্যিই তো অরবিন্দকে বাদ দিয়ে সে ওখানে যায় কি করে।

ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা নীরবতা। নীরবতা ভেঙ্গে মানসীই কথা বললে—তোমার শরীর এখন কেমন আছে? প্রেসারটা—

—প্রেসার ভালো হয় কখনো? নিয়মিত ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি, তাই

টিকে আছি। একটু দম নিয়ে বললেন—কোনদিন ডাক পড়বে তার ঠিক আছে।

—ওসব কথা একদম ভাববে না। ব্লাডপ্রেসার আজকাল ৭০% লোকের। তিরিশবছরের ছোকরারাও আজকাল ঐ রোগে ভুগছে।... হবেনা? যা টেনশন্ মানুষের জীবনে! দিনরাত লড়াই করে বাঁচা।

—তা যা বলেছিস।—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মানসীর বাবা।

—আসছি।—বলেই মানসী উঠে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। রান্নাঘরে ছোট মামীমার কাছে এসে বসে।

খাবার তৈরী করতে করতে ছোট মামীমা ফিসফিস করে অনেক খবর দেন। মানসীর বাবা নাকি এখন অনেক নরম হয়ে পড়েছেন। হাতে-পায়ে ধরে মানসীর মাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি ছেলের সঙ্গেও নাকি এখন একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা হচ্ছে।

কথাগুলো শুনে মানসী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বাবা সত্যি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মানসীর সম্বন্ধেও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

মানসী আবার মায়ের ঘরে এসে ঢোকে। ছোটমামীমা একটু বাদেই জল খাবার নিয়ে এলেন ওর জন্যে—লুচি, বেগুনভাজা আর হালুয়া।

এতসব খাবারের প্রয়োজন ছিল না। মানসী ব্রেকফাষ্ট সেরেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। তবু খাবারগুলি খেতে হল। না হলে তাঁরা দুঃখ পেতেন।

—দুপুরে খেয়ে-দেয়ে যাবি কিন্তু। মামীমা বলেন।

—না, আমাকে এখুনি ফিরতে হবে। বাড়িতে কিছু বলে আসিনি।

মামীমা মুখ কালো করে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

—এখুনি যাবি।—মানসীর বাবা দুঃখিত হয়ে বলেন: আমি তো ভাবছিলাম, খেয়ে-দেয়ে একেবারে বিকেলের দিকে যাবি।

মানসী চুপ করে রইল। কথা খুঁজে পেলনা। নীরবে খাবার খেয়ে উঠে পড়ল।...বাবাকে নীচু হয়ে আবার প্রণাম করলো। মাথা তুলে বললে—সাবধানে থেকো।

নিজের অজান্তেই মানসীর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়লো।

বাবা ওর মাথায় হাত রাখলেন। ছলছলে দৃষ্টিটা ওর মুখের দিকে রেখে বললেন—বাবার কথা মধ্যে মধ্যে মনে করিস।

মানসীর চোখেও জল এসে গেল। ছ'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। তাড়াতাড়ি আঁচলে মুছে নিয়ে—আমি যাই—বলেই মানসী আস্তে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ছোটমামীমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল। মনটা আজ অনেক হালকা লাগছে মানসীর। মা যে বাড়িতে ফিরে যেতে রাজি হয়েছেন—বাবার জন্য মস্ত বড় দুঃশ্চিন্তা কেটে গেল।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে মানসীকে। স্নান পর্যন্ত সেরে আসেনি সে। অরবিন্দ এতক্ষণে নিশ্চয় বাড়িতে এসে গেছে। এর মধ্যে কত কাপ চা ধ্বংস করেছে, তার ঠিক আছে। তার চেয়ে যদি স্টোভে ডালটা অন্ততঃ চড়িয়ে দিত।

যা ভেবেছিল মানসী। শোবার ঘরে তখন জোর মিটিং চলছে—একঘর লোক। সবার সামনেই চায়ের খালি গেলাস। মিটিং-এর সময় সামনের দোকান থেকেই অরবিন্দ চায়ের ব্যবস্থা করে—বাড়িতে অত লোকের চা কে করবে।...কি অখাদ্য চা-ই না ওরা খেতে পারে! একেই বলে নেশা।

মানসীকে দেখে ওরা একে একে উঠে পড়লো।

—যাক গৃহিণী এসে গেছেন—এক ভদ্রলোক রসিকতার চেষ্টা করলেন—খালি বাড়ি দেখে আমরা এতক্ষণ ঘর আগলে ছিলাম।

সবাই চলে গেলে মানসী অরবিন্দকে লক্ষ্য করে বলে—ঘর আগলাচ্ছিলেন, ঘরের যা অবস্থা করেছেন—এখন এর সংস্কার করতেই আমার একঘণ্টা কেটে যাবে।

একডজন খালি চায়ের গেলাস আর ঘরময় সিগারেটের টুকরো ছড়ানো।

মানসীকে খুশি করার জন্যে অরবিন্দ হাসি হাসি মুখে বলে—আমি ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলছি। তুমি বরং ততক্ষণে রান্নার যোগাড় কর। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

মানসী ওর কথায় কান না দিয়ে ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করে। ওকে গম্ভীর দেখে অরবিন্দ নিজে যেচেই আবার কথা পাড়ে—তা তুমি এতক্ষণ কোথায় কাটিয়ে এলে বললে না তো।

—যেখানে খুশি—তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি ?

—কৈফিয়তের প্রশ্ন নয়। কোন অঘটন ঘটেনি তো ? হঠাৎ না বলে-কয়ে তুমি তো কোথাও যাওনা।

—তোমার কাছে শিক্ষা নিচ্ছি।

কথাটা শুনে অরবিন্দ হো হো করে হেসে ওঠে। —যাই, ভাতটা তাহলে চড়িয়ে দিয়ে আসি।—বলেই রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

মানসীর ততক্ষণে ঘর পরিষ্কার হয়ে গেছে। স্নান সেরে যখন সে রান্নাঘরে এসে ঢুকলো অরবিন্দ তখন আবার এককাপ চা নিয়ে বসে গেছে। সঙ্গে সিগারেট।

স্টোভের উপর ডেকচিতে ভাত। জলের পরিমাণ এত কম যে আর একটু দেরি হলেই ভাতের দফা রফা হত।

মানসী তাড়াতাড়ি আরো খানিকটা জল ঢেলে দিলে ডেকচিতে।

সবজি কুটতে কুটতে বললে—এবেলা এই তরকারী দিয়েই খাওয়াটা সেরে ফেল। ওবেলা ডিমের ডালনা রেঁধে দেব'খন।

খালি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে অরবিন্দ বললে—যথা আজ্ঞা। যাই স্নানটা সেরে নিই। তুমি ততক্ষণে খাবার যোগাড় করে ফেল।

মানসীর দস্তুরমত হাসি পেয়ে যায়। এত যে রাগ দেখাল মানসী, কিছুই ও গায় মাখলো না। রাগ-অভিমান বলে কি ওর কিছু নেই।

মা-বাবার ঝগড়া মিটে যাওয়ায় মনে শান্তি ফিরে পেয়েছে মানসী।

অশান্তি শুধু এখন ওর নিজের শরীরটা নিয়ে। একটার পর একটা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। ইচ্ছে করেই সব কথা সে অরবিন্দকে জানায় না। বেচারা অনর্থক দুশ্চিন্তা করবে। সমাজের একটা ভালো কাজ নিয়ে আছে, তাই থাক।

শরীরটা দুর্বলবোধ করে বলেই মানসী আজকাল কোথাও বেড়াতে যায়না বড় একটা। গৌরীদিদের বাড়িতে যাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছে।

অরবিন্দর সম্বন্ধে গৌরীদি ঐ অভদ্র ইঙ্গিত করার পর থেকে আর ওমুখো হয়নি।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একমাত্র ছোটমামার বাড়িতেই সে গেছে দুদিন—তা-ও ওঁরা ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই। বড় মামার বাড়িতে ইচ্ছে করেই কোনদিন যায়নি সে। গেলে হঠাৎ যদি মলিদির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দেখা হবার সম্ভাবনা অবশ্য অল্পই। তবু হতেও তো পারে। মলিদি এখন নাকি তাব স্বামীর ঘর করছেন। সুবোধ চৌধুরী টাকার জোরেই নাকি হারিয়ে দিয়েছে ভদ্র লোককে। তাছাড়া, Adultery-র charge ব্যাভিচারের অভিযোগ প্রমাণ করা কি সহজ কথা!...মানসী একদিন ঐ সুবোধবাবুর খপ্পরে পড়েছিল, ভাবলেও গা রি রি করে।... ভুলচুক তো মানুষ কত সময়েই করে, সব কথা মনে রাখলে কি জীবনে শান্তি থাকে? আজে-বাজে কথা যতই ভুলে থাকা যায় ততই শান্তি।

কিন্তু ঐ বড়মামার বাড়িতে গিয়েই তো আবার অশান্তি দেখা দিল।

ছুটির দিন। সকালবেলায় সবে চা খেয়ে অরবিন্দ বেরিয়ে গেছে, এমন সময়ে ভজুয়া হন্তদন্ত হয়ে ওদের বাড়িতে এসে হাজির হল একটা দুঃসংবাদ নিয়ে। বড়মামা মারা গেছেন আজ সকালে। ভুগছিলেন অবশ্য অনেকদিন থেকেই। বয়সও হয়েছিল। কিন্তু খবরটা পেয়ে মানসী কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল।

মানসীকে নিরুত্তর দেখে ভজুয়া বলে—মা তোমাকে একবার বড়-মামার বাড়িতে যেতে বলেছেন।...মা যেতে পারবেন না—শরীর খারাপ।

মানসী দোটানায় পড়ে যায়। যাবে কি যাবে না। না গেলে জীবনে আর বড়মামাকে দেখতে পাবে না। কথাটা মনে হতেই কেমন কান্না পেয়ে গেল। এক সময়ে ওঁদের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠতাই না ছিল। সপ্তাহে একদিন না গেলেই মন খারাপ হয়ে যেত।

আঁচলে চোখের জল মুছে ভজুয়াকে লক্ষ্য করে মানসী বলে—চল, তোমার সঙ্গেই আমি যাচ্ছি। মামাকে একবার শেষ দেখা দেখে আসি।

—যাই, ট্যাক্সি ডেকে আনি।—ভজুয়া গিয়ে ট্যাক্সি ডেকে আনে।

মানসী ততক্ষণে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে। অরবিন্দকে খবরটা

এখন না জানানোই ভালো। লাভ-ই বা কি! বড়মামার বাড়িতে মানসী কতটুকু সময়ই বা থাকবে। একবারটি শেষ দেখা দেখে আসা।

পাশের বাড়ির বউটিকে তাই কিছুই বলে গেল না মানসী। দুপুরে অরবিন্দ বাড়িতে খেতে আসার আগেই তো সে ফিরে আসবে।

আর কিছু চিন্তা না করেই মানসী গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো। ওখানে গিয়ে যে মলিদির সঙ্গে দেখা হতে পারে একথাটা পর্যন্ত ওর মাথায় এল না। বড়মামার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে অন্য সব কথাই ভুলে গেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে যে মানুষটিকে দেখে এসেছে মানসী, তিনি, আর নেই। এই কথাটাই শুধু থেকে থেকে মনে পড়ছিল। মানুষের জীবন কি ক্ষণভঙ্গুর। এত বিদ্যাবুদ্ধি, ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠা কোন কিছু-রই যেন অর্থ নেই!

আচমকা বড়মামার বাড়ির সামনে ট্যাকসিটা এসে থেমে গেলে মানসী সম্বিৎ ফিরে পেল। আস্তে গাড়ী থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো মানসী।

লোকের ভিড়ে বাড়িটা তখন গমগম করছে। ধীরে ধীরে বড়মামার ঘরে গিয়ে ঢুকলো মানসী। খাটের উপর বড়মামা মহানিদ্রায়—ফুলেফুলে ভরা খাট ভরে গেছে—মুখখানি শুধু দেখা যাচ্ছে তাঁর।

বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মানসী। মলিদি কখন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ও খেয়াল করেনি। হাতটা জড়িয়ে ধরতেই তাঁর দিকে ফিরে তাকালো মানসী।

মলিদির ছলছল চোখও বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মানসী কেঁদে ফেললো। কারো দুঃখ দেখলে ও কান্না সামলাতে পারে না।

মলিদি উল্টো ওকে সান্ত্বনা দিলে—কাঁদিস না। চল, বারান্দায় গিয়ে বসবি।

মলিদি ওকে হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে এল। দু'খানি চেয়ারে মুখোমুখি হয়ে বসে পড়লো।

চোখের জল ততক্ষণে শুকিয়ে গেলেও মানসী নির্বাক হয়েই ছিলো। কথা বললে প্রথমে মলিদি। বললে—কতকাল বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল।

মানসীর মুখে তবু কথা সরলো না। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

আনমনা হয়ে কি ভাবছিল মনে নেই। খানিক দূরে কয়েকজন ভদ্রলোক বসে জটলা করছিলেন। সেই দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ চমকে উঠলে —ভূত দেখার মত। ওমা, ও কে? সুবোধ চৌধুরী। সে-ও এসেছে ওর বড়মামাকে দেখতে।

উত্তেজনায় মানসীর বুকের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। না, আর এখানে থাকা নয়। কিন্তু যাবার আগে বড়মামীমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া দরকার।

কথাটা মনে হতেই মানসী উঠে পড়লো। কিন্তু মলিদি বাধা দিলো —কোথায় যাচ্ছিস?—হাত ধরে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—তারপর আজকাল কোথায় আছিস?

—মেয়েরা বিয়ের পর যেখানে থাকে।

—সে তো জানি। ঠিকানাটা কি তাই জানতে চাইছি।

ছোটমামীমার ওখানে নাকি গিয়েছিলি, তা তিনি নাকি তোর ঠিকানাই জানেন না।···অজ্ঞাতবাস শুরু করেছিস নাকি?

কথার ধরন দেখে রাগ ধরে যায় মানসীর। এই পরিবেশে এসব কথা ওর মনে আসে কি করে!

খানিক চুপ করে থেকে মানসী বললে—আমার ঠিকানা দিয়ে তুমি কি করবে?···গরীবের আস্তানা—ওখানে গেলে তোমার মান থাকবে না।

মুখ বেঁকিয়ে মলিদি বললে—সে আমি বুঝবো'খন।

মানসী কোন উত্তর না দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে। বলে—আমাকে এখুনি যেতে হবে।

—তা তুই নাকি স্কুলে চাকরি করছিস?

—হ্যাঁ।

—কোন স্কুল?

মানসী কোন চিন্তা না করেই স্কুলের নামটা বলে ফেললো।—বলেই সোজা বড়মামীমার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মামীমা তখনও মামার শিয়রে বসে হাঁপুস নয়নে কাঁদছেন। মামীমার কাছে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে মানসী উঠে পড়লো।—আমি আজ যাই মামীমা। এই একটি

কথাই শুধু বলতে পারলো মানসী। দুঃখে-আবেগে কণ্ঠস্বর তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে ওর।

কলকাতায় চাকরি নিয়ে অনুপ আবার ফিরে আসায় বাণী খুশিই হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তবু যা হোক, মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যাবে। অনুপ ও অরবিন্দর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব তো আজকের নয়!

শান্তিনগরে বউ নিয়ে দিদির সংসারে মোটামুটি শান্তিতেই ছিল অনুপ। কিন্তু ওখানে শান্তিতে থাকা আর হয়তো হয়ে উঠবে না ওদের পক্ষে।

ছুটির দিন স্কুল না থাকলেও অনুপ প্রায়ই একবার কলকাতা ঘুরে যায়। সাধারণত সকালের দিকেই আসে। দুপুরে বাণীদের এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে। তারপর বিকেল নাগাদ আবার শান্তিনগরে ফিরে যায়।

ছুটির দিন হলেও অনুপ আজ সকালে ওদের বাড়ি আসেনি। দুপুর-বেলা বাণী ঘুমিয়েছে। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসেই চা খাচ্ছিল সে, এমন সময়ে উস্কখুস্ক চেহারা নিয়ে অনুপ এসে হাজির হল। বাণীর বাবার ঘরে না বসে সোজা বাণীর ঘরে এসে ঢুকলো।

চেহারা দেখে বাণী তো অবাক। মাথায় না পড়েছে চিরুণীর আঁচড়। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের মত ওর তো মাথায় শ্যাম্পু করে চুল এলোমেলো করে রাখার অভ্যাস নেই। তাহলে?

জামা-কাপড়ের অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়। মুখখানাও বিমর্ষ। সংসারে দারুণ একটা দুর্ঘটনা হলে লোকের যেমন হয়, তাই।

—কি ব্যাপার!—বিস্মিত-চিন্তিত হয়ে বাণী বলে ওঠে।

—পরে বলছি। তুমি চা খাও তো আগে।—গম্ভীর মুখেই অনুপ উত্তর দেয়।

—তোমাকে চা দিতে বলে আসি। বাণী উঠতে যাবে এমন সময় রামলাল নিজে থেকেই আর এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। অনুপের

হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে হেসে বললে—অনুপদাকে আমি আগেই দেখতে পেয়েছিলাম।—বলেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চা খেতে খেতেই মোটামুটি ব্যাপারটা বলে ফেললো অনুপ। দিদির ওখানে আর ওদের থাকা সম্ভব নয়—আলাদা বাড়ি চাই। মিতাকে নিয়েই নাকি যত অশান্তি। রমার সঙ্গে ওর বনিবনা হচ্ছে না।

—রমার ঘরকন্নার কাজে মিতাকে একটু সাহায্য করতে বল।—একটু ভেবে বাণী বলে: তোমার দিদি তো প্রায় এখন অথর্ব হয়ে পড়েছেন—রমার ঘাড়েই সব দায়িত্ব এসে পড়েছে—একলা পেরে উঠছে না।

—না, আসল কথা মিতাকে ও সুনজরে দেখেনি। অনুপ বউয়ের পক্ষ নেয়।

—যাও, বাজে বকোনা।

থতমত খেয়ে অনুপ বলে—রমাদি আগে এমন ছিল না—মেজাজটাই যেন কেমন বিগড়ে গেছে ওর।

—বিগড়ে যাওয়াই তো মেজাজের ধর্ম। দারুণ অর্থবহ শব্দ।—কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে পরিবেশটাকে হালকা করার চেষ্টা করে বাণী। সত্যি কথা বলতে কি অনুপের মুখে ঐ সব সাংসারিক আলোচনা শুনতে ওর একটু ভালো লাগেনা।

আগের কথার জের টেনে অনুপ আবার বলে উঠল—চটপট বাড়ির ব্যবস্থা করে দাও, একটা ঘর হলেও চলে যাবে।

—রমার সঙ্গে একটু বনিবনা করে চলা উচিত ছিল মিতার। বাণী বলে।

—উচিত কাজ কি মানুষ সব সময় করে উঠতে পারে? তাহলে তো সংসারে কোন অশান্তিই হত না।—অনুপ মন্তব্য করে।

কিন্তু এসব ঘরোয়া মনোমালিন্যের ব্যাপারে বাণীকে জড়ানো কেন? বাণীর মেজাজই খারাপ হয়ে যায়।

অনুপ সেটা লক্ষ্য করেনা। খালি চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে বলে—তোমাদের পাড়ায় কোন খালি ঘর থাকলে ঠিক করে দাওনা।

—চেষ্টা করবো।—বাণী সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

অনুপ বলে—না, চেষ্টা-ফেষ্টা নয়, ঠিক না করে উপায় নেই। দুচার দিনের মধ্যে বাড়ি ঠিক না হলে শ্রীমতী এখন অনশন ধর্মঘটের ভয় দেখাচ্ছেন।

—সে কারণেই ভয় পেয়ে ছুটে এসেছো? বাণীর ঠাট্টার হাসি হেসে বলে—চিরন্তন পুরুষ, স্ত্রীর ভয়ে সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে আছ!

অনুপ কাঁচুমাচু মুখে চুপ করে থাকে।

বাণী বলে—তুমি নিজেও তো একটু চেষ্টা করে দেখলে পার। বাড়ি যোগাড় করা আজকাল বড় শক্ত তা-ও অল্প ভাড়ায়।

—তা যা বলেছ।—ভাড়ার কথা তোলায় অনুপ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে যেন। বলে—তা মিতা সত্যিই বড় অবুঝ, আমার আয়ের কথাটা তো ওর চিন্তা করা উচিত।

বাণী এবার হাসি সামলাতে পারে না। হেসে বলে—তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথায় থাকা আমার পক্ষে কি অনধিকার চর্চা নয়? কি বল?

কথাটা শুনে অনুপ কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

অভিমানভরা গলায় বলে—ঠিক আছেঃ তোমাকে আর কোনদিন বিরক্ত করতে আসবোনা—নিজের ব্যাপার নিয়ে।

নির্বাক হয়ে বাণী ওর দিকে তকিয়ে থাকে।

অনুপ যেন নিজের মনে কথা বলে যায়—সংসারে তোমার মত আপন-জন আমার কেউ নেই বলেই কোন অসুবিধা হলেই তোমার কাছে ছুটে আসি—আর আসবো না। বলেই ছলছল দৃষ্টিতে বাণীর মুখের দিকে তাকায়।

বাণীর একটু কষ্ট হল বৈকি ওর দুঃখ দেখে। বললে—এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের ঘরের আমি ব্যবস্থা করে দেব যে করেই হোক। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যাও। একটু থেমে হাসতে হাসতে বলে—তবে ঐ অনশন ধর্মঘটের কথা শুনে ভয় পেওনা, সবাই তো আর মহাত্মা গান্ধী নন।…গান্ধীজি কি বিদ্যাটাই না শিখিয়ে গেছেন দেশবাসীকে—পান থেকে চুন খসলে মেয়েরাও এখন অনশন ধর্মঘটের হুমকি দেখায়!

অনুপের মুখেও হাসি ফোটে। নিষ্পলক চোখে বাণীর দিকে তাকিয়ে

থাকে কিছুক্ষণ। তারপর অন্য কথা খুঁজে না পেয়েই যেন বাণীকে বলে।
—কাকাবাবু আজকাল কেমন আছেন?

তবু যা হোক, এতক্ষণে কাকাবাবুর কথা মনে পড়লো!

বন্ধুপত্নী আবার তাঁর স্বামীর সংসারে ফিরে এসেছেন জেনে বারীনের মনটা অনেক হাল্কা হয়ে আছে। যাক, এবার ভূপেশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। ওরা শান্তিতে আছে জানলে বারীনের মনেও শান্তি থাকে। ভূপেশের সঙ্গে ওর তো একদিনের সম্পর্ক নয়। শৈশবে মারামারি খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সে সম্পর্ক বড় কঠিন। শত আঘাতেও তা নষ্ট হবার নয়।

বাণীকে গোপন করেই বিকেলে তাই ভূপেশের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল বারীন। বাসে-ট্রামে যাতায়াত করতে বড় কষ্ট হয় আজকাল ওর। ডাক্তারেরও নিষেধ।

বারীনকে দেখে ভূপেশ একেবারে লাফিয়ে উঠলো—আরে তুমি। শোবার ঘরে একটা জার্নাল নিয়ে বসে ছিল সে। ঘরে গিন্নী তখন অনুপস্থিত। নীচে ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন হয়তো।

বলার আগেই ভূপেশের মুখোমুখি হয়ে চেয়ারে বসে পড়লো বারীন। বলে—সুসংবাদটা শুনে না এসে থাকতে পারলাম না।…'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ…' রক্ষা করতে এলাম!

—হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল। একলা থাকা এখন আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে—ভূপেশ বলে।

—কথাটা একটু দেরিতে বুঝলে ভায়া—better late than never—অনর্থক এতদিন কষ্ট পেলে।…তা এবার ছেলেমেয়ের সঙ্গেও একটা রফা করে ফেল।

ভূপেশ চুপ করে থাকে।

বারীন বলে—তুমি ঐভাবে তাড়িয়ে না দিলে সমীর কি তোমাদের ছেড়ে চলে যেত? একটু থেমে বলে—তাছাড়া এমনকি গর্হিত কাজ

করেছে সে? বিধবা মেয়ের পানিগ্রহণ করেছে! স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বিধবা বিবাহের পক্ষ নিয়ে লড়াই করে গেছেন, আর তুমি এই বিংশশতাব্দীতে—

ভূপেশ নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

আগের কথার জের টেনে বারীন বলে—বণ্ড লেবার—দাসযুগের দাসেরা মুক্তি পেলেও আমাদের দেশের মেয়েদের মুক্তি নেই—সামাজিক অনুশাসনের হাত থেকে।

বারীনের কথা শেষ হতে না হতেই ললিতা দেবী এসে ঘরে ঢোকেন। মুখে হাসি ধরে না। বারান্দা থেকেই তিনি বারীনের কথাগুলি শুনতে পেয়েছেন। খাটের উপর বসে বলেন—খুব খাঁটি কথা বলেছেন।··· লেখাপড়া শিখলেও সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বারীন নিজের মনে হাসে। এ যে ভূতের মুখে রাম নাম! নিজের মেয়ে স্বাধীনভাবে তার সঙ্গী নির্বাচন করেছে বলেই না উনি খেপে গিয়েছিলেন?···আশ্চর্য পরিবর্তন। সেই মেয়েকে দেখেই উনি নাকি এখন আনন্দে আত্মহারা! বাণীর কাছে সব কথাই শুনেছে বারীন। শুনে অবশ্য খুশিই হয়েছে। কিন্তু অরবিন্দকে ওরা অত অশ্রদ্ধার চোখে দেখে কেন?···কোন চাল-চুলো নেই। তাই? বণিক সভ্যতার যুগে ধনসম্পত্তিই হল সম্মানের মাপকাঠি--না বিদ্যা, না মানবিক গুণ।

বিষন্ন চোখে বারীনের দিকে তাকিয়ে ছিল ললিতা। ওর চেহারা দেখে হয়ত আশ্চর্য হয়ে গেছে। সত্যি আজকাল ওকে দেখলে অনেকেই চমকে ওঠে। যাদের বুদ্ধি কম, তারা তো মুখের উপরই বলে ফেলে—একি, চেহারা করেছেন?

বারীন হেসে জবাব দেয়—বয়স বাড়ছে, সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

—কি খাবেন বলুন?—ললিতা নীরবতা ভেঙ্গে হঠাৎ বলে ওঠে বারীনকে লক্ষ্য করে।

—শুধু চা, সঙ্গে এক-আধখানা বিস্কুট দিলেও দিতে পারেন। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে এখন আমাকে খুব ধরা-বাঁধা চলতে হয়।

ললিতা দুঃখিত মুখে বলে—খেতে কত ভালোবাসতেন আপনি!

—খেতে এখনও ভালোবাসি। তবে ডাক্তারের মানা। ডাঃ মানে

ঐ ডাক্তার মুখার্জি। ওর নিষেধ অগ্রাহ্য করার উপায় আছে! বলতে গেলে ও-ই এখন আমার অভিভাবক।

ললিতা আস্তে উঠে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। খানিকবাদে নিজেই চা নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন চায়ের সঙ্গে ব্রিটেনিয়ার ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট। বিস্কুটের মধ্যে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুটটাই শুধু পছন্দ করে বারীন। কথাটা এখনও ললিতার মনে আছে।

এতদিনবাদে বুঝি ললিতা তার ভুল বুঝতে পেরেছে। ললিতাকে পাশে পেয়ে মনে কিছুটা শান্তি ফিরে পেয়েছে ভূপেশ। দিনের বেলায় নানা কাজের ভিড়ে অনেক কিছুই ভুলে থাকতো সে। মুস্কিল হত রাত্রে। একলা ঘরে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতো। রাত্রে ললিতা পাশে না থাকলে সে ঘুমোতে পারে না। অভ্যাস জিনিসটা মানুষের জীবনে সব চাইতে বড়—বারীন কথাটা মিথ্যে বলে না। তাই রাগ করে ললিতা যখন তার ভাইয়ের বাড়িতে চলে গেল, ভূপেশ তখন যেন চোখে অন্ধকার দেখলো। মান-অভিমান ত্যাগ করে সে তাই শেষ পর্যন্ত ছুটে গেছে ওকে ফিরিয়ে আনার জন্য। অনেক অনুনয় বিনয় করে তবে না বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

মনে শান্তি থাকলে ঘুমটাও ভালো হয়। রাত এগারটার আগেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল। সবে একটু তন্দ্রা এসেছে। টেলিফোনের ক্রিংক্রিং আওয়াজে সেটা ভেঙে গেল।

—এত রাত্রে কে আবার টেলিফোন করছে?—ললিতা বলে।

—রঙ্ নাম্বার নিশ্চয়।

—না, একবার দেখা দরকার। ট্রাঙ্ক-কল-ও হতে পারে।

ললিতার কথার আর কোন প্রতিবাদ করে না ভূপেশ। বিছানা ছেড়ে একলাফে উঠে আলো জ্বালিয়ে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে যায়। রিসিভারটা তুলে বলে—হ্যালো।

আমি ভূপেশ সেন বলছি।

অন্যদিকে থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আমি হাসপাতাল থেকে

বলছি। বলেই হাসপাতালের নাম জানিয়ে বললেন···আপনার ছেলে সমীর সেন-কে আজ বিকেলে আমাদের এখানে ভর্তি করা হয়েছে।

—কি হয়েছে? ভয়ে-উত্তেজনায় ভূপেশের বুক কাঁপে।

—বাস থেকে নামতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে। এক ভদ্রলোক এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাঁকে। জ্ঞান ফিরে আসার পর আত্মীয়-স্বজনের নাম জিজ্ঞেস করতে ছেলেটি আপনার নাম এবং টেলিফোন নম্বর জানালেন।

—বাঁচবে তো?—ভূপেশের বুকের কাঁপুনি আরো বেড়ে যায়।

—না-বাঁচার মতো কিছুই হয়নি। পায়ে চোট লেগে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়েছিল, কাল এক্সরে করার পর সব ব্যবস্থা করা হবে।

—এখন কেমন আছে? খুব যন্ত্রণা হচ্ছে কি?—উদ্বেগের সঙ্গে ভূপেশ জিজ্ঞেস করে।

—এখন ভালোই আছে। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে।···আপনি কাল সকালে এখানে চলে আসুন। এলেই সব ডিটেলস্ জানতে পারবেন। —বলেই ফোনটা ছেড়ে দেয়।

টেলিফোনের সামনে ভূপেশ গুম হয়ে বসে থাকে। ললিতার কথায় সম্বিৎ ফিরে পায়।—কি হয়েছে? কার অসুখের কথা বলছিল? ভয়ে-উদ্বেগে ললিতার মুখ তখন শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সমীরের কথা ওর মনে পড়লো না। পড়লো বারীনের কথা। সেটাই স্বাভাবিক। মাস খানেক আগেই তার মাইল্ড স্ট্রোকের মত হয়ে গেছে। তারপর সেদিন যা চেহারা দেখলো তাতে ওর কথাটাই মনে আসা স্বাভাবিক। সমীর শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে, হঠাৎ এমন একটা অ্যাকসিডেন্ট করে বসবে ও ভাববে কি করে!

—বাণীর বাবার কিছু হয়নি তো?

—না।

ললিতার অবস্থা দেখে ভূপেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। না, ওকে সমীরের খবর জানানোর দরকার নেই। শুনলেই তো কেঁদে-কেটে একশা করবে। তখন ওকে সামলানোই দায় হয়ে পড়বে ভূপেশের পক্ষে। একটু ভেবে নিয়ে ভূপেশ তাই বললে—আমার চেনা একটি ছেলে বাস থেকে পড়ে

গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করেছে।…কাল সকালে হাসপাতালে তাকে একবার দেখতে যেতে হবে। সমীরের নামটা গোপন রেখে ভূপেশ সংক্ষেপে মোটামুটি ঘটনাটা বলে ফেললো। একেবারে নির্জলা মিথ্যে বলার অভ্যাস নেই, পারেও না বলতে।

—তাই বল। ললিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে আমি তো ভাবছিলাম, আমাদের কারো কিছু বিপদ হল কিনা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভূপেশ উঠে পড়ল। আপাততঃ ললিতাকে তো শান্ত করা গেল।—চল, এখন শুয়ে পড়বে চল। ললিতার হাত ধরে ভূপেশ বললে।

দুজনে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। ললিতা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ভূপেশের চোখে আর ঘুম আসে না।…পায়ের হাড় যদি ভেঙ্গে গিয়ে থাকে সমীরের! প্লাস্টারের পর কতদিন শুয়ে থাকতে হবে কে জানে! তারপর হাড়টা যদি জোড়া না লাগে? খুঁড়িয়ে চলতে হয়? অমন রাজপুত্তুরের মত ছেলে তার, সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকবে।

ভূপেশ আর ভাবতে পারেনা। দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হয়ে ওঠে। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঘুম আসে না।

নিজের উপরই তখন রাগ হয় ভূপেশের। কেন রাগের মাথায় সে তাড়িয়ে দিলে ছেলেটাকে। তাড়িয়ে না দিলে আজ তো ওর এই বিপদ ঘটতো না। ভূপেশের ছেলে, বাড়ির গাড়ি করেই যাতায়াত করতে পারতো। ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে ওর কোথাও যাবারই দরকার পড়তনা।

ললিতার রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে। ওর কথা শুনে চললে ভূপেশকে আজ হয়তো এমন দুঃখের মধ্যে পড়তে হত না।

ঘরে অল্প-পাওয়ারের ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। ম্লান আলোয় ললিতার মুখখানি বড় ম্লান মনে হল ভূপেশের। ঘুমন্ত বিষণ্ণ সেই মুখের দিকে চেয়ে বড় দুঃখ হল। হ্যাঁ, সারাজীবন ওকে দুঃখ দিয়েছে ভূপেশ। কিন্তু আর নয়, আর কিছুতেই সে ওকে দুঃখ দেবেনা।

জানলা দিয়ে অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাত্রি

ভোর হল একসময়। অন্যদিনের তুলনায় অনেক আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো ভূপেশ। চা খেয়েই চটপট সকালের প্রাত্যহিক কাজকর্ম-গুলি সেরে নিলো। তারপর আবার শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। ললিতার ঘুম ততক্ষণে ভেঙ্গে গেছে। খাটের উপর বসে হাই তুলে বলে উঠলো—ওমা, তুমি উঠে পড়েছো, আমাকে ডাকনি কেন এতক্ষণ ?

ভূপেশের উপর টানটা আজকাল অনেক বেড়ে গেছে যেন ললিতার। অতীতদিনের মনকষাকষি ঝগড়া-ঝাঁটির কথা তাই একেবারেই অমূলক মনে হয় ভূপেশের। ভূপেশকে ও কোনদিন ভালোবাসতে পারেনি, কথাটা সত্যিই তো ওর মনের কথা নয়, রাগের কথা। যাকে বেশি ভালোবাসে, আপন মনে করে, মেয়েরা তার উপরই যত রাগ দেখায়। যেখানে স্নেহ ভালোবাসা, সেইখানেই দাবি-অভিমান!

ললিতা কলঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা ট্রে করে চা নিয়ে এল। টিপয়ে চা নামিয়ে রেখেই সে বেরিয়ে যায়।

চেয়ারে ভূপেশের মুখোমুখি বসে ললিতা চায়ে দুধ-চিনি মিশিয়ে কাপটা এগিয়ে দেয় ভূপেশের হাতে। নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বলে—আজ সাত-সকালে উঠে পড়েছো দেখছি।

—হ্যাঁ, একটু কাজের তাড়া আছে, চা খেয়েই বেরুতে হবে।

—ব্রেকফাস্ট না করেই ?—ললিতার প্রশ্ন।

—ফিরে এসে করা যাবে।—কথাটা কেমন কাটাকাটা লাগে নিজের কানেও। একটু ভেবে নিয়ে ভূপেশ বলে—তুমি খেয়ে নিও, আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

ললিতা এবার যেন চিন্তিত হয়ে পড়ে।—কেন সেই ছেলেটিকে দেখতে যাবে বুঝি ?

মাথা নেড়ে ললিতার কথার সায় দেয় ভূপেশ। মুখে কিছু বলতে পারেনা।

চায়ের পাট সারা হলেই ভূপেশ উঠে পড়ে।—আমি তাহলে তৈরী হয়ে নেই। বলেই জামা-কাপড় বদলে বেরুনোর উদ্যোগ করে ভূপেশ। আলমারি খুলে খানকয়েক একশো টাকার নোট নিয়ে ব্যাগে

রাখে। ললিতাকে লক্ষ্য ক'রে বলে—সঙ্গে সব সময়ই টাকা থাকা দরকার।

ললিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকে এত কৈফিয়ত দেবার কি প্রয়োজন ?

— তা হলে চলি।—ভূপেশ আস্তে নিচে নেমে গাড়ি করে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

হাসপাতালটা ওদের বাড়ি থেকে বেশ দূরেই। তা প্রায় মাইল পাঁচেকের পথ। সঙ্গে গাড়ি থাকলে অবশ্য কতটুকুই বা সময় লাগে! তবু সময় লাগলো পৌঁছুতে। সকালেও কলকাতার রাস্তায় যানবাহন লোকজনের অন্ত নেই। এ সবের ভিড় এড়িয়ে পথ করা কি সহজ কথা! দিল্লীর মত ফাঁকা রাস্তা পেলে অনেক আগেই ও পৌঁছে যেত হাসপাতালে।

হাসপাতালে ঢুকেই সমীরের খোঁজ করলো ভূপেশ। নার্সই সমীরের বেড দেখিয়ে দিলে। বেডের কাছে গিয়ে অবাক হয়ে গেল ভূপেশ। বেচারা তখনও চোখ বুজে পড়ে আছে। ঘুমচ্ছে, না বেহুঁশ হয়ে আছে কে জানে ? ওর ধারে-কাছে নার্স-ফার্স কেউ বসে নেই। একটি নার্সকে ডেকে ভূপেশ জিজ্ঞেস করে—ছেলেটি এখন কেমন আছে ?

—ভালই।—কৌতুকের হাসি নার্সের মুখে ; ঘুমচ্ছেন, রাত্রে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

কথাটা শুনেই ভূপেশের ভীষণ রাগ ধরে গেল! ঘুমচ্ছে বলেই ওরা সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে একলা ফেলে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবে ? রোগীকে অ্যাটেণ্ড করার জন্য কেউ কাছে থাকবে না ?

ভূপেশ কিছু বলতে যাবে, নার্সটি ততক্ষণে উঁচু হিলের খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে ওর নাগালের বাইরে চলে গেল।

অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভূপেশ সমীরের বেডের পাশে রাখা টুলটাতেই বসে পড়লো। দেখি, কতক্ষণে ওর ঘুম ভাঙ্গে। উত্তেজনায় ভূপেশের বুক তখন দুরদুর করছে। না বসে উপায় ছিলনা।

সমীরের মুখের দিকেই চেয়েছিল ভূপেশ। হঠাৎ বেডের সামনে একটি তরুণী এগিয়ে এলো। না, এতো নার্স নয়। সিঁথিতে সিঁদুর,

কপালেও মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে শাখা, মাথায় শাড়ীর আঁচল। টকটকে ফর্সা রঙ, নিখুঁত দোহারা গড়ন। কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলবধু। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিদ্যুৎচমকের মতই আচমকা কথাটা মনে পড়ে—সমীরের বউ নয় তো? হ্যাঁ, অনেকদিন আগে দেখা সেই মেয়েটি বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য পরিবর্তন। শান্ত-নম্র অপূর্ব মুখশ্রী। দুঃখী বিধবা মেয়ে—ওকে দেখলে কেউ এখন আর বিশ্বাস করবে না।

ভূপেশকে দেখেই কিন্তু চিনতে পারলো মেয়েটি।—বাবা। নত হয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

ভূপেশের ততক্ষণে চোখে জল এসে গেছে। বউটির মাথায় হাত রেখে মনে মনে আশীর্বাদ করলো।

হঠাৎ চোখ মেলে সমীর বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। একটু বাদে বললে—বাবা, তুমি কখন এলে?

বউটি তখন চলে গেছে ওখান থেকে। হয়তো নার্সকে ডাকতে গেছে।

—তুমি এখন কেমন আছ বাবা? ভূপেশকে লক্ষ্য করে সমীর জিজ্ঞেস করে: শুনেছিলাম তোমার খুব অসুখ। মিনমিনে কণ্ঠস্বর।

কথা বলিস না। ভূপেশ বলে সমীরকে। কথা বলতে নিশ্চয় ওর কষ্ট হচ্ছিল।

কিচ্ছু ভাবিস না। তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবি। ভূপেশ ছেলেকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিজে মনে বল পায়না। এক্সরে রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যায়না। পায়ের হাড় যদি ভেঙ্গে গিয়ে থাকে—

নার্সের সঙ্গে সমীরের বউ আবার এসে সামনে দাঁড়ায়। সমীরকে পরীক্ষা করেই নার্সটি আবার যাবার জন্যে পা বাড়ায়। আর ভূপেশও অমনি উঠে পড়ে।

বউটির দিকে তাকিয়ে বলে—তুমি বোস, আমি আসছি। বলেই নার্সের পিছন পিছন চলে যায়। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সব খবর জেনে মনটা অনেক শান্ত হয় ভূপেশের। না, তেমন সাংঘাতিক কিছু হয়নি সমীরের। পায়ে সামান্য চোট লেগেছে। তাহলেও একটা এক্সরে করে নেওয়া ভালো। এক্সরে করে আজই ওকে ছেড়ে দিতে পারে।

ভূপেশ আবার সমীরের বেডের পাশে ফিরে এল। এসে দেখলো—বউটি ওর খাটের পাশে বসে পরম স্নেহের সঙ্গে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ভূপেশকে দেখে সলজ্জ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

—খেয়েছে কিছু? বউটিকে জিজ্ঞেস করে ভূপেশ।

—হ্যাঁ, একটু আগেই নার্স দুধ খাইয়ে গেলেন।

পকেট থেকে একখানা খাম বের করে ভূপেশ বউটির হাতে দিয়ে বললেন—এটা রাখ। আমি এখন যাই। পরে আসবো'খন।···কোন দরকার পড়লেই আমাকে টেলিফোন করবে।—বলেই ভূপেশ আস্তে বেরিয়ে এল ওখান থেকে।

যা ব্যবস্থা করবার সবই তো করে গেল সে। খামের ভিতর পাঁচখানা একশো টাকার নোট সে বউয়ের হাতে দিয়ে এসেছে। এখানে বসে থাকার ওর আর প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে ওর বউই তো কাছে রইলো। কিন্তু বাচ্চা দুটোকে রেখে এল কার কাছে?···

অন্য মনস্কভাবে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ভূপেশ আবার গাড়ীতে এসে বসলো। বেলা দশটা বেজে গেছে, বাড়ি থেকে শুধু চা খেয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ললিতা এতক্ষণে কি করছে কে জানে। ভূপেশের জন্যে হয়তো ঘর-বার করছে। কোনরকম উত্তেজনা-দুশ্চিন্তা ললিতার মাথায় এখন আর সহ্য হয় না—অস্থির হয়ে পড়ে। না, ললিতাকে সুস্থ রাখা এখন একান্ত দরকার।

হ্যাঁ, ললিতা সুস্থই ছিল। ছেলের অ্যাকসিডেন্টের কথা জানলে কি করতো বলা যায় না।

বাড়ি ফিরে ভূপেশ স্নান সেরে খেয়ে-দেয়ে যথারীতি কোর্টে চলে গেল। কিছুদিন থেকেই সে আবার নিয়মিত কাজকর্ম শুরু করেছে। ঘরে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে আরো শরীর খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কোর্টে গিয়েও আজ ঘুরেফিরে সমীরের কথা মনে হতে থাকে। ছেলেটা এখন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলে বাঁচা যায়।

কোর্ট থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল ভূপেশ। বাড়িতে এসেই ললিতাকে জিজ্ঞেস করে—আমাকে কেউ ফোন করেছিল কি?

—না, তো ?—ললিতা জবাব দেয়।

যাক বাঁচা গেল। টেলিফোন করলে ললিতা সব জেনে যেত। এটা ওর একেবারেই খেয়াল হয়নি।

চা-জলখাবার খেয়ে ভূপেশ বেরুনোর জন্যে তৈরী হয়।

—ওকি, তুমি এখুনি আবার বেরুচ্ছো ?

—হ্যাঁ, একটু বিশেষ কাজ আছে। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।—বলেই ভূপেশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় গাড়ী করে। কি জানি ছেলেটা এবেলা কেমন আছে। এক্সরে-রিপোর্টটা এতক্ষণে পেয়েছে কিনা কে জানে! যা ব্যবস্থা আজকাল হাসপাতালগুলোর।

হাসপাতালে গিয়ে খবরটা শুনে মনটা হালকা হয়ে গেল ভূপেশের। —মনের উপর থেকে মস্ত বড় একটা বোঝা নেমে গেল যেন। না, পায়ের হাড় ভাঙ্গেনি সমীরের। পায়ের নার্ভে সামান্য চোট লেগেছে। কয়েকদিন বিশ্রামে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। সমীরকে তাই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বউটিই এসে নাকি বাড়ি নিয়ে গেছে।

ভূপেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এখন নিশ্চিন্ত মনে সে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। বাড়ি গিয়ে এখন সে জানাতে পারে খবরটা।

খাটের উপর ভূপেশের পথ চেয়েই বসেছিল ললিতা। ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলো—যাক, তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছো, যেমন তাড়াহুড়ো করে চলে গেলে, আমি তো ভাবছিলাম—

ভূপেশ ইজিচেয়ারে বসে পড়ে। ললিতার কাছে কিভাবে কথাটা পাড়বে ভাবছিল। এমন সময়ে ললিতা হঠাৎ বলে উঠলো—আজ তোমার কি হয়েছে বল তো ? সকাল থেকেই কেমন যেন মনমরা-অন্যমনস্ক হয়ে আছ।

—না, মন ঠিকই আছে।—ভূপেশ চেষ্টা করে হাসল একটু। শরীরটা তেমন ভালো বোধ করছি না। ললিতা চিন্তায় পড়ে যায় যেন। বলে —অনেকদিন ডাক্তার দেখাওনি—প্রেসারটা কাল একবার দেখিয়ে নাও। বেড়ে থাকলে Diet-টা একটু Control করতে হবে।

—কোন কিছু বেশি Control করতে যাওয়া ঠিক নয়—ভূপেশ দুঃখের হাসি হাসে।—তাতে শেষ পর্যন্ত সবই Control-এর বাইরে চলে যায়।

ললিতা কোন উত্তর দেয় না। কথাটা হয়তো ধরতে পারেনি সে।

ভূপেশ বলে—বেশি শাসন করতে গেলে ছেলেমেয়ে এমনকি স্ত্রী পর্যন্ত নাগালের বাইরে চলে যায়।

ললিতা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়েছে নিশ্চয়।

খানিক চুপ করে থেকে বলে— আমি কখন আবার তোমার নাগালের বাইরে চলে গেলাম ?···ভাইয়ের বাড়ি কেউ বেড়াতে যায় না ?

ভূপেশ সোজাসুজি আর ওর কথার উত্তর দেয়না। বলে—না, আর কাউকে কোনদিন Control—শাসন করতে যাবো না। তার ফল নিজের জীবনেই তো দেখতে পেলাম।

ললিতা চুপ করে ওর কথা শোনে।

ভূপেশ আত্মগতভাবেই বলে যায়—সমীর ওদেরকে গিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবো।

ললিতা আশ্চর্য হয়ে খানিক তাকিয়ে থেকে বলে—ছেলের বউকে আনবে না ?

ভূপেশ এবার হেসে ফেলে—বলে বউকে না নিয়ে এলে ছেলেকে কি আনা যায় ? যায় না। আর আমার নাতিরাই বা তাদের মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কেন ?

খুশি হয়ে ললিতা ভূপেশের কাছে এগিয়ে বসে। চেয়ারে মুখোমুখি হয়ে বসে বলে—তবু যাক, এতদিনে বুঝি ভগবান তোমার সুবুদ্ধি দিলেন।

বেয়ারা ছ' কাপ ওভালটিন রেখে গেল ওদের সামনে। আজকাল সন্ধ্যেবেলায় ওরা হরলিকসের বদলে ওভালটিন খায়।

কাপে চুমুক দিয়ে ভূপেশ আগের কথার জের টেনে বলে—হ্যাঁ, সমীর ওদের সবাইকে কালই গিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসবো—ইচ্ছে করলে তুমিও যেতে পারো আমার সঙ্গে।

ললিতা নির্বাক হয়ে ওর কথা শোনে।

ভূপেশ আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাটা বলে ফেললো ললিতার কাছে। একটি কথা শুধু গোপন রাখে—ঐ অজ্ঞান হয়ে যাবার কথাটা। সমীর

জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালে পড়েছিলো, শুনলে ও এখুনি অস্থির হয়ে উঠবে। বলবে—চল, এখুনি গিয়ে ওকে একবার দেখে আসি।

খবরটা শুনে ললিতা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—সবই অদৃষ্ট, তা নইলে সমীরের মত জোয়ান ছেলে বাস থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যাবে কেন?

—অদৃষ্ট বইকি! অদৃষ্টের হাতের পুতুল আমরা। মানুষের আর কতটুকুই বা ক্ষমতা। বারীন যতই ঠাট্টা করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষকে অদৃষ্টবাদী না হয়ে উপায় নেই।

বিকেলবেলা। খানিক আগে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু মেঘ কাটেনি। পাতলা মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক চমকে দিচ্ছে মানুষকে। রাস্তায় তাই এখন আর মানুষের তেমন সমারোহ নেই।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বারীন বই পড়ছিল। খানিক আগেই চায়ের পাট সারা হয়েছে। খালি কাপ-প্লেট এখনও পড়ে আছে টিপয়ে। বাণী তখনও অফিস থেকে ফেরেনি।

চা খেয়েই রোজ বিকেলে বারীন বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। উদ্দেশ্য খানিকটা হেঁটে আসা জোর কদমে। হার্টের পক্ষে নাকি এটা বিশেষ প্রয়োজন। ডাক্তারদের প্রতিদিনই মত বদলাচ্ছে। আগের দিন হলে ওকে শুয়ে থাকার নির্দেশ দিতো। অসুখ হলেও খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে ওরা এখন অনেক উদার হয়ে উঠেছে। কালেরই ধর্ম হয়তো এটা। আগের দিন হলে রোগীকে না খাইয়ে শুকিয়ে মারতো ওরা। সে যাই হোক, এই মেঘ-বাদলার মধ্যে তো আজ বারীন বাড়ি থেকে বেরুতে পারবে না। আগে অবশ্য পারতো, তখনকার কথা আলাদা।

হঠাৎ বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামলো যেন। কে আবার এল এমন সময়ে?

দোরগোড়ায় ভূপেশকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল বারীন।

বারীনের ঘরে ঢুকে ভূপেশ চেয়ারে মুখোমুখি হয়ে বসে পড়লো।

তুমি হঠাৎ এই মেঘ-বাদলার মধ্যে বের হয়েছ? কি ব্যাপার?

ভূপেশ অসহায়ের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে বারীনের দিকে। চট করে কোন উত্তর দিতে পারে না। খানিক পরে কান্নাধরা গলায় বলে ওঠে।—আমি হেরে গেছি বারীন—

বারীন নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ভূপেশ বলে—তোমার কথাই ঠিক—ছেলে-মেয়েকে আর পুরনো নিয়মে শাসন করা চলে না।—কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর বলে—আমি হেরে গেলাম শেষপর্যন্ত।

বারীন ঠিক বুঝে ওঠে না। বলে—সংসারে হার-জিত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপার। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হার-জিত এক হয়ে যায়। স্নেহ-ভালোবাসার কাছে হেরে গেলে মানুষের হার হয়না ভূপেশ, জিতই হয়।

ভূপেশের চোখ ততক্ষণে সজল হয়ে উঠেছে। পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যই বারীন রামলালকে ডেকে চায়ের ফরমাশ করে।

পাঁচমিমিটের মধ্যেই রামলাল চা দিয়ে যায়। চা খেতে খেতে ভূপেশ আবার পুরনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।—যুথী ওদের সবাইকে বাড়িতে আবার ফিরিয়ে এনেছি। নিজেই গিয়ে নিয়ে এসেছি—তা নইলে ওরা আসতো না।—অসহায় কণ্ঠস্বর ভূপেশের।

—হ্যাঁ, তোমারই তো ছেলে, দম্ভটা ঠিকই আছে।—বারীন হেসে বলে।

খবরটা শুনে বারীন খুশিই হয়। একটু চুপ করে থেকে বলে—এতক্ষণ বলনি কেন? এতো দারুণ সেন্‌সেশন্যাল নিউজ—কালই গিয়ে ছেলে-বউকে আশীর্বাদ করে আসবো।

ভূপেশের মুখে এবার হাসি ফোটে। তবু নিজের দুর্বলতা ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বলে—যা অবস্থা হয়েছিল, না এনে উপায় ছিলনা।

বারীনের কাছে আদ্যপ্রান্ত সমস্ত ঘটনাটা বলে ফেলে সে।

—তারপর তোমার শরীর ভালো আছে তো?—বারীন অন্য কথা তোলে।

—হ্যাঁ, ভালোই তা মনে হয়।—ভূপেশ উত্তর দেয়।

—মনে হওয়ার ওপর নির্ভর না করে মধ্যে-মধ্যে ডাক্তার মুখার্জীকে দেখিয়ে এলেই তো পারো।

—তোমার ঐ ছোকরা বন্ধু ?

—হ্যাঁ, ছোকরা হলেও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঐ বন্ধুর সঙ্গে আড্ডায় গিয়ে বসতে না পারলে শনিবারের বিকেলটা একেবারে আলুনি-আলুনি লাগে।

—না, তুমি একেবারে সংশোধনের বাইরে। কোন নিয়মই মানবে না। তোমার কোন বন্ধু যেন তোমাকে ভ্যান্‌ডেল্‌ আখ্যা দিয়েছিলেন।

—কথাটা ঠিক নয়! নিয়ম ভাঙ্গার পক্ষপাতী হলেও নিয়মকে তো একেবারে অগ্রাহ্য করা চলেনা। নিয়ম মেনে নিয়েই মানুষ নিয়মকে অতিক্রম করার শক্তি পায়।

বক্তৃতা রেখে এখন আসল কথাটা শোন।—ভূপেশ হেসে মন্তব্য করে। একটু থেমে বলে—কাল বিকেলের দিকে তৈরী থেক, আমি নিজে এসে নিয়ে যাব গাড়ি করে।

বলেই ভূপেশ উঠে পড়ে।—আজ চলি।

—সে কি, মিষ্টিমুখ না করেই চলে যাবে ? কত বড় একটা সুখবর নিয়ে এলে।

—কাল আমাদের ওখানে যখন যাবে সবাই একসঙ্গে বসে মিষ্টিমুখ করা যাবে—বাণীকেও সঙ্গে নিয়ে যেও কিন্তু।

ভূপেশ আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে—গাড়িতে গিয়ে উঠল।

দিন সাতেক আগেই অনুপ ওরা কলকাতায় চলে এসেছে। শান্তিনগর থেকে রোজ কলকাতায় এসে চাকরি করা কি সহজ কথা। অল্পভাড়ায় বাড়ি পাচ্ছিল না বলেই না ওখানে ওরা পড়েছিল। তা নইলে অনেক আগেই চলে আসতো। তাছাড়া দিদির সংসারে কতদিন আর পড়ে থাকবে ?

অনুপদের বাড়িটা বাণীদের কাছাকাছি—বাণীই ঠিক করে দিয়েছে, ওর চেনা লোক বলেই অত অল্প ভাড়ায় বাড়িটা পাওয়া গেছে।

অনুপ কলকাতায় আসায় আনন্দই হয়েছে মানসীর। ছুটি-ছাটায় ওদের ওখানে গিয়ে এক-আধদিন কাটিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সপ্তাহে তো মাত্র একটি দিনের ছুটি। এই দিনটিতে অরবিন্দকে ছেড়ে কোথাও যেতে মন চায়না।

অরবিন্দ কিন্তু ব্রেক-ফাষ্ট করেই চলে গেল। ছুটির দিন ইচ্ছে করলে আজ সারাদিন ওর কাছেই থাকতে পারতো সে। তা থাকবে না। এক কমরেডের বাড়িতে নাকি নেমন্তন্ন আছে। দুপুরে বাড়িতে খেতে আসবে না। ছুটির দিনেও আজ একাএকা বসে খেতে হবে মানসীকে। একাএকা কোথাও যেতেও ভালো লাগেনা তার।

স্নান সেরে মানসী ধীরে-সুস্থে রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে। এক তরকারী ভাত হলেই চলে যাবে আজ। অরবিন্দ থাকলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। ডাল এবং কিছু ভাজাভুজি করতে হত। খেতে ও বড় ভালোবাসে। ও-ই যখন দুপুরে খেতে আসবে না, অত ঝামেলায় কাজ কি!

দুপুরে খাওয়ার পাট চুকিয়ে মানসী শোবার ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল এক সময়। ঘুম থেকে উঠে মানসী হাত-মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিলে। অরবিন্দ এখুনি হয়তো এসে পড়বে। এলে পরে দুজনে একসঙ্গে বসে চা খাবে। একা একা চা খেতে আজকাল আর ভালো লাগে না।

সারা বিকেলটা মানসী অরবিন্দর পথ চেয়ে কাটালো। কিন্তু তার দেখা নেই। এত দেরি করছে কেন, সেই কোন সাত-সকালে বেরিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পূর্বক্ষণ। তবু অরবিন্দর দেখা নেই। অধৈর্য হয়ে মানসী শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ল, না ওর জন্যে আর বসে থেকে লাভ নেই। রান্না-ঘরের কাজটুকু ততক্ষণে সেরে ফেলা ভালো।।

মানসী ধীরে-সুস্থে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। বটি নিয়ে কুটনো কুটতে বসেছিল। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ানোর শব্দ শোনা গেল এতক্ষণে বাবুর আসার সময় হল।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলে মানসী। বাড়িতে ঢুকেই অরবিন্দ হনহন করে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল—মানসীর মুখের দিকে একবার চেয়েও দেখলো না। আর মানসী কিনা এতক্ষণ ওর জন্যেই —। মানসী রাগ করে সোজা রান্নাঘরে এসে বসলো—কুটনো নিয়ে।

জামা-কাপড় বদলে হাত-মুখ ধুয়ে অরবিন্দ খানিকবাদেই এসে রান্না-ঘরে ঢুকলো।—কি করছো?

—কি করছি, দেখতে পাচ্ছো না?—রাগের ভাবেই মানসী উত্তর দেয়।

অরবিন্দ যেন একটু ঘাবড়ে যায় ওর মেজাজ দেখে। চেয়ারে বসে বলে—চা খেয়েছ?

—না।

—তাহলে?

—দিচ্ছি।

—আমি করছি।—বলেই অরবিন্দ স্টোভ জ্বালাতে যায়।

মানসী ধমকে সরিয়ে দেয় ওকে।—যাও তোমাকে আর চা করতে হবে না। কি চা-ই না কর! চা, না পাঁচন বোঝাই যায় না। কেতলীতে গরমজলে ফোটানো দোকানের চা খাওয়া অভ্যাস তো।

অরবিন্দ বাধ্য হয়েই আবার গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে।

মানসীকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কেটে বলে—কিন্তু তোমাদের উপরতলার মানুষ যা চা খায় তাকে চা না বলে গরমজল বললেই হয়। টি-পটে চা ভিজিয়ে একমিনিটের মধ্যেই কাপে ঢেলে ফেলা, তাতে না থাকে চায়ের গন্ধ, না থাকে স্বাদ।

—ভালো চা হলে ওতেই গন্ধ-স্বাদ পাওয়া যায়। চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে মানসী উত্তর দেয়; চা বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে নিকোটিন এ্যাসিড বের হয়, তা-ও জানো না?

অরবিন্দ মুচকি হাসে। বলে—নাও, এখন ডাক্তারী রেখে চটপট চা-টা করে ফেল দেখি।

মানসীর মন এবার নরম হয়ে পড়ে। আহা সারাদিন পরে মানুষটা ঘরে এসেছে, আর সে রাগের মাথায় ওর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে।

—আর কিছু খাবে ?

—না, এখন তো নয়ই, রাত্রেও খাবো কিনা সন্দেহ।

—কেন, কি এমন খেয়ে এসেছ ?

—ও বাবা, বাণী আজ বিকেলে যা খাওয়াটাই না খাওয়ালে! অনুপ-মিতা ওদেরকে চায়ে নেমন্তন্ন করেছিল। আমি হঠাৎ গিয়ে পড়ে তাতে ভাগ বসালাম।

মানসী চুপ করে থাকে। কথা বলতে আর ইচ্ছে করেনা। বিকেলটা তাহলে বাণীদের ওখানেই কাটিয়ে এসেছে অরবিন্দ। মানসী সারাদিন বাড়িতে একলাটি পড়ে আছে। একথাটা ওর একবার মনেও হয়নি। চোখের আড়াল হলেই কি ও মানসীর কথা ভুলে যায় ?

চায়ের কাপ অরবিন্দর সামনে এগিয়ে দিয়ে স্টোভে আলুর দম চড়িয়ে দেয় মানসী।

—তুমি চা খাবে না ?—চায়ে চুমুক দিয়ে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করে।

মানসী ইচ্ছে করেই কথার উত্তর দেয়না।

অরবিন্দ বলে—চা না হয় না খেলে—কাছে এসে বসতে দোষ কি ?

ইচ্ছে না থাকলেও মানসী শেষ পর্যন্ত নিজের জন্য টিপট থেকে আর এককাপ চা ঢেলে নিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে। কিন্তু কথা বলেনা।

—খুব রাগ করেছ দেখছি।—অরবিন্দ চায়ে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে মুখ টিপে হাসে।

—তাতে তোমার ভারী তো বয়ে যায়।—অভিমানের সঙ্গে মানসী উত্তর দেয়।

অরবিন্দ সশব্দে হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বলে—বিশেষ একটা দরকারে আজ বিকেলে বাণীদের ওখানে যেতে হয়েছিল। মানসী তবু চুপ করে থাকে।

অরবিন্দ বলে—আমাদের নতুন পত্রিকার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলাম বাণীকে। আজ নিয়ে এলাম সেটা। খুব ভালো লিখেছে—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া কৌশল।

মানসী উত্তর খুঁজে পায় না।

অরবিন্দ নিজের মনের আবেগে বলে যায়—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

দেশগুলিতে নিজেদের অধিকার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা এক নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। নিজেরা গিয়ে ঐ দেশগুলিতে আর শাসন-ক্ষমতা হাতে নিচ্ছে না। নিজের হাতের পুতুল-সরকার দিয়েই নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখতে চাইছে।

একবার কথা বলতে শুরু করলে অরবিন্দর আর কোনদিকে খেয়াল থাকে না। ওদিকে যে কাপের চাটা জল হয়ে গেল সেটা পর্যন্ত ভুলে গেছে।

—আগে চা-টা খেয়ে নাও তো।—মানসী বলে।

একচুমুকে চায়ের কাপ খালি করে অরবিন্দ উঠে পড়ে। মানসীকে লক্ষ্য করে বলে—তুমি চট করে রান্না সেরে চলে এসো। বাণীর লেখাটা তোমাকে দেখাবো। দারুন লিখেছে, মাথাটা সত্যি ভারী পরিষ্কার বাণীর।···জার্নালিজম্ করলে ও সত্যি নাম করতে পারতো। বলেই অরবিন্দ আস্তে বেরিয়ে যায় রান্নাঘর থেকে।

আলুর দম নামিয়ে মানসী স্টোভে ভাত চড়িয়ে দেয়। ভাত হতে সময় লাগবে। সে এখন কিছুক্ষণের জন্য অনায়াসেই অরবিন্দর কাছে গিয়ে বসতে পারে। কিন্তু ইচ্ছে করেই গেল না। গেলেই তো অরবিন্দ অমনি বাণীর ঐ লেখাটা এগিয়ে দেবে। বাধ্য হয়েই তখন মানসীকে পড়তে হবে লেখাটা। মানসীর সঙ্গে কি একটু হাসি-গল্পও করতে ইচ্ছে হয়না ওর? ছুটির দিনেও আজ একলাটি সর্বক্ষণ ঘরে পড়েছিল মানসী। এখন কি ঐ সব রাজনীতির কথা ভালো লাগে!

দেখতে দেখতে সপ্তাহ ঘুরে এল। হ্যাঁ, এই রবিবারে শান্তিনগরে গিয়ে গৌরীদিকে দেখে আসবে মানসী। আচমকা মাথাঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন খবরটা শুনে অবধি মনটা খারাপ হয়ে আছে মানসীর। সেদিন অত করে খেয়ে আসতে বলেছিলেন, তা মানসী রাগের মাথায় চলে এসেছিল।

শনিবার রাত্রেই শোবার আগে তাই অরবিন্দর কাছে কথাটা তুলেছিল সে।—কাল সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই চলনা একবার শান্তিনগর থেকে বেড়িয়ে আসি।

—এত জায়গা থাকতে হঠাৎ শান্তিনগরে বেড়াতে যাবার শখ? —মানসীর কথার প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেনা অরবিন্দ।

—গৌরীদির অসুখ শুনলাম, একবার দেখে আসা উচিত।

—এখন তো ভালোই আছেন।

—ভালো থাকলেও মধ্যে-মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের দেখতে ইচ্ছে হয়না? —মানসী উত্তর দেয়।

—নিশ্চয়! ··কিন্তু কলকাতাতেই কি তোমার আত্মীয়স্বজনের অভাব আছে? ইচ্ছে হলে তাদের সঙ্গেও তো গিয়ে দেখা করে আসতে পারো।

কথাটা মিথ্যে নয়। কলকাতায় আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই মানসীর। মা-বাবা, দাদা-বৌদি, মামা-মামীমা, ভাইপো-ভাইঝি কত আত্মীয় আছে। কিন্তু তাদের সমাজে অরবিন্দ একেবারে অপাংক্তেয়। অরবিন্দকে যারা শ্রদ্ধার চোখে দেখেনা, তাদের ওখানে মানসী যেচে যায় কি ভাবে?··· বাপ-মাকে কে না ভালোবাসে? কিন্তু ভালোবাসার চেয়েও নিজেদের সম্মান আরো বড়। অরবিন্দর নাম তাঁরা ভুলেও উচ্চারণ করেন না। ছোট-মামীমার ওখানে মা-বাবার সঙ্গে দেখা হল সেদিন। বাবা কিছু না বললেও মা তো বলতে পারতেন, বলতে পারতেন, অরবিন্দকে নিয়ে একদিন আসিস কিন্তু। কিন্তু না, দুজনের কেউ মুখ দিয়ে ওঁর নাম উচ্চারণ করলেন না। মানসী যেন সেই ওদের কুমারী মেয়েটিই আছে। না, অরবিন্দর যেখানে কোন সম্মান নেই, সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় মানসীর পক্ষে।

—মুখ কালো করে এত কি ভাবছো? শোবে না?

—অরবিন্দর কথায় চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় মানসীর। বলে—তুমি তাহলে কাল শান্তিনগরে যাবে না?

—দুদিন আগেই তো ঘুরে এলাম ওখান থেকে। কাল আমার একটু কাজ আছে। তুমি বরং অনুপকে নিয়ে—

মানসী থামিয়ে দেয় ওকে।—থাক আর শুনতে চাই না। যেতে পারবে না, এই তো কথা।

অরবিন্দ ওকে হাত ধরে বিছানায় নিয়েযায়। বেডসুইচটা টিপে নিজেই নিভিয়ে দেয় আলোটা। তারপর আর কথা বলতে দেয়না মানসীকে।···

পরেরদিন সকালে অরবিন্দই কিন্তু উঠে পড়ে মানসীর আগে। মানসী তখনও বিছানায় পড়ে আছে। অরবিন্দই ডেকে তুললো ওকে—চা খাবে না?

আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসে মানসী। দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে অরবিন্দ এসে বসে পড়ে খাটের উপর। ঘুম ভেঙ্গেই হাতের কাছে বেডটি না পেলে মানসীর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অরবিন্দ এটা বুঝে নিয়েছে এর মধ্যেই।

চায়ের কাপ হাতে দিয়ে মানসীকে জিজ্ঞেস করে—খুশি হওনি বলতে চাও?

খুশি হয়েছে বৈকি। ঘুম থেকে উঠেই হাতেব কাছে গরম চায়ের পেয়ালা দেখলে কে না খুশি হয়! বিশেষত যাদের ছেলেবেলা থেকে বেডটি খাওয়া অভ্যাস।

চায়ের কাপ খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। টুকিটাকি কাজকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি শান্তিনগরে যেতে হবে। দুপুরে রান্নার জন্য তাড়া নেই। এসেই করা যাবে। কতক্ষণই বা থাকবে ওখানে! ওর ভাবনা অনুসরণ করেই যেন অরবিন্দ বলে উঠলো—তুমি আজ শান্তিনগরে যাবে বলে ছিলে না? আমি তাহলে আজ আর বাড়িতে খেতে আসছি না—কোন কমরেডের ওখানেই ও পাটটা সেরে নেব।...কিন্তু বিকেল চারটের মধ্যে তুমি ফিরবে তো?

—কেন?—মানসী বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকায়।

—চারটের সময় বাড়িতে একটা ঘরোয়া বৈঠক ডেকেছি। ঐ সময়ে বাড়িতে তুমি না থাকলে ওরা ভাববে সহধর্মিনী আমার সহকর্মী হতে নারাজ।—অরবিন্দ হাসির ছলে বলে।

—রোজই যে তোমাদের বৈঠকে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে, এমন কি কথা আছে? তোমাদের পার্টির কাজে আমি কোনদিন বিরোধিতা করেছি?

—বিরোধিতা না করলেও তেমন সক্রিয় সহযোগিতাই বা করলে কোথায়!

সহযোগিতা করিনি?—মানসীর রাগ ধরে যায় কথাটা শুনে।

অরবিন্দ সোজাসুজি মানসীর কথার আর উত্তর দেয়না। বলে—রমা তার ঐ অল্প বিদ্যা নিয়েও আমাদের পার্টির কাজে কত সাহায্য করতো।—একটু থেমে বলে—রাত জেগে পোস্টার লেখা, ঘরে-ঘরে গিয়ে চাঁদা তোলা, কনফারেন্সের সময় কমরেডদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—সব তাতেই সে এগিয়ে আসতো সাহায্য করতে।

মানসী ওর কথার আর উত্তর দেয়না। চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ে। ওর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। ওকে এখন তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

ব্রেকফাষ্ট শেষ হলেই মানসী চটপট তৈরী হয়ে নেয় যাবার জন্যে।

যাবার মুখে অরবিন্দ বলে—চারটের আগেই ফিরতে চেষ্টা করো কিন্তু।

মানসী কোন উত্তর না দিয়ে হাত-ব্যাগটা নিয়ে আস্তে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

অরবিন্দ সদর দরজা অবধি এগিয়ে এসেছিল ওর সঙ্গে। রাস্তায় নেমে মানসী ইচ্ছে করেই পেছন ফিরে তাকালো না ওর দিকে। অরবিন্দর কথা শুনে মনে মনে সত্যিই চটে গেছে সে।

শ্যামবাজারে নেমে ব্যারাকপুরের বাসে উঠে বসলো। ভিড় থাকলেও তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে।

হ্যাঁ, গৌরীদিকে দেখে কিন্তু মোটেই অসুস্থ মনে হল না। দিব্যি খাটের উপর বসে জামাইবাবুর জামায় বোতাম লাগাচ্ছেন।

মানসীকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আনন্দে। একগাল হেসে বললেন—তুই আসবি, আমি ভাবতেই পারিনি।···আয় আমার কাছে এসে বোস।

মানসী ওর কাছেই খাটের উপর বসে পড়লো। গৌরীদি চেঁচিয়ে রমাদিকে ডাক দিলেন। ও রমা দেখে যা কে এসেছে।

ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেও ওকে দেখে রমা তেমন খুশি হল বলে মনে হলনা। ভুরু টান করে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

গৌরীদি বললেন—যা, ওর জন্য গরম গরম দুখানা পরোটা ভেজে

নিয়ে আয়। পরোটার সঙ্গে একটু আলু-মরিচও নিয়ে আসিস। পরোটা আর আলু-মরিচ আমার মত ও-ও পছন্দ করে।

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মানসী পিছু ডাকলো তাঁকে। বললে—আমার জন্য আর পরোটা করার দরকার নেই। সকালের জলখাবার আমি খেয়ে এসেছি।

—দুপুরে খাবে তো ?—রমা গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করে। কোনরকম আন্তরিকতা নেই কথাটায়।

মানসী চুপ করে থাকে।

গৌরীদিই উত্তরটা দেন—হ্যাঁ, খাবে বৈকি। এতবেলায় না খাইয়ে যেতে দিলে তো।

কথাটা শুনে রমা আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সেলাই রেখে গৌরীদি শুয়ে পড়েন। বেশিক্ষণ বসে থাকতে এখনও ওর হয়ত কষ্ট হয়।

মানসী ওর কাছেই বসে ছিল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন ভাবেন গৌরীদি। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করেন—তোর বাচ্চা-টাচ্চা হবে নাকি ?

—কি যে বল !—মানসী কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

—না, চোখের কোলে কেমন কালী দেখছি।

—কত পরিশ্রম করতে হয় জানো ?—মানসী ঐ প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে অন্য কথা তোলে।

গৌরীদির সঙ্গে কিছুক্ষণ নিজের ঘর-সংসারের গল্প করে মানসী। তারপর ওঠে মা-বাবার কথা। মানসীর বাপের বাড়ির সব খবরই ওর জানা হয়ে গেছে। এমনকি সমীরের অ্যাকসিডেণ্ট পর্যন্ত। শুনেছেন অরবিন্দর কাছেই। অরবিন্দ নাকি প্রায়ই আসে এখানে।

কথা বলতে বলতে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ছিল মানসী। রমা ঘরে ঢুকে তাড়া দিলে। মানসীকে লক্ষ্য করে বলে—এবার গল্প থামিয়ে চান-টান সেরে নাও। আমার রান্না হয়ে গেছে।···খেয়ে-দেয়ে না হয় আবার—। গৌরীদির চান হয়ে গেছে।

স্নান সেরে মানসী ফিরে আসে গৌরীদির ঘরে। রমা ততক্ষণে মেজেয় আসন বিছিয়ে ওদের খাবার জায়গা করে ফেলেছে।

থালায় দুজনের ভাত-ডাল, ঝোল নিয়ে সে ফিরে আসে একটুবাদেই। জামাইবাবু সাত সকালে কোথায় নাকি বেরিয়ে গেছেন। ফিরবেন সেই বিকেলে।

গৌরীদি মানসীকে নিয়ে খেতে বসলেন। ওদের দু'জনের খাবার শেষ হলে তবে রমা খেতে যাবে। আমিষ ঘরের ছোঁয়া ও স্পর্শ করে না এখনও। আশ্চর্য গোঁড়া মন।

খাওয়া হয়ে গেলেই গৌরীদি খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়লেন। শরীরটা এখনও সারেনি ওর।

গৌরীদির পাশেই বসেছিল মানসী। মানসীকে লক্ষ্য করে গৌরীদি বললেন—রমার ঘরে গিয়ে তুই-ও একটু জিরিয়ে নে।

তা মন্দ বলেন নি। ওর-ও বিশ্রামের একটু প্রয়োজন। বাসে অনেকটা পথ আসতে হয়েছে। যাবার আগে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে গেলে মন্দ নয়।

—তুমি ঘুমাও তাহলে। আমি রমাদির ঘরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেই।—

বলেই মানসী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সোজা গিয়ে রমার ঘরে ঢোকে। খাটের উপর বিছানা পাতাই ছিল কিন্তু বিছানায় শুয়েও ঘুম আসে না। উঠে গিয়ে রমার কাছে বসতে পারতো। কিন্তু উঠতে কেমন যেন আলসেমি লাগলো। তাছাড়া রান্নাঘরের কাজ নিয়ে রমা তখনও ব্যস্ত।

চোখ বুজে মানসী ঘুমোবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম আসে না। ঘুরে ফিরে গৌরীদির ঐ কথাটাই মনে পড়ে—বাচ্চা-টাচ্চা হবে নাকি ?—তারিখটা অবশ্য অনেকদিন পেরিয়ে গেছে, তা প্রায় মাস দুয়েকের উপর, বিয়ের আগেও অবশ্য ওর কতবার এরকম ব্যতিক্রম হয়েছে, নিজে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে। এবারও হয়তো তাই, বিয়ে হয়েছে বলেই কি—।

মানসী উঠে টেবিলের উপর থেকে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসখানি টেনে নিলে। পড়া বই, তবু পাতা উলটে চললো। কি অপূর্ব

প্রকৃতি-বর্ণনা। অরণ্য প্রকৃতির যেন প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন লেখক। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একখানি ফটো বেরিয়ে পড়লো—ওমা, এ যে দেখি অরবিন্দর ফটো! কোথা থেকে এল এই ছবিটা? বইটা তো অরবিন্দর নয়, তবে?

বিস্মিত হয়ে মানসী তাকিয়ে রইলো ফটোখানির দিকে। হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল কথাটা। ওদের দুজনের গ্রুপ ফটো থেকেই কে যেন কেটে রেখেছে অরবিন্দর ছবিটা। বিয়ের পর মানসীর অনুরোধে পড়েই অরবিন্দ ঐ ফটো তুলতে রাজী হয়েছিল। তা নইলে স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলা অসম্ভব ওর পক্ষে!···কিন্তু কে কাটলো ছবিটা? দু'জনের সুন্দর গ্রুপ ফটোখানা এখানে এলোই বা কি করে!

ভাবতে ভাবতে মানসী রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই সময়ই রমা এসে হাজির হল।—একি তুমি!···ঘুমবে?

—না!—মানসী তড়াক করে উঠে বসলো বিছানার উপর। ফটোখানা বের করে ঝট করে বইটা ছুঁড়ে দিলে টেবিলের উপর।

রমার দিকে ফটোখানা এগিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলে—এ ফটো তোমার ঘরে এল কি করে?

কথাটা শুনে রমার মুখের ভাবও বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। বলে—যার ফটো তিনিই দিয়েছেন।

—কিন্তু সেটা তো গ্রুপ ফটো ছিল না-কি?···কেটে আলাদা করলো কে?

—আমি।

—তুমি!

—হ্যাঁ।

—হেতু?

—ওঁর পাশে তোমাকে একেবারেই বেমানান লাগছিল তাই।··· একেবারে ডলপুতুল মনে হচ্ছিল।

—কাকে মানাতো তাহলে?

রমা এবার চট করে উত্তর দেয়না। বিদ্রূপের হাসি হেসে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে কথাগুলো।—হ্যাঁ,

তোমার বদলে ওঁর পাশে আমারই থাকার কথা ছিল—একটু থেমে বলে—আমি রাজী হলে তাই-ই হতো। তোমার সঙ্গে তখন ওঁর কোন যোগাযোগই ছিলনা।—উত্তেজিত রমা হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে মেজেয়।

মানসীর আর সহ্য হয়না।

অরবিন্দর ছবিটা নিজের ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে মানসী বেরিয়ে আসে ঘর থেকে—সোজা গৌরীদির ঘরে ঢোকে। গৌরীদি তখনও ঘুমোন নি।

মানসী তাঁকে লক্ষ্য করে বলে—আমি এখন যাই।

—এখুনি যাবি?

—হ্যাঁ, বাড়িতে বিশেষ কাজ আছে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। —বলেই গৌরীদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মানসী বেরিয়ে আসে ওদের বাড়ি থেকে।

বেলা তখনও চারটে বাজেনি।

নিজের বাড়িতে এসে অবাক হয়ে গেল মানসী। দরজায় তালা ঝুলছে। এর মধ্যেই মিটিং শেষ হয়ে গেল! নিজের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল দরজার। তালা খুলে বাড়িতে ঢুকে হতবাক মানসী। ঘরে মিটিং-এর কোন চিহ্নই নেই। আর কিছু না থাক সেই সাত পুরনো সতরঞ্চিটা তো পাতা থাকতোই।

মানসীর বিয়ের অনেক আগে সতরঞ্চিটা এই ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মিটিং শেষ হলে মানসী ওটাকে ঝেড়েঝুঁড়ে গুটিয়ে একেবারে তক্তাপোষের তলায় ঠেলে দেয়—যাতে কারো নজরে না পড়ে। যা না চেহারা হয়েছে ওটার।

মিটিং-এর ছুতো করেই অরবিন্দ আজ শান্তিনগরে যায়নি মানসীর সঙ্গে। ছুটিছাটায় সিনেমা দেখার কথা তো ও ভাবতেই পারে না। তার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিতে ওর বেশি ভালো লাগে। কিন্তু তাই বলে গৌরীদির ঐ ননদটির সঙ্গে—। ওই কালো পেত্নীর মত মেয়েটার সঙ্গেই নাকি বিয়ের কথা হয়েছিল। পছন্দের বলিহারী।

মানসীকে তাই হয়তো ও এড়িয়ে চলতো তখন। কলকাতায় এলেও ওদের বাড়িতে আসতো না।

গৌরীদি কথাটা ঠিকই বলেছিলেন তাহলে। পুরুষ-মানুষকে কখনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু অরবিন্দকে সে কোনদিন এমন ভাবতে পারেনি।

রাগে-দুঃখে-অভিমানে মানসীর চোখে জল আসে। কাপড়-জামা বদলেই বিছানায় শুয়ে পড়ে বালিসে মুখ গুঁজে হুহু করে কাঁদতে থাকে। চোখের জলে বালিস ভিজে যায়, তবু কান্না থামে না।

বেলা চারটের সময় নিজের বাড়িতে পার্টির ঘরোয়া বৈঠক করবে ভেবেছিল অরবিন্দ। কিন্তু মানসী চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে মতটা ঘুরে গেল। না মানসীই যখন বাড়িতে থাকবে না, তখন এত দূরে সবাইকে আবার টেনে আনার দরকার কি? বাণী ওদের পাড়ায় কমরেড চ্যাটার্জীর ওখানেই তো ব্যবস্থা করা চলে।

মানসী চলে যাবার পরে তাই অরবিন্দও বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। এবেলা আর বাড়িতে না ফিরলেও চলবে। মানসী চারটের সময় ফিরে আসার চেষ্টা করবে বলে গেলেও ফিরতে পারবে না কিছুতেই। দুপুরবেলায় না খাইয়ে কি ওর দিদি ছেড়ে দেবেন ওকে? আর খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম না নিয়ে কি মানসী ছুটে আসবে এখানে?

নিশ্চয় নয়। বিশ্রাম নিতে গিয়েই তো মানসী ঘুমিয়ে পড়বে। মানসীর ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে রমা চা নিয়ে হাজির হবে ওর সামনে। গরম চা ফেলে মানসী তখন কিছুতেই চলে আসতে পারবে না।—না, চারটে মধ্যে বাড়ি ফেরা অসম্ভব মানসীর পক্ষে। কাজেই অরবিন্দ নিশ্চিন্ত মনে অন্যত্র মিটিং-এর ব্যবস্থা করতে পারে।

মিটিং সেরে না হয় সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসবে। এর মধ্যে মানসী এসে পড়লেই বা ক্ষতি কি! তালার একটা ডুপ্লিকেট চাবি তো ওর কাছেই আছে। বাড়িতে এসেও ওর আর মিটিং-এর ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে না। তাতে মনে মনে খুশিই হবে সে। অরবিন্দকে যত ভালোই বাসুক না কেন, কমরেড-রা যখন-তখন এসে ওর উপর

দৌরাত্ম্য করে এটা ও এখন আর পছন্দ করে না। বড্ড ঘর-কুনো হয়ে পড়েছে মানসী। মানসীর কথা ভাবতে ভাবতে বাস স্টপে এসে বাসে উঠে পড়লো অরবিন্দ।

হ্যাঁ, কমরেড চ্যাটার্জীর বাড়িতেই ওদের মিটিং-এর ব্যবস্থা হল বেলা চারটের সময়। শেষ হতে পাঁচটা বেজে গেল। রোদ পড়ে এলেও তখনও আকাশে আলো আছে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে হবে কি? মানসী হয়তো এখনও ফিরে আসেনি। তাছাড়া এত কাছাকাছি এসেও কাকা-বাবুর সঙ্গে দেখা করবে না, এটাও তো ঠিক নয়। আর কিছু না ভেবেই বাণীদের বাড়িতে এসে ঢুকলো অরবিন্দ।

ঘরে ঢুকেই অবাক। দারুণ কমোশন-একটা—কাকাবাবুর সঙ্গে বাণী চটেমটে তর্ক করছে। ব্যাপারটা একেবারেই অভাবনীয়। রামলাল, যাকে ওরা ঘরের ছেলের মত ভালোবাসতো, মিথ্যে কথা বলে হঠাৎ অন্যত্র কাজ নিয়ে চলে গেছে। বাণী চটে আগুন। যেতে ইচ্ছে হয়েছে, বলে-কয়ে ভালো মুখে যা, তাকে কি ওরা আটকে রাখতো? মিথ্যে কথা বলে যাবার কি দরকার ছিল!

কাকাবাবু কিন্তু নির্বিকার—যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। বাণীর রাগ দেখে তিনি উল্টো হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন—মিথ্যে কথা বলে গেছে, এতে এত চটছো কেন? গরীব মানুষ মিথ্যে না বলে ওদের উপায় আছে?

বাণীর মেজাজ তাতেও নরম হয় না।—নিজের ভাইয়ের মত আমি ওকে ভালোবাসতুম—কোনদিন গাঙ্গুরামের দই-মিষ্টি আনলেও ওকে ভাগ না দিয়ে খেতুম না। জ্বর হলে রাত্রে উঠেও ওর টেম্পারেচার নিয়েছি—সেই ছেলে কিনা—

আবেগে-উত্তেজনায় বাণীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে। হঠাৎ চুপ করে যায় সে।

কাকাবাবু ম্লান হাসেন। ওর দিকে চেয়ে বলেন—মনিব হলেও তুমি ওকেও স্নেহ করতে, এটা তো একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু ও যে তোমার কর্মচারী। একথাটা ভুলে যাচ্ছো কেন?…কর্মচারী কি কখনো তার মনিবকে ভালোবাসতে পারে।

—ঠিক আছে, আমিও এখন থেকে কর্মচারীকে কর্মচারী বলেই মনে করবো—বাড়ির লোক মনে করবো না।

কাকাবাবুর মুখে সেই ম্লান হাসি। বলেন—একটা অন্যায় আর একটা অন্যায়কে Justify—সমর্থন করে না।—বলেই কাকাবাবু উঠে পড়েন। অরবিন্দকে লক্ষ্য করে বলেন—তোমরা গল্প কর, আমি একটু ঘুরে আসি।

কাকাবাবু আস্তে বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।

—চল না, আমরাও একটু ঘুরে আসি অনুপদের ওখান থেকে।—বাণীব দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ বলে: কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে এলেই মনটা হাল্কা হয়ে যাবে।

—চল।—বাণী রাজী হয়ে যায়।

সদর দরজায় তালা লাগিয়ে ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ে। বেশিক্ষণ অবশ্য বসা চলবে না। তবু বাণীর মনটা তো শান্ত হবে। এমন শক্ত মেয়ে। রামলাল চলে গেছে বলে ওব মন খারাপ হয়ে গেছে। অরবিন্দ আশ্চর্য হয়ে যায়। একেই বলে মাতৃজাতি। স্নেহ-ভালোবাসার ক্ষেত্রে বড় অসহায় ওরা; সেখানে ওরা সবাই এক।···অরবিন্দর উপর মানসীর সমস্ত রাগের মূলেও এই ভালোবসা।

দেখতে দেখতে অনুপদের বাড়িতে পৌঁছে গেল ওরা, দুমিনিটের তো রাস্তা।

ওদের দেখে অনুপ-মিতা দুজনেই হৈ হৈ করে উঠলো।—আশ্চর্য, এই একটু আগেই আপনাদের কথা হচ্ছিল।—মিষ্টি হেসে মিতা বলে।

—অনেকদিন বাঁচবে তোমরা।—অনুপ যোগ করে।

বলার আগেই অনুপের খাটের উপর গিয়ে বসে পড়ল অরবিন্দ ও বাণী।

—তোমরা গল্প করো। আমি চা নিয়ে আসছি, বলেই স্মিত হেসে মিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চা তৈরীই ছিল হয়তো। ট্রে করে চা নিয়ে এল।

অনুপ চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলে—মানসীকে নিয়ে এলে না কেন, আজ তো ওর ছুটি ছিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে অরবিন্দ বলে—শান্তিনগরে বেড়াতে গেছে। আমি তো সেই সাত-সকালেই বেরিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে। তাড়াতাড়িই ফিরতে হবে। সঙ্গে যাইনি বলে তোমার বোনটি তো রেগে আগুন হয়ে আছে আমার উপর।

অনুপ নিজের মনে কি যেন চিন্তা করছিল। অরবিন্দর কথাগুলো তার কানে ঢুকলো কিনা কে জানে। বাণীর দিকে চোখ রেখে হঠাৎ বলে উঠলো—মেয়েদের ভালোবাসা পাবার সত্যিই ভাগ্য আছে অরবিন্দর।

—তোমার নেই বলতে চাও? মিতার দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ বলে: জলজ্যান্ত প্রমাণ তো চোখের সামনেই—সর্বক্ষণ মুখে হাসিটি লেগেই আছে—ভালোবাসার চেহারাই আলাদা।

—অন্যের স্ত্রীকেই ছেলেরা বেশি সুন্দর দেখে।—বাণী হাসির ছলে বলে।

—তা যা বলেছো।—অরবিন্দ হেসে উত্তর দেয়। নিজের স্ত্রীর ভয়ে সর্বক্ষণ তো তটস্থ হয়ে থাকতে হয়—অনেকটা খুঁটিতে বাঁধা গরু-ছাগলের মতন।—অরবিন্দর সঙ্গে অনুপও হেসে ওঠে।

হাসি থামিয়ে অরবিন্দ বলে—এই তো চা খেয়েই এখনি বাড়ি ছুটতে হবে। শান্তিনগর থেকে ফিরে যদি দেখে—। রেগে-মেগে হয়তো ডিভোর্স সুট-ই ফাইল করে বসবে।

—ভয় নেই। ইচ্ছে হলেও স্বামীকে ত্যাগ করা বড় শক্ত স্ত্রীর পক্ষে। —বাণী ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর দেয়। ভগবানকে ত্যাগ করা চলে, স্বামী ত্যাগ করলে সমাজ মেয়েদের ত্যাগ করে। আর সমাজ ত্যাগ করলে মেয়েদেয় পক্ষে বাঁচা বড় কঠিন।

বাণীর কথার সত্যি কোন প্রতিবাদ করা চলেনা।

সবাই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

মিতা কখন হঠাৎ উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ওরা লক্ষ্য করেনি।

নীরবতা ভেঙ্গে বাণী বলে—মিতা আবার গেল কোথায়?

—আরো কিছু আসছে নিশ্চয়।—অরবিন্দ হেসে উত্তর দেয়।

ঠিক তাই। ট্রে করে খানকতক গরম মোগলাই পরোটা নিয়ে মিতা ঘরে ঢোকে।

—দেখছ, আমি ঠিক বলিনি। —মিতাকে লক্ষ্য করে বলে—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

—তুমি এ বাড়ির জামাই, এটা ভুলে যাচ্ছো কেন ?—অনুপ বলে।

—ভুলতে চাইলেই বা ভুলতে দিচ্ছে কে ? তোমার গিন্নী যা খাতির-যত্ন শুরু করেছেন।—মিতার দিকে চেয়ে অরবিন্দ বলে।

—জামাইকে খাতির না করলে চলে।—মিতা মিষ্টি হেসে বলে।

চা খাওয়া হয়ে গেলে অরবিন্দ উঠে পড়ে। সঙ্গে বাণীও।

হ্যাঁ, অনুপদের ওখানে গিয়ে বাণীর মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেছে।

বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা উতরে গেল অরবিন্দর। যা ভেবেছে সে—মানসী বাড়ি ফিরে এসেছে শান্তিনগর থেকে। চারটের সময়েই তো ওর ফেরার কথা ছিল।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল মানসী। কিন্তু ওর দিকে চেয়েও দেখলো না, গম্ভীর মুখে আবার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

একি, ঘরে এখনও আলো জ্বলেনি কেন ?

ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিল নিশ্চয়। অরবিন্দর উপর রাগ করেছে সন্দেহ নেই।

সুইচ টিপে ঘরের আলোটা অরবিন্দই জ্বালিয়ে দেয়। মানসী তৎক্ষণে আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

ওর রাগকে আমল না দিয়েই অরবিন্দ সহজ গলায় জিজ্ঞেস করে—সান্ধ্যবেলায় শুয়ে আছো, শরীর খারাপ হয়েছে ?

মানসী ভুরু কুঁচকে ওর দিকে একবার তাকালো শুধু। কোন উত্তর দিলে না।

রাগের ভাবেই বিছানার উপর উঠে বসলো।

—চা খেয়েছ ?—অরবিন্দ জিজ্ঞেস করে।

মানসী তবু নিরুত্তর।

—খাও তো, করে দিতে পারি।—অরবিন্দ মৃদু হেসে বলে।

—থাক, অত দরদে কাজ নেই।···চায়ের কোন দরকার নেই আমার, তোমার ইচ্ছে হলে—

—না দরকার আমারও নেই। অনুপদের ওখানে গিয়েছিলাম! চায়ের সঙ্গে মিতা মোগলাই পরোটা খাওয়ালে—মুখে দিলেই গলে যায়। এইভাবে আজেবাজে কথা বলে মানসীকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে অরবিন্দ।

কিন্তু এত কথাতেও মন নরম হয়না মানসীর। খাটের উপর গুম্ হয়ে বসে আছে।

অরবিন্দও আর সময় নষ্ট করে না। কাপড়-জামা বদলে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসে। পত্রিকার অনেকগুলি লেখা এসে জমে আছে—এখনও পড়ে দেখা হয়নি।

অরবিন্দ হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে মানসী উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রান্নার যোগাড় করতে নিশ্চয়।

অরবিন্দও অমনি তার ফাইল নিয়ে বসে গেল। লেখাগুলি পড়তে পড়তে রাত নটা বাজলো।

রান্না সেরে মানসী আবার ঘরে এসে ঢুকলো। ওর কথাতেই চমক ভাঙ্গলো অরবিন্দর—খাবে না ?

মানসীর কণ্ঠস্বর কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনালো যেন। ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেলে যেমন হয়।

কিন্তু মুখখানা অমন গম্ভীর কেন ? না, প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। এখন কিছুতেই ও কথার উত্তর দেবেনা। যা মেজাজ একখানা !!

খাতাপত্তর রেখে অরবিন্দ উঠে পড়ে। মানসীর দিকে চেয়ে বলে—এর মধ্যেই রান্না হয়ে গেল ?···চল, খাওয়াটা সেরে ফেলাই ভালো—সারাদিন যা ধকল গেল ! তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়বো।

বিদ্রূপের ভাবে মানসী ঠোঁট বাঁকায়। তারপর আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে।

অরবিন্দও রান্নাঘরে ঢুকে খাবার টেবিলে বসে পড়ে। প্রতিদিনের মতই খাবারগুলি টেবিলে সাজিয়ে ফেলে মানসী। কিন্তু খেতে বসে নিজে কিছুই খাচ্ছে না কেন ? পাঁচ মিনিট ধরে একচামচ ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। দু'এক গ্রাস খেয়েই হাত তুলে বসে থাকে।

—খাবে না আর ?—অরবিন্দ জিজ্ঞেস করে।

—খিদে নেই।

—দিদির ওখান থেকে এমন কি চর্ব্যচূষ্য খেয়ে এলে?—ওকে হাসাবার উদ্দেশ্যে অরবিন্দ হেসে রসিকতা করে।

মানসী তবু গম্ভীর হয়েই বসে থাকে। খানিক পরে বলে—তুমি খেয়ে নাও।

খাওয়া সেরে দু'জনে আবার ফিরে আসে শোবার ঘরে। চেয়ারে বসে মানসীকে হাত ধরে কাছে টেনে একটু আদর করার চেষ্টা করে অরবিন্দ। মানসী ঝট করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে খাটের উপর গিয়ে বসে। আর কোন কাজ না পেয়ে টেবিলের উপর পড়ে-থাকা পুরনো একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে অরবিন্দ বলে—আমাদের এখানে আজ আর মিটিং-এর ঝামেলা করিনি। কমরেড চ্যাটার্জীর ওখানেই ব্যবস্থা করেছিলাম।

মানসী একটু মুখ বাঁকালো কথাটা শুনে।—তোমার মিটিং-এর খবর জেনে আমার দরকার কি! যেখানে খুশি গিয়ে মিটিং করনা কেন—ভাবটা এইরকম।

অরবিন্দ তখন করে কি। ঘড়িতে তখনও দশটা বাজেনি, এত শীগগির ঘুমনোর অভ্যাস নেই ওর। অগত্যা পড়ার টেবিলে খাতাপত্তর নিয়ে আবার বসে যায়। বাইরে ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারটা বাজার আওয়াজ কানে যেতেই উঠে পড়ে। না, আজ আর নয়। মানসী এমনিতেই চটে আছে ওর উপর। আর দেরি করলে হয়তো কাছেই আসবেনা।

মানসী ততক্ষণে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। অরবিন্দ খাতাপত্তর রেখে উঠে পড়ে। কিন্তু সে বিছানায় গিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গে মানসী ওর দিকে পিছন করে পাশ ফিরে।

মানসীর কাছে সরে গিয়ে তার কাঁধে হাতখানা রাখে অরবিন্দ। মানসী রাগ করে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে—যাও, আমাকে বিরক্ত করোনা। ঘুমোতে দাও।

—ঠিক আছে, ঘুমোও তাহলে।—অরবিন্দও একটু ক্ষুণ্ণ হয় বৈকি। এত রাগের কি হল। কি এমন অপরাধ করেছে সে। ওর সঙ্গে আজ

সকালে শান্তিনগরে যায়নি, এই তো ব্যাপার। তার জন্যে এতক্ষণ রাগ করে থাকবে? না, অরবিন্দও আর সাধাসাধি করতে যাবেনা ওকে। রাগ-অভিমান যেন আর কারো থাকতে পারে না।

পরের দিন। সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে অরবিন্দ দেখে মানসী এর মধ্যেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। এত শীগগির সাধারণত ওর ঘুম ভাঙ্গেনা।

বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো অরবিন্দ। মানসী ততক্ষণে চা তৈরী করে টেবিলে সাজিয়ে ফেলেছে।

— নাও, এবার চট করে চা-টা খেয়ে নাও।- অরবিন্দকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো মানসী।

কোন উত্তর না দিয়ে অরবিন্দ টেবিলে গিয়ে বসলো—বললে—তুমি এসো, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

স্টোভ নিভিয়ে মানসী ওর পাশে চেয়ারে বসে চা খেল। মুখখানা গম্ভীর দেখালেও রাগের তেমন কোন লক্ষণ ছিল না। নিশ্চিন্ত মনে অরবিন্দ চা খেয়েই বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। মানসীকে এখন চটপট রান্না সেরে স্কুলে যাবার জন্যে তৈরী হতে হবে।

অরবিন্দ শোবার ঘরে এসে ঢুকলো আবার। পত্রিকার জন্যে আরো কয়েকটা লেখা দেখতে হবে।

ড্রয়ার খুলে কাগজপত্র বের করে পড়তে বসে অরবিন্দ। ঘণ্টাখানেক বাদে লেখাগুলো আবার ড্রয়ারে রাখতে গিয়েই ঐ ছবিটা বেরিয়ে পড়ে। একি, এ যে ওর নিজেরই ফটো—বিয়ের পর তুজনে একসঙ্গে যে ছবিটা তুলেছিল—তুলেছিল অবশ্য মানসীর উৎসাহেই। কিন্তু তুজনার গ্রুপ ছবি কেটে আলাদা করলো কে? মানসী? রাগের মাথায় ও অনেক ছেলেমানুষী করতে পারে। ছবিটা যে ছিঁড়ে ফেলেনি এই যথেষ্ট।

রান্না সেরে মানসী এসে ঘরে ঢোকে। অরবিন্দর হাতে ছবিখানা দেখেই চটে আগুন। হাত থেকে ছবিটা ছিনিয়ে নেয়।

—সুন্দর গ্রুপ ফটোখানা কেটে নষ্ট করলে কেন?—অরবিন্দ জিজ্ঞেস করে।

মানসী অমনি ঝাঁজিয়ে উঠে।—আমি নষ্ট করতে যাব কেন? যে করেছে তাকে গিয়েই জিজ্ঞেস কর।

ঘটনাটা মনে পড়ে গেল অরবিন্দর। হ্যাঁ, এই ফটোখানার এককপি সে রমাকে প্রেজেন্ট করেছিল।

বিয়ের পর শান্তিনগরে অবিনাশবাবুর বাড়িতে বেড়াতে গেলে রমা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—বিয়ের পর যুগলে মিলে কোনো ফটো তোলনি?

অরবিন্দ মিথ্যে কথা বলতে পারেনি। হেসে বলেছিল—মানসীর যা জেদ, না তুলে রক্ষে আছে?

—তা আমাকে এককপি দেবে না?

—দেখা যাক।—অরবিন্দর উত্তর দিয়েছিল।

তারপর কয়েকদিন বাদেই ফটোখানার একটা কপি রমাকে সে দিয়েছিল বৈকি।

—তুমি নিজেই তো রমাকে প্রেজেন্ট করেছিলে ঐ ফটোখানা। ছবিটা নষ্ট করে থাকলে তোমার পেয়ারের রমাই করেছে।—মানসী তেমনি ঝাঁজের সঙ্গে বলে ওঠে।

অরবিন্দ আশ্চর্য হয়ে যায়। বলে—কিন্তু অমন সুন্দর গ্রুপ ফটোখানা কেটে রমা নষ্ট করতে যাবে কেন?

—কেন, তাও বুঝতে পারছো না।…তোমার পাশে আমাকেও সহ্য করতে পারেনি।

কি অভদ্র কথা! অরবিন্দ বিরক্তির সঙ্গে বলে—যা তা বকছো কেন?

—যাও, আর সাধু সাজতে হবেনা। রমাকে তুমি বিয়ে করতে চাওনি?

অরবিন্দ হতভম্ব হয়ে মানসীর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ যেন তারও জেদ চেপে যায়। বলে—চাইলেই বা দোষের কি? বিধবা মেয়েকে বিয়ে করলে জাত যায় না।—একটু চুপ করে থেকে আবার বলে—অপমান করে যখন তোমার বাবা আমাকে তোমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা তখন আমি আর ভাবতে পারিনি।

—বাবা কখন আবার তোমাকে তাড়িয়ে দিলেন !—মানসী যেন বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা। ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করে কিছুক্ষণ। তারপর বলে ওঠে—কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে তুমি রমার মত একটি অশিক্ষিত মেয়েকে—

অরবিন্দ এবার সত্যি চটে যায়। বলে—তোমাকে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি মানসী, আমার সামনে তুমি রমার সম্বন্ধে একটি কথাও আর উচ্চারণ করবে না।

—রমাকেই তাহলে তুমি ভালোবাসতে ?···বিয়ে করতে চেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ, চেয়েছিলাম, রমা রাজী হলে হয়তো—

অরবিন্দর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় মানসী। রাগে-অপমানে কাঁপতে থাকে থরথর করে। ধপ করে খাটের উপর গিয়ে বসে পড়ে।

অরবিন্দও অমনি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। না, ঘরে থাকলে অশান্তি বাড়বে বই কমবে না। কেঁদে-কেটে মানসী খানিকবাদে নিজেই শান্ত হবে ! তখন নিশ্চয় নিজের ভুল বুঝতে পারবে। ততক্ষণ বাইরে কাটিয়ে আসাই ভালো।

অরবিন্দ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে

অরবিন্দ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার খানিকবাদে মানসীও উঠে পড়ে। না, বাড়িতে বসে মন খারাপ করে লাভ নেই। তার চেয়ে স্কুলে গিয়ে কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকলে দুঃখটা তবু ভুলে থাকা যাবে। সবই অদৃষ্ট। তা নইলে অরবিন্দরই বা অমন দুর্মতি হবে কেন ? আদর্শ-বাদী ছেলে, কত দুঃখ, কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়েছে—ওর পক্ষে এরকম হওয়া—

না, ঐ মেয়েটাই ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। ওদের ওখানেই তো থাকতো দিনের পর দিন। পার্টির সব ব্যাপারে এগিয়ে আসতো মেয়েটা। তাতেই গলে গেছে অরবিন্দ।···মানসীর সঙ্গে তো ওর দেখা-সাক্ষাৎই ছিল না এক সময়। আর সত্যিই যদি ওর বাবা ওকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকেন।···। তা, বাবার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। দাদাকেই যখন ঐভাবে—

অরবিন্দর খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে মানসী চটপট জামা-কাপড় বদলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। না খেয়েই চলে গেল সে—স্কুলের সময়ও হয়ে এসেছিল।

স্কুলে এসে কাজকর্মের মধ্যে ডুবে গেল মানসী। কাজকর্মের মধ্যে থাকলে সব কথা ভুলে থাকা যায়।

স্কুল ছুটি হয়ে গেলেই বাড়ির কথা মনে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে সকালের সেই ঘটনাটা। কি আশ্চর্য জেদ অরবিন্দর! কিছু না বলেই কেমন বেরিয়ে গেল। দুপুরে বাড়িতে এসে ভাত খেয়েছে কিনা কে জানে! টেবিলে খাবারগুলো হয়তো তেমনি ঢাকা দেওয়াই পড়ে আছে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে আসছিল মানসী। অরবিন্দর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ওর কাছ ঘেঁষে যে আর একটা প্রাইভেট মোটর গাড়ি ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে, সেটা লক্ষ্যই করেনি। আচমকা গাড়ির দরজাটা খুলে কে একজন হেঁচকা টানে ওকে গাড়ির ভেতর টেনে নিয়ে গেল।—ও মাগো—মানসী চিৎকার করতে যাবে, লোকটা ওকে সে-সুযোগ না দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে মুখ বেঁধে ফেললো কাপড় দিয়ে। শুধু মুখ নয়, চোখ দুটোও ওর বেঁধে ফেললো লোকটা। অনেক ধস্তাধস্তি করেও গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো না মানসী। কি অসুরের মত গায়ের জোর লোকটার। ভয়ে-আতঙ্কে মানসীর বুক কাঁপতে লাগলো।

খানিকবাদে গাড়িটা এসে থেমে গেল। চোখ বন্ধ থাকায় জায়গাটা দেখতে পেলনা মানসী। লোকটা ওকে পাঁজাকোলা করে গাড়ি থেকে নামিয়ে কোথায় যেন নিয়ে এল।

গদি-আঁটা একটা সোফায় শুইয়ে দিলো ওকে।

মুখ ও চোখ খুলে দিতেই মানসী দেখলো সুবোধ ওর সামনে দাঁড়িয়ে শয়তানের হাসি হাসছে। সেই অসুরের মতো লোকটাকে তখন আর ঘরে দেখা গেলনা।

সোফার উপর ঝট করে উঠে বসলো মানসী। সুবোধও অমনি ওর পাশে এসে বসলো। হাতটা চেপে ধরে বললে—খুব ভয় পেয়ে গেছ, না? ভয়ের কোন কারণ নেই।

এক ঝটকায় মানসী হাতটা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দেখলো—না উদ্ধারের কোন উপায় নেই। দরজায় মস্ত বড় তালা। জানলাগুলোও সব বন্ধ।

সুবোধ হেসে উঠলো—সেই শয়তানের হাসি।

কিন্তু এটা তো সুবোধের বাড়ি নয়। সুবোধের বাড়ির ঘরগুলো সবই ওর চেনা।

ওমা, এ যে কারো শোবার ঘর। বিরাট এক পালঙ্ক—পুরু গদির বিছানা।

—আমাকে ছেড়ে দিন।—মানসী বলে উঠে।

—এখুনি যেতে দেব কেন সুন্দরী? কতদিন দেখা হয় না, এককালে কত ভালোবাসাবাসি ছিল। মানসীর হাত ধরে সুবোধ টেনে নিলে নিজের কাছে।···হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মানসী রাগের চোটে ওর গালে চড় মারতে যাবে, সুবোধ তার আগেই আবার ধরে ফেললো ওর হাতটা। বজ্রমুষ্টি, ছাড়াবার উপায় নেই।

একটু বাদেই সুবোধ নিজে থেকেই হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে—কি খাবে বল? সফট্ ড্রিঙ্ক-এর ব্যবস্থাও করে রেখেছি তোমার জন্যে—শ্যাম্পেন মদ নয়, লেডিস ড্রিঙ্ক।—

বলেই গেলাসে বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে মানসীর হাতের কাছে এগিয়ে ধরলো।—নাও, খেয়ে নাও, খুব ভয় পেয়ে গেছ। খেলে এখুনি মনে বল পাবে।

—না, মানসী দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠে।

সোফার সামনে টেবিলে মদ, মদের গেলাস ছাড়াও আরো নানারকম ভাজাভুজি। একপ্লেটে দুটো কাটলেট তুলে সুবোধ মানসীর মুখের কাছে ধরে বলে—লক্ষ্মীমেয়ের মত এই খাবারটুকু চট করে খেয়ে নাও দিকি।

একহাতে মদের গেলাস অন্য হাতে কাট্‌লেটের প্লেট নিয়ে সুবোধ আবার বলে—এতকাল বাদে দেখা, কিছু না খেয়ে চলে যাবে, এটা কি ভালো দেখাবে!

মানসী গুম্ হয়ে বসে থাকে। সুবোধ বলে—দু'জনে আজ একসঙ্গে বসে খাবো বলেই না তোমাকে আজ এত ঝুঁকি নিয়ে এখানে নিয়ে

আসা। খাওয়া হয়ে গেলেই আমি নিজে গাড়ী করে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

—আমি নিজেই যেতে পারবো। গাড়ীর দরকার নেই।—মানসী উত্তর দেয়।

—ঠিক আছে, খাওয়া হয়ে গেলেই তুমি ছাড়া পাবে।--

মানসী ওর কথাতেই বিশ্বাস করে। না করে উপায়ও ছিল না। গলা জ্বালা করলেও গেলাসের পানীয়টা আস্তে আস্তে খেয়ে নিলে, কাটলেট দুটোও। খাওয়া হয়ে গেলে যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ওর হাত থেকে।

সুবোধ বসে বসে মদ গিললো বেশ কয়েক পেগ—সঙ্গে ভাজাভুজিও।

খাওয়া হয়ে গেলেই মানসী উঠে দাঁড়ালো।—এবার আমাকে ছেড়ে দিন—দরজার দিকে তাকিয়ে বললো কথাটা।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই সুবোধ পাঁজাকোলা করে খাটের উপর নিয়ে গেল মানসীকে।

বুকের কাপড়-জামা টেনে সরিয়ে দিতে দিতে বললে—ধর্মপত্নী হতে যখন রাজী হলেনা, তখন—মানসী চিৎকার করতে যাবে, সুবোধ তার আগেই তার ঠোঁট দুটো ওর ঠোঁটে চেপে ধরলো। হাত দিয়ে খামচে ধরলো মানসীর বুক—আঃ কি সুন্দর ডাগর হয়ে উঠেছে বুকখানা।

তারপর খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি চললো। শত চেষ্টা করেও মানসী ওর হাত থেকে ছাড়া পেল না। সুবোধের সেই আসুরিক শক্তির সঙ্গে পেরে উঠলো না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে—প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললো।

কিছুক্ষণ পরে নিজের সমস্ত কামনা চরিতার্থ করে উঠে পড়লো সুবোধ। মানসী তখন নিস্তেজ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। সুবোধের কথায় যেন সজাগ হয়ে উঠলো।--নাও, এবার উঠে জামা-কাপড়গুলো ঠিক করে নাও।

মানসী উঠে জামা-কাপড়গুলি ঠিক করে নিলে। শরীরটা তখনও থরথর করে কাঁপছে ওর। উঃ কি সাংঘাতিক লোক। মানসীর উপর কি নির্মমভাবে অত্যাচার করলো!

কাঁপতে কাঁপতে মানসী খাট থেকে নেমে পড়লো।

সুবোধ তখন সোফায় বসে চুরুট টানছে। মানসী দিকে চেয়ে হেসে উঠলো আচমকা। হাসতে হাসতে কথাগুলি বললে—রাগ কোরনা প্রিয়ে, অনেকদিনের সাধ আজ পূর্ণ করে নিলাম।—বলেই মানসীর হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে কোলের উপর টেনে নিতে যাচ্ছিল।

মানসী জোর করেই ছাড়িয়ে নিলে নিজেকে। বললে—এবার দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

—হ্যাঁ, ছেড়ে তো দেবই। কিন্তু একলা যাবে কি করে? দূর তো কম নয়।

—না, আমি একলাই যেতে পারবো—মানসী জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে।

—যেতে দেব একটা সর্তে। আজকের ঘটনা তুমি কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবে না—আমার নাম ভুলেও উচ্চারণ করবে না।

মানসী কোন উত্তর দেয়না। দিতে পারে না। সুবোধ বলে—কথা না রাখলে তোমাকে আরো দুঃখ পেতে হবে জেনে রেখ।…কথার খেলাপ করলে তোমার অরবিন্দর ঘাড়ে মাথা থাকবে না। বলে দিলাম।

অরবিন্দকে ও—। ভয়ে মানসীর বুক দুরদুর করে। বলে—না, আমি কারো কাছে নাম প্রকাশ করবো না।

—তবে চলো।

ঘরের তালা খুলে মানসীর হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এল সুবোধ। বাড়ির করিডোরে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সুবোধ একরকম জোর করেই ওকে গাড়িতে নিয়ে তুললো। যা শক্ত করে হাতটা ধরে রেখেছিল, ছাড়ানোর সাধ্য ছিল না মানসীর।

ওরা গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার গাড়িটা ছেড়ে দিলে। এবার কোথায় নিয়ে চললো। কোথাও নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবে না তো? ভয়ে-আতঙ্কে মানসী দিশাহারা হয়ে পড়ে—দোহাই আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন।…বাসে চেপে আমি একলাই বাড়ি যেতে পারবো।

সুবোধ হেসে বলে—কোন দুঃখে বাসে চাপতে যাবে তুমি?…তোমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই আমি তোমাকে নামিয়ে দেব।

বাড়ির ঠিকানাটা তাহলে জানে সে।

—সত্যি ছেড়ে দেবেন তো ?

সুবোধ দুঃখের ভান করে বলে—তোমাকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় আছে ? অন্যের স্ত্রী, চিরদিন আটকে ধরে রাখার সাধ্য কি ? শেষকালে আবার ঝামেলার মধ্যে— । সুবোধ কথা শেষ করেনা।

মানসী আর উত্তর দেয়না। চুপ করে বসে থাকে। গাড়ির স্পীড-টা বড় কম মনে হচ্ছে। একযুগ যেন সে বসে আছে গাড়িতে। এতক্ষণে বাড়িতে পৌঁছে যাবার কথা।

না, সুবোধ শেষ পর্যন্ত তার কথা রেখেছে। মানসীদের বাড়ির বড় রাস্তার মোড়েই ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

রাত তখন আন্দাজ দশটা। রাস্তায় লোকজনের ভিড় নেই। নির্জন ফাঁকা রাস্তা। নির্জন রাস্তাই যেন আজ বেশি নিরাপদ মনে হল ওর কাছে।

মানসী হনহন করে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে অরবিন্দকে সে কি কৈফিয়ত দেবে! সুবোধের নাম সে প্রাণ থাকতে উচ্চারণ করতে পারবে না। পারবে না অরবিন্দর জন্যই। একবার হাত ভেঙ্গে দিয়েছিল সুবোধ। এবার নাকি— । না, ওর নাম উল্লেখ করা চলবে না।...মানসীকে মিথ্যে কথাই বলতে হবে। বলবে স্কুল থেকে ফিরবার পথে এক গুণ্ডার হাতে পড়েছিল সে। চোখ-মুখ বেঁধে কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছিল লোকটা। তারপর—তারপর ? না, ঐ অপমানের কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না মানসী।

বলতে হল না কিছুই। বাড়ির সামনে এসে দেখে দরজায় তখনও তালা ঝুলছে। অরবিন্দ এখনও তাহলে ফিরে আসেনি।

তালা খুলে সোজা নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো মানসী। টেবিলের উপর হাত ব্যাগটা রাখতে গিয়েই পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দেওয়া কাগজখানা নজরে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ভাজ করা কাগজখানা হাতে তুলে নিলে সে।

অরবিন্দর চিঠি। দুপুরে বাড়িতে ফিরে এসেছিল তাহলে। এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেললো মানসী। আজ রাত্রে অরবিন্দ বাড়িতে ফিরবে না —কলকাতার বাইরে যেতে হবে।

মানসী ঝপ করে চেয়ারে বসে পড়লো। চুপচাপ খানিক বসে থেকে উঠে পড়লো।

ধোঁয়া কাপড়-জামা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। নিজেকে বড় অশুচি মনে হচ্ছিল। স্নান করতে হবে। তার আগে মুখে জল নিয়ে কতবার যে কুলকুচি করলো। কিন্তু ঐ বিশ্রী গন্ধটা কিছুতেই যেন যেতে চায় না। সারা গায়ে ঘষে ঘষে সাবান মাখলো। গায়ে বালতি বালতি জল ঢেলেও গায়ের ময়লা যেন পরিষ্কার হতে চায় না। ছাড়া জামা-কাপড-সায়া সব বালতিতে ভিজিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত মানসী বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

চুলগুলো সব ভিজে চপচপ। একরাশ চুল, আঁচড়ানোর এখন আর শক্তি নেই মানসীর। মাথাটা কোনরকমে তোয়ালে দিয়ে মুছেই খাটের উপর এসে চিত হয়ে পড়লো সে। অরবিন্দও আজ রাত্রে বাড়িতে ফিরবে না। এখনও হয়তো রাগ করে আছে। একলা ঘরে বুক ভেঙ্গে কান্না এল মানসীর। অরবিন্দ কাছে থাকলে তার কোলে মুখ গুঁজে খানিকটা কাঁদতে পারলেও মনটা অনেক শান্ত হত ওর। না, অরবিন্দর সঙ্গে আর কোনদিন ঝগড়া করবে না সে।

বালিসে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মানসী। তারপর নিজের অজান্তেই এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে মানসীর সঙ্গে ঐ কথা কাটাকাটির পর ঝোঁকের মাথায় অরবিন্দ বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে। খানিকবাদেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল সে। মানসীকে ঐ কড়া কথাগুলো বলা সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন সকলের সঙ্গে সম্পর্কে ত্যাগ করে এক কাপড়ে মেয়েটা চলে এসেছে ওর কাছে। ভালোবাসে বলেই না এত কষ্ট বরণ করে নিয়েছে স্বেচ্ছায়।...অভিমানী মেয়ে! একটুতেই তাই অভিমান হয়। ওর কথাগুলো সিরিয়াসলি না নেওয়া উচিত ছিল অরবিন্দর।

ঘণ্টাখানেক বাদেই অরবিন্দ বাড়িতে ফিরে এসেছিল। ভেবেছিল, মানসী রেগে-মেগে হয়তো বিছানায় শুয়ে কাঁদছে—স্কুলে চলে গেছে ভাবতেই পারেনি।

দরজায় তালা ঝুলছে দেখে সে তাই একটু অবাক হয়ে গেছে বৈকি। যাক্ রাগ তাহলে পড়ে গেছে ওর।

মানসীর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে নাওয়া-খাওয়া সেরে নিল অরবিন্দ। টেবিলে রোজ যেমন থাকে তেমনি ওর ভাত-ডাল-ঝোল ঢাকা দেওয়াই ছিল।

খেয়ে-দেয়ে শোবার ঘরে এসে খাতাপত্তর নিয়ে বসে গেল অরবিন্দ। পত্রিকার কমেন্টগুলো সব এখনও লেখা হয়নি।

বেলা তখন তিনটে বেজে গেছে। এমন সময়ে কমরেড ব্যানার্জীর এক শ্লিপ নিয়ে একটি ছেলে এসে হাজির। বিকেল পাঁচটায় পার্টির এক জরুরী বৈঠকে উপস্থিত হতে হবে ওকে। জায়গাটা কলকাতার শহরতলীতে। মিটিং সেরে রাত্রে বাড়িতে হয়তো ফিরে আসা সম্ভব হবে না।

কাগজপত্র ফাইল সুদ্ধ দেরাজে ঢুকিয়ে রেখে অরবিন্দ চিঠি লিখতে বসলো মানসীকে। জরুরী প্রয়োজনে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে। রাত্রে হয়তো আর ফিরে আসতে পারবো না। তুমি খেয়ে নিও, আমার জন্য অপেক্ষা করো না।

যাবার মুখে পাশের ঘরের বউদিকে ডেকে বলে গেল কথাটা।

একগাল হেসে বৌদি ওকে আশ্বাস দিলেন—কোন চিন্তা করবেন না, আমরা তো পাশেই আছি।

কিন্তু পাশে থেকেই বা কি লাভ হল!

সকালে বাড়িতে এসেই অরবিন্দর চক্ষুস্থির। কড়া নাড়তেই অবশ্য মানসী এসে খুলে দিলে দরজাটা। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে চোখমুখের! চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। সারারাত ও হয়তো কেঁদে কাটিয়েছে। ···এখুনি হয়তো বিছানা থেকে উঠে এসেছে সে। এলোমেলো কাপড়-চোপড় আর চুলের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

শোবার ঘরে ঢুকে মানসী আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লো।

—শরীর খারাপ হয়েছে ?—চিন্তিত হয়ে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলে।

মানসী কোন উত্তর দিলে না। অভিমানী দৃষ্টিটা শুধু তুলে তাকালো একবার। কথা বলার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলো না। ঠোঁট দুটো শুধু থরথর করে কেঁপে উঠলো। চোখ দুটোও জলে ভরে গেল দেখতে দেখতে।

অরবিন্দ আর স্থির থাকতে পারলো না। খাটের উপর ওর কাছে গিয়ে বসলো। কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠল—একি, তোমার জ্বর হয়েছে ?

মানসী কোন উত্তর দেয় না। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কান্নাধরা গলায় বলে—তুমি কেন রাগ করে চলে গেলে ?···তুমি না গেলে—

মানসীর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নেয় অরবিন্দ। একি, কব্জির কাছে এতখানি জায়গায় কালো শিরা পড়ল কিভাবে ? নেড়ে-চেড়ে হাত দুটির আরো কয়েক জায়গায় ঐ রকম আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেল সে।

—বাস থেকে পড়ে গিয়েছিলে নাকি ?—অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল ?—উদ্বেগের সঙ্গে অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলো মানসীকে।

মানসী কোন কথা বললে না। ঘাড় নেড়ে সায় দিলে শুধু।

—আচ্ছা, তুমি থাকো, উঠোনা। আমি চা নিয়ে আসছি।—চা খেলে হয়তো একটু সুস্থ বোধ করবে।

রান্নাঘরে গিয়ে অরবিন্দ চটপট চা করে ফেললো। দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে সে যখন আবার শোবার ঘরে ফিরে এল, মানসী তখন বিছানার উপর উঠে বসেছে। খাড়া হয়ে নয়, বালিসে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে আছে।

মানসীর হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে অরবিন্দ ওর পাশেই বসে পড়লো।

চা খাওয়া হয়ে গেলেও মানসী নির্বাক হয়ে রইল।

অরবিন্দ বললে—আমি যাই, ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসি।

মানসী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে—না, না, ডাক্তারের দরকার কি ! সামান্য জ্বর, এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে।

কিন্তু অরবিন্দ চুপ করে থাকে কি করে! বেশ কিছুদিন থেকেই শরীরটা ভালো যাচ্ছে না মানসীর। তবু ডাক্তার দেখাবে না। শরীর দুর্বল বলেই হয়তো বাস থেকে পড়ে গেছে। ইস্‌, এই অবস্থায় কালরাত্রে বেচারীকে একলা থাকতে হয়েছে, না খেয়েই রয়েছে নিশ্চয়। নিজেকেই এখন অপরাধী মনে হয় অরবিন্দর। কেন যে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল!

না, মানসীর উপর সে আর কখনো রাগ করবে না।—ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নেওয়া দরকার।—বলেই অরবিন্দ ডাক্তারকে ডেকে আনতে গেল। পাড়ার চেনা ডাক্তার, ওদের পার্টির সমর্থক। ডাকতেই বেরিয়ে এলেন।

দরজাটা মানসী উঠে আর বন্ধ করেনি।

অরবিন্দ ডাক্তারকে নিয়ে সোজা এসে ঢুকলো শোবার ঘরে। মানসী ততক্ষণে আবার শুয়ে পড়েছে।

খাটের পাশে চেয়ারটা টেনে নিয়ে মানসীকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার।

—কেমন দেখলেন?—অরবিন্দ তাঁকে জিজ্ঞেস করে।

—চিন্তার কিছু নেই। চোট লেগে সামান্য টেম্পারেচার হয়েছে।

ডাক্তার খসখস করে কাগজে প্রেসক্রিপশন্‌ লিখে ফেললেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

কাগজটা অরবিন্দর হাতে দিয়ে বললেন—ওষুধটা এনে এখুনি খাইয়ে দিন।—একটু থেমে অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—স্ত্রীর এবার একটু যত্ন-তদ্বির করুন।···মা হতে চলেছেন, বুঝতে পারছেন না?

শুনে অরবিন্দ চমকে ওঠে। মানসী মা হতে চলেছে—সংবাদটা যেন অন্তরঙ্গ কোন প্রিয়জনের আনন্দময় আবির্ভাবের। সে-ভাবটা গোপন করে প্রশ্নভরা চোখে মানসীর মুখের দিকে তাকায় অরবিন্দ।

মানসীর মুখে দুর্বল-সলজ্জ খুশির আভা। লজ্জা পেয়েই হয়তো চোখ নামিয়ে নেয় সে।

ডাক্তারকে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে অরবিন্দ আবার এসে বসে মানসীর কাছে।

মানসীর মাথায় হাত রেখে বলে—আমাকে বলোনি কেন এতদিন ?

—আমি নিজেই কি বুঝতে পেরেছি ?

—বুঝতে পারনি ?...বোকা মেয়ে, তিনমাস হয়ে গেল, তবু বুঝতে পারোনি ?—একটু থেমে বলে—আমাদের ভাগ্য ভালো যে কাল তোমার পেটে কোন চোট লাগেনি, বাচ্চা ঠিকই আছে।...যাই তোমার ওষুধটা নিয়ে আসি। তুমি কিন্তু আজ বিছানা থেকে একদম উঠবে না !—বলেই অরবিন্দ উঠে পড়ে।

কিন্তু যাবার আগে ওর কপালে আলতো করে একটু চুমু খেতে গেলে ও অমন চমকে উঠল কেন ?—হঠাৎ কোন দুর্বৃত্ত যেন ওর উপর বলপ্রয়োগ করছে !

বেশ কিছুদিন ভূপেশের সংসারের কোন খবর পায়নি বারীন। স্ত্রী, ছেলে-পুত্রবধু এবং নাতিদের নিয়ে নিশ্চয় ব্যস্ত আছে ভূপেশ। বারীনও আজকাল আর আগের মত ঘোরাঘুরি করতে পারে না। ভূপেশের পক্ষেও ঘনঘন এসে ওদের খবর নেওয়া সম্ভব নয়। নিজের কাজকর্ম আছে, তার উপর ওর শরীরও আগের মতো জোরালো নেই। মানতে না চাইলে কি হবে, বয়স তো সবারই বাড়ছে।

বিকেলবেলায় চা খেয়ে বেরুনোর জন্যে তৈরী হয়েছে বারীন। বাড়ির কাছাকাছি খানিকটা পায়চারি করেই ফিরে আসবে। এমন সময় ভূপেশ এসে ঘরে ঢুকলো। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বুঝতে পেরেছিল বারীন, গাড়ি করে এমন সময়ে কে আর আসবে ভূপেশ ছাড়া।

বারীন খাটের উপর বসে ওকে চেয়ার দেখিয়ে দিলে।—বোসো।

চেয়ারে বসে এক মুখ হাসি নিয়ে ভূপেশ বললে—বেরুচ্ছিলে বুঝি ?

—হ্যাঁ, না বেরুলে রক্ষে আছে ? বিকেলে আধঘণ্টা হাঁটতে হবে, ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করলে মেয়েই হয়তো আমাকে একদিন disown—অস্বীকার করে বসবে। যা দিন-কাল !

ভূপেশ হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ে। নিজের মেয়ের কথা মনে পড়েছে হয়তো। না, কথাটা বলা ঠিক হয়নি। বারীনের আজকাল কি

যে হয়েছে, হঠাৎই এই রকম বেফাঁস কথা দু চারটে বেরিয়ে পড়ে মুখ থেকে। বয়েসেরই ধর্ম হয়তো। না, এখন থেকে কম কথা বলার অভ্যাস করবে। অন্যের ব্যথার জায়গায় আঘাত লাগে এমন কথা ঠিক নয়।

বাণী হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে ভূপেশকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। উনি এসেছেন বাণী টের পায়নি এতক্ষণ।

বিস্ময়ের ভাব কেটে যেতেই বলে উঠলো—কাকাবাবু, আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি? ভূপেশ বারীনের মত যখন-তখন চা খায়না, বাণী জানে।

—না মা, আমি এইমাত্র চা খেয়েই বেরিয়েছি।

বাণী আর দাঁড়ালো না। আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভূপেশ বললে—মেয়েটি তোমার বড় সুলক্ষণা, যে ঘরে যাবে—

বারীন হেসে ফেলে। বলে—তুমি দেখছি এখন জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশারদ হয়ে উঠেছ। ওসব সত্যি বিশ্বাস করো নাকি?

—না করে উপায়? সংসারের সবাই যখন আমাকে পরিত্যাগ করলো, তখন এক জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়েছিলাম, কথাটা এতদিন গোপন রেখেছিলাম।

ভূপেশ একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর নিজের মনের আবেগে বলে যায়—আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি যা যা বলেছিলেন, সব ফলে গেল!

বারীন অনেক কষ্টে হাসি চাপে।

—যাকগে ওসব কথা।—ভূপেশ কথাটা চাপা দিয়ে বলে—যেজন্যে আজ তোমার কাছে আসা—কাল আমার ছোট-নাতির মুখে-ভাত। দুপুরের দিকে বাপ-মেয়ে আমার ওখানে খাবে।

বারীন আপত্তি করতে যাবে, ভূপেশ আবার বলে ওঠে—ছুটির দিন, যেতে আপত্তি হবেনা নিশ্চয়।

—দেখি!—বারীন দোমনা ভাবে উত্তর দেয়।

—তাহলে আমি উঠি এখন। তুমিও তো বেরুবে—বলেই ভূপেশ সবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঠিক সেই সময়ে অরবিন্দ এসে ঘরে ঢোকে।

অরবিন্দকে দেখেই মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠলো ভূপেশের।

বিয়ের পর ওর সঙ্গে এই প্রথম দেখা। প্রণাম করা দূরে থাক ভূপেশের সামনে এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না অরবিন্দ। গম্ভীরমুখে হনহন করে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। বাণীর কাছে হয়তো ওর লেখার জন্য তদ্বির করতে এসেছে।

অরবিন্দ চলে গেলে ভূপেশ আবার চেয়ারে বসে পড়লো। দস্তুর মত উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো ওকে।

গুম হয়ে কি যেন ভাবলো একটু। তারপর আচমকা আবার উঠে পড়লো।—চলি, বলেই গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যায়। বারীন দরজা অবধি এগিয়ে এসেছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু ভূপেশ কোন কথা না বলেই সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

ভূপেশ চলে গেলে বারীনও বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। অরবিন্দ এসেছে, তা বাণীই তো রইলো—ওর সঙ্গে বসে ততক্ষণ গল্প করুক।

উদ্দেশ্যহীনভাবে বাড়ির কাছাকাছি খানিকটা পায়চারি করে বারীন ভূপেশ তার দম্ভ এখনও ছাড়তে পারছে না। অরবিন্দকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কি চেহারা হয়ে গেল! অথচ ছেলের সম্পর্কে তো সব সংস্কার ঝেড়ে ফেলেছে—নিজে গিয়ে গাড়ি করে সবাইকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে বংশধর, ও যে বংশধর ভূপেশের। বংশধর না থাকলে বংশের সম্পত্তি রক্ষা করবে কে? সমীরের তাই সাতখুন মাপ করতে পারে ভূপেশ। কিন্তু অরবিন্দ! ও যে আলাদা শ্রেণীর—কুলি-মজুরের সমগোত্রীয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হয়েও ভূপেশ আজ নিজেকে ধনিকশ্রেণীর সমগোত্রীয় মনে করে!

খানিকবাদেই বারীন আবার ফিরে আসে বাড়িতে। বেড়াতে আজ আর ইচ্ছে করেনা। বিকেলের ঐ ছোট্ট ঘটনায় মন-মেজাজ খিঁচড়ে আছে তার। ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে এক কাপ চা খেলেই অবশ্য চাঙ্গা হয়ে উঠবে সে।

ইজি চেয়ারে বসে তাই বাণীকে ডাক দিলে বারীন।

—আসছি।—বাণী আসতে একটু দেরি করলো। কিন্তু বলার আগেই চায়ের কাপ নিয়ে হাজির। কাপটা ওর সামনে নামিয়ে রেখে বলে—বিস্কুট দেব দু'খানা?

—এ যে ওভালটিন্ ?—চা হলেই তো ভাল হত, চাঙ্গা হওয়া যেত।

—এটা তো খেয়ে নাও আগে।

—অরবিন্দ চলে গেছে ?

—হ্যাঁ, অরবিন্দর কথা তুলতেই বাণী কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লো। অরবিন্দ হয়তো তার উষ্মাটা প্রকাশ করে ফেলেছে ওর কাছে। শ্বশুর হলেও ভূপেশ তার দিকে ফিরেও তাকালো না। কথা বলা তো দূরে থাক। রাগ করা খুবই স্বাভাবিক অরবিন্দর। তবে অরবিন্দরও একটা প্রণাম করা উচিত ছিল। আজকালকার ছেলেরা অবশ্য প্রণামে বিশ্বাস করেনা।

বাণী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এগিয়ে বসলো বাবার কাছে। বললে—ভূপেশকাকা হঠাৎ চলে গেলেন যে ? অরবিন্দকে দেখেই হয়তো—

বারীন সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—কাল ওর ছোট নাতির মুখে-ভাত আমাদের দুজনকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল—দুপুরের দিকে—

—কিন্তু আমি তো যেতে পারবো না, কাল দুপুরে আমার অন্য জায়গায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—যাবার ইচ্ছে আমারও নেই। কিন্তু না গেলে—

ভুরু কুঁচকে বাণী কি যেন চিন্তা করে। একটা সমস্যায় পড়ে গেছে যেন।

ভূপেশকাকার সঙ্গে বাবাকে গল্প করতে দেখে বাণী বেরিয়ে এসেছিল ও-ঘর থেকে।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকে খাতাপত্তর নিয়ে বসেছিল। অরবিন্দর পত্রিকা ছাড়াও আরো কয়েকটা পত্রিকা থেকে ওর লেখা চেয়ে পাঠিয়েছে। দেশের ও বিদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে ও যে আবার কোনদিন প্রবন্ধ লিখতে পারবে, বাণী ভাবতেই পারেনি।

অরবিন্দর চাপে পড়েই প্রথমে লিখতে শুরু করে সে। তা এখন তো অনেকেই প্রশংসা করছে ওর লেখার। প্রশংসা পেলে যা হয়, লেখার উৎসাহও এখন বেড়ে গেছে ওর। ফাঁক পেলেই কাগজ-কলম নিয়ে বসে যায়। বাণীর বাবাও দারুণ খুশি এতে। স্নেহের হাসি হেসে বলেছেন —যাক এতদিনে একটা ভালো occupation—কাজ পেয়েছো। নিজেকে কখনো আর নিঃসঙ্গ মনে হবে না।

কাগজ-কলম নিয়ে বাণী সবে লিখতে শুরু করেছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে অরবিন্দ ঘরে ঢুকলো—গুড, লিখছিলে?

কাগজ-কলম সরিয়ে রেখে অরবিন্দকে লক্ষ্য করে বাণী বলে—বোসো।

চেয়ারে বসে অরবিন্দ বলে—বাধ্য হয়েই আজ তোমাকে ডিসটার্ব—বিরক্ত করতে এলাম।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অরবিন্দর দিকে তাকাতেই সে বলে—মানসী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

—সে কি? দিব্যি তো স্কুল করছিল। স্কুল ছাড়াও—এক হাতে সব কাজ তো করছিল ও, হঠাৎ কি হল?

অরবিন্দ চট করে কোন উত্তর দেয় না। একটুবাদে বলে—কাল বিকেলের দিকে আমাকে একটা জরুরী কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল—রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারিনি। সকালে বাড়িতে এসে দেখি, বেলা আটটার সময়ও মানসী বিছানায় শুয়ে আছে। চোখমুখ জবাফুলের মত লাল।

—তাই বল।—বাণী হেসে ফেলে: রাত্রে তুমি বাড়ি ফেরনি, সারারাত কেঁদে-কেঁদে শ্রীমতী তাই চোখ লাল করেছে—যা আহ্লাদী মেয়ে!

—না, টেম্পারেচার হয়েছে, দেখলাম।

—খুব বেশী?

—না, এই একশোর মতন।

—এতেই ঘাবড়ে গেছ? ডাক্তারকে কন্‌সাল্ট করে ওষুধ এনে দাও—ঠিক হয়ে যাবে।

—শুধু তো জ্বর নয়। অ্যাক্সিডেণ্ট করেছিল—কাল স্কুল থেকে ফেরার পথে বাস থেকে পড়ে গেছে।

—বাস থেকে পড়ে গেছে!—বাণী এবার চিন্তিত হয়ে পড়ে। বেশি চোট লাগেনি তো?

—না, বাইরে থেকে তেমন কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না। মুখে-হাতে গায়ের কয়েকটা জায়গায় শুধু কালশিরা পড়েছে—সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা।

—তাহলে খুবই চোট লেগেছে।—ডাক্তার দেখিয়েছো তো?

—হ্যাঁ, ডাক্তার দেখে গেছেন, ওষুধ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিলেই ভয়ে কেমন আঁতকে উঠছে। এত অল্প টেম্পারেচার, তাতে এমন হবে কেন?—অরবিন্দ গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবতে থাকে।

বাণী কি বলবে ভেবে পায় না। খানিক চুপ করে থেকে বলে—ঐ অ্যাকসিডেণ্টের শক্ হয়তো—

—তা তুমি কাল একবার এসে দেখে যাও না ওকে।

—ঠিক আছে, কাল তো ছুটিই আছে।

—আমি তাহলে চলি আজ।

—অনুপকে খবর দিয়েছো?

—না, অযথা বাড়িতে এখন ভিড় করা ঠিক নয়। তোমাকে দেখলে মানসী মনে জোর পাবে বলেই—অরবিন্দ চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর যাবার জন্যে উঠে পড়ে।

যাবার মুখে বলে—কাকাবাবুকে এখন কিছু জানানোর দরকার নেই। ওঁর শরীর তো সুস্থ নয়—কালক্ষেপ না করেই অরবিন্দ চলে গেল।

মানসীর অসুখের কথাটা ইচ্ছে করেই বাবার কাছে গোপন করে গেল বাণী। অ্যাকসিডেণ্টের কথা শুনলে ওঁকে ঠেকানো যেত না। অমনি ছুটে যেতেন ওদের ওখানে। মেয়েটা এখন চটপট সুস্থ হয়ে উঠলেই বাঁচা যায়।

কাল সকালে ব্রেকফাষ্ট করেই বাণী চলে যাবে ওদের ওখানে।

পরের দিন। সকালের দিকেই বাণী ঠিক এসে হাজির হয়েছে মানসীকে দেখতে। মানসীকে নিজের হাতে কমলালেবুর রস করে খাইয়ে গেল। অসম্ভব স্নেহপ্রবণ মন!

যাবার মুখে বারান্দায় অরবিন্দকে একলা পেয়ে মুখ টিপে হেসে বললে —মিষ্টি পাওনা রইল সুখবরটার জন্যে। মানসী সুস্থ হয়ে উঠলে একদিন এসে আদায় করে নেব।

মানসী মা হতে চলেছে, পাশের ঘরের বৌদি অরবিন্দর অনুপস্থিতিতে নিশ্চয় এক ফাঁকে বলে ফেলেছেন বাণীর কাছে—চেপে রাখতে পারেননি।

দুপুরবেলায় মানসীকে ঘুমোতে দেখে অরবিন্দ বই নিয়ে বসেছিল। বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে উৎকর্ণ হয়ে উঠল—কে আবার এল এমন সময়ে! যে-ই আসুক, মানসীর এখন ঘুম ভাঙ্গানো চলবে না। অরবিন্দ তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে।

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেল।—রমা! সেদিন সকালে রমার পক্ষ নিয়ে মানসীর সঙ্গে ঝগড়া করলেও আজ তাকে দেখেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল অরবিন্দর।—তুমি হঠাৎ? অরবিন্দ বারান্দাতেই বসে পড়ল মাদুরের উপর রমাকে নিয়ে।—মানসীর নাকি অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে? এর মধ্যেই খবরটা শান্তিনগরে পৌঁছে গেছে। ও হ্যাঁ, আজ সকালেই তো হারান মোড়লের ভাই এসেছিল ওর কাছে। তার কাছেই নিশ্চয় ওরা শুনে থাকবে ব্যাপারটা।

—এখন কেমন আছে?—রমা জিজ্ঞেস করে আবার।

—ভালো।—একটু থেমে অরবিন্দ বলেঃ মানসী ঘুমচ্ছে, ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

—তা হঠাৎ কিভাবে এমন অ্যাকসিডেণ্ট করলো?···দুদিন আগেও তো আমাদের ওখানে গিয়েছিল। তখন তো ভালোই ছিল।

অ্যাকসিডেণ্ট কি কখনো আগে নোটিশ দিয়ে হয়। বোকা-বোকা কথা শুনে রাগ ধরে যায় অরবিন্দর। বলে—তোমাদের ওখান থেকে

আসার পর থেকেই ওর মন-মেজাজ খারাপ হয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে বাস থেকে নামতে গিয়েই তাই হয়তো—

স্থির দৃষ্টিতে অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে রমা বলে—খুব ঘাবড়ে গেছ, না?

অরবিন্দ গম্ভীর হয়েই থাকে। খানিকবাদে বলে—গৌরীদিকে দেখাতেই মানসী শান্তিনগরে গিয়েছিল সেদিন— মানসীকে ঐ কথাগুলো বলে ঠিক করোনি তুমি!

বলার ইচ্ছে আমার ছিল না।···আমার ঘরে ফটোখানা দেখেই ও ক্ষেপে গেল। তোমার একখানা ফটো রাখাও যেন মহাঅপরাধ আমার পক্ষে।

—তা ফটোখানা তুমি কাটতে গেলে কেন?—অরবিন্দ রাগের ভাবেই বলে কথাগুলো।

কথাগুলো শুনেই রমার চোখে জল দেখা দিল। ছলছল চোখে অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ, আমার সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। মানসীর কাছে সেজন্যে আজ মাপ চেয়ে নেব। বলবো—সেদিন তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি মানসী—তোমার অরবিন্দ কোনদিনও আমাকে ভালো বাসেনি, বিয়ে করতে চাওয়া তো দূরের কথা!—কথাগুলো বলেই রমা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

অরবিন্দ কেমন বিপন্ন হয়ে পড়ে। বলে—কি ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছ?···এমনিতেই আমি কত দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি।

রমা অমনি সামলে নিলে নিজেকে। আঁচলে চোখের জল মুছে বললে—যাও, তুমি ওর কাছে গিয়ে বস; আমি ততক্ষণ—

অরবিন্দ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। ঘুম ভেঙ্গে রমাকে দেখলেই তো মানসীর উত্তেজনা বেড়ে যাবে আবার। না, মানসীর সঙ্গে আজ রমার দেখা না-হওয়াই ভালো।

একটু ভেবে নিয়ে অরবিন্দ বলে— মানসীর কতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গবে তার কি ঠিক আছে? বাড়ি ফিরতে তোমার তাহলে দেরি হয়ে যাবে।··· গৌরীদিও তো অসুস্থ মানুষ—

কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে দেরি হয়না রমার। বললে—হ্যাঁ, আমি

এখুনি চলে যাচ্ছি—বলেই উঠে পড়ল।—যাও, তুমি মানসীর কাছে গিয়ে বোসো।

মনটা খারাপ হয়ে গেল অরবিন্দর। রমা রাগ করে ওদের বাড়ি থেকে চলে যাবে, ভাবতে সত্যি কষ্ট হয়। ওকে কিছুটা সান্ত্বনা দেবার ছলে তাই বলে—আর একটু বসে যাও না, চা খেয়েই না হয় যেও—আমি চায়ের জল চড়িয়ে দেই।

—না, বাড়িতে গিয়েই খাওয়া যাবে। তুমি অনর্থক কেন কষ্ট করতে যাবে।—রমার কথায় অভিমানের সুর।

অরবিন্দ আর কোন কথা খুঁজে পায়না। কোন কথা না বলেই রমা বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ওর সঙ্গে রাস্তা অবধি এগিয়ে এসেছিল অরবিন্দ। কিন্তু রমা আর একটি বারের জন্যেও পিছন ফিরে তাকালো না।

রমার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল অরবিন্দর। না, বড় অন্যায় হয়ে গেল—ওর কথায় দুঃখ পেয়ে রমা চলে গেল। অবিনাশবাবুর বাড়িতে থাকতে মেয়েটা কত যত্নই না করেছে ওর।

অফিস থেকে বেরিয়ে নিজেদের ব্যবহারের কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল বাণীর। মানসীর অসুস্থতার জন্যে এতদিন একেবারেই সময় পায়নি। অফিস থেকেই সোজা ওদের ওখানে চলে গেছে।…হ্যাঁ বাণীকে দেখলে মানসীর সত্যি মনে অনেক জোর পায়। মানসিক শক্তটাই এখন বেশি ওর।

সন্ধ্যা লাগে-লাগে। বাণীর বাবা তখনও বেড়িয়ে ফেরেননি। কাপড়-জামা বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে বাণী সবে ঘরে ঢুকেছে, এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেল, বাবা এত শীগগির ফিরে এলেন!

দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল বাণী।

—বারীনবাবু বাড়িতে আছেন?—সৌম্যদর্শন অপরিচিত এক ভদ্রলোক সোজা এসে ঘরে ঢুকলেন। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না।

—না, কাছেই গেছেন। এখুনি হয়তো তিনি ফিরে আসবেন।··· আপনি বসুন।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের বসে পড়লেন ভদ্রলোক।

বাণীর চোখের সপ্রশ্ন দৃষ্টিটা লক্ষ্য করেই হয়তো বলে উঠলেন— বর্তমানে আমাদের দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দেবার লোক যখন উপস্থিত নেই, তখন নিজের পরিচয় নিজেদেরই দেওয়া উচিত, তাই নয় কী?

কথার ধরন দেখে বাণীর হাসি পায়। স্মিত হেসে ভদ্রলোক বলেন— সুলেখা দেবীর ভাসুর পো আমি, নাম দেবব্রত। গেল সপ্তাহে লণ্ডন থেকে এসেছি। আসার পর থেকেই কাকীমা রোজ একবার করে তাগাদা দিচ্ছেন, বারীনবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে বাণী হাত তুলে নমস্কার করে।

তিনিও প্রতি নমস্কার জানান।

মৃদু হেসে বাণী বলে—পরিচয় না দিলেও আমাকে আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন। আমি বারীনবাবুর মেয়ে, বাণী।

মাথা দুলিয়ে ভদ্রলোক সম্মতি জানালেন। তা আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। আপনার বাবা না ফেরা পর্যন্ত আপনাকেই তো কমপ্যানি—সঙ্গ দিতে হবে আমাকে।

বাণী চেয়ারে বসে বলে—মাসীমার কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি।

কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভদ্রলোকের চোখ দুটো। চোখ দুটো এমনিতেই আশ্চর্য উজ্জ্বল ভদ্রলোকের—চোখ না যেন দুটি জ্যোতিষ্ক। য়ুনিভারসিটির নামকরা ছাত্র। যাদবপুর য়ুনিভারসিটিতে অধ্যাপনা করছিলেন—ইতিহাসের। হঠাৎ একটা বৃত্তি যোগাড় করে বিদেশে পাড়ি দিলেন, ওখানে গেলেই নাকি ডক্টরেট উপাধি পেয়ে যাবেন। তা পেয়ে গেছেন বইকি। মাসীমা আগেই ওর গুণপনায় ব্যাখ্যা করে গেছেন।

দীর্ঘ তিনটা বছর ওদেশে কাটিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। পোষাক-

আসাক দেখে কিন্তু একটুও বোঝা যায়না। ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা এক বাঙালী যুবক। হ্যাঁ, এখনও ওকে যুবক বলা চলে। মাথায় চুলের মধ্যে যদিও এক-আধটা রূপালী রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বয়স ত্রিশ-পয়ত্রিশের বেশি নয়। গায়ের রঙ খুব ফর্সা না হলেও উজ্জ্বল, মসৃণ। লম্বা দোহারা চেহারা। চেহারায় আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের ছাপ।

—চা নিয়ে আসি ?—অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে বাণী বলে।

—আপত্তি নেই, যদিও এইমাত্র চা খেয়েই বেরিয়েছি।

বাণী আস্তে উঠে গিয়ে নিজেই চা তৈরী করতে বসে রান্নাঘরে। বিলেত-ফেরত মানুষ। বামুনদির হাতের কড়া চা হয়তো মুখেই রুচবে না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্রে-তে চা-বিস্কুট-ফল-সন্দেশ সাজিয়ে নিয়ে বাণী আবার এসে বাবার ঘরে ঢুকলো।

টিপয়ে খাবারগুলি নামিয়ে রেখে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কাপে ক-চামচ চিনি দেব ?

—চিনি ছাড়াই আমি চা খাই। তাই বলে আমাকে ডায়বেটিক্ পেসেণ্ট বলে ধরে নেবেন না।—ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন।

—আপনাকে দেখলে ওকথা কেউ বিশ্বাসই করবে না। - বাণী হেসে উত্তর দেয়।

—তবু যাহক চেহারা সম্পর্কে একটা সার্টিফিকেট পাওয়া গেল আপনার কাছে।

ফল-মিষ্টি লক্ষ্য করে বললেন—এসব আবার কেন ? শুধু চা হলেই তো ভালো হতো।

বাণী জোর করেই হাসলো একটু। বললে—প্রথম এলেন আমাদের বাড়িতে। শুধু চা দেওয়াটা—ভদ্রলোক সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন—তার মানে, পরে এলে আর খাবার জুটবে না, তাই তো ?

বাণী চুপ করেই ছিলো। ভদ্রলোক পুরনো কথার জের টেনে বললেন —দেখুন, আমি মানুষটা মোটেই ফরমাল নই, পোষাক পছন্দ করিনা। পোষাকটা বেশি হলে মানুষের মনের নাগাল পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে।

বাণী চট্ করে উত্তর দিতে পারে না। কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে —তা এ যুগটাই তো হলো পোষাকের যুগ। সভ্যতার মাপকাঠি এখন দর্জি আর ধোপার উপরই নির্ভর করে—কে যেন বলেছেন কথাটা।

ভদ্রলোকের চোখ কৌতুকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে আবার। খুব বাচ্চা মেয়ে পাকাপাকা কথা বলছে, ভাবটা কতটা এইরকম।

বাণী চায়ের কাপ ওর হাতে এগিয়ে দেয়। কোন কথা না বলে ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দেন নিজের মনে কি যেন ভাবতে থাকেন। খানিক-বাদে বলেন—আর একটা প্লেট নিয়ে আসুন—আপনিও শেয়ার করুন, এত খেতে পারবো না।

ভদ্রলোকের কথার ধরন এমন যে প্রতিবাদ করা যায় না। বাণী দ্বিরুক্তি না করেই আর একটা প্লেট নিয়ে আসে। ফল-মিষ্টি দুটো প্লেটে ভাগ করে নেয়।

খাওয়া হয়ে গেলেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান। বাণীর বাবার বুক-শেলফ-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে বইগুলি দেখতে থাকেন বিস্মিত দৃষ্টিতে। —এ যে দেখছি বইয়ের এক বিচিত্র সংগ্রহশালা—রেয়ার—দুর্লভ সব বই!

—বারীনবাবুর আসতে হয়তো দেরি হবে। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ বলে ওঠেন। একটু চুপ করে থেকে পকেট থেকে একখানি খাম বের করে বাণীর হাতে এগিয়ে দিলেন।—এই চিঠিটা রাখুন, আপনার বাবাকে দেবেন। কাকীমার চিঠি।

—এখুনি চলে যাবেন?

—হ্যাঁ, আজ যাই।—ভদ্রলোক মৃদু হাসলেনঃ আপনাকে আর আটকে রাখা ঠিক নয়। সামান্য ইতস্তত করে ভদ্রলোক চলে যান।

কিন্তু ঘরের মধ্যে তখনও তাঁর কণ্ঠস্বর যেন গমগম করছে। বাবার পড়ার টেবিলে চিঠিটা পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে বাণী তার শোবার ঘরে এসে ঢোকে। না, বাবা আজ সত্যি বড্ড দেরি করছেন। কোথাও গিয়ে নিশ্চয়ই আড্ডায় বসেছেন। আড্ডা না দিয়ে থাকতে পারেন না কিছুতেই।

বাণী খাটের উপর চিত হয়ে পড়লো। সারাদিন একটুও বিশ্রাম

পায়নি সে। খাওয়া-দাওয়ার পর না হয় লেখা নিয়ে বসা যাবে।... ভদ্রলোক দারুণ সপ্রতিভ—সহজ-সরল ব্যবহার। বাজে ফয়ম্যালিটির ধার ধারেন না। অত যে পাণ্ডিত্য চালচলন দেখলে কে বুঝবে! চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকলেও পাণ্ডিত্যের দম্ভ নেই চরিত্রে।

বাবার ডাক শুনেই বাণীর চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়।

একলাফে খাট থেকে নেমে ছুটে গেল বাবার ঘরে। বামুনদিই সদর দরজাটা খুলে দিয়েছিলেন।

ঘরে ঢুকতেই বাবা স্নেহের হাসি হেসে বললেন—লিখছিলে বুঝি ? .. তাই শুনতে পাওনি।

হ্যাঁ, কড়া নাড়ার আওয়াজ আজ সত্যিই শুনতে পায়নি বাণী।

—তুমি আজ অনেক দেরিতে ফিরেছ। সুলেখামাসীমার ভাসুরপো—

—হ্যাঁ, তোমার মাসীমার চিঠি নিয়ে এসেছিল।...কাল আমাদের দু'জনকে চায়ে নেমন্তন্ন করেছেন তোমার মাসীমা।

টেবিলের উপর পড়ে থাকা খোলা-চিঠিটা হঠাৎ চোখে পড়লো বাণীর। ঘরে ঢুকে এর মধ্যেই চিঠিখানা পড়ে ফেলেছেন বাবা।

—চায়ের নেমন্তন্ন। কিন্তু—

বাণীর কথা শেষ না হতেই বাবা বলেন—হ্যাঁ, একটা ছুতো পেলেই তো তোমার মাসীমা নেমন্তন্ন করে বসেন। ভাসুরপো ডক্টরেট উপাধি নিয়ে দেশে ফিরেছে। নেমন্তন্ন করবে না!

—কিন্তু কাল বিকেলে তো আমি যেতে পারছি না। ফিরতে দেরি হতে পারে।

—তা, তুমি না হয় দেরিতেই যেও—তাতে কিছু এসে যাবে না। না গেলে তোমার মাসীমা—বলেই বাণীর বাবা বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসবেন। রাত আটটা বেজে গেছে। আটটার সময় রোজ আজকাল রাত্রের খাওয়া সেরে নেন উনি। ডাক্তারের নির্দেশমত বাণী সেই ব্যবস্থাই করেছে।

খেতে-খেতে বাণীর বাবা বলেন—আজকাল দেখছি, ঘনঘন সবাই আমাদের নেমন্তন্ন করছে। এই তো সেদিন ভূপেশের নাতির অন্নপ্রাশনে খেয়ে এলাম।—একটু চুপ করে থেকে বলেন—কেউ নেমন্তন্ন করলে

আজকাল চিন্তা হয়, আগে কিন্তু খুশিই হতাম।...খেতে গিয়ে না খেয়ে থাকা যায় না। আবার একটু বেশি খেয়েছি কি বুকের ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেল।

বাবার ছেলেমানুষি কথাগুলি শুনে বাণীর হাসি পায়। হাসি চেপে বলে—তা বেশি না খেলেই হয়।

বাবা হেসে ফেলেন।—তা কি সম্ভব হয় সব সময়? রান্নাটা ভালো হলে সংযম রাখা—। তা তোমার মাসীমা এ ব্যাপারে খুবই কড়া। অযথা খাওয়ানোর জন্যে পীড়াপীড়ি তো করেনই না, বরং এক আধখানা পুরী-কাটলেট বেশি খেতে গেলেই বাধা দেন।

কথা বলতে বলতেই খাওয়ার পার্ট চুকিয়ে ফেললো। রাত্রের দিকে মেনু আজকাল খুবই সিম্‌পল—হালকা। রুটি, রুই মাছের কারি আর শোবার আগে এক গেলাস গরম দুধ। খাবারের পরিমাণও বেশি নয়। বরাবরই কম খাওয়ার অভ্যাস বাণীর। বাবাকেও এখন খাওয়া কমিয়ে ফেলতে হয়েছে বাধ্য হয়েই।

খাওয়া হয়ে গেলে বাণী বাবার সঙ্গে আবার এসে ওঁর ঘরে বসে। খাবার পর কিছুক্ষণ গল্প না করে নিজের ঘরে ঢোকে না। বাণী চলে গেলেই তো বাবা সঙ্গে সঙ্গে বই নিয়ে বসে যাবেন। অথচ খাওয়ার পর কিছুক্ষণ মাথার পরিশ্রম করা ঠিক নয় ওঁর পক্ষে।

কিন্তু সিগারেট খাওয়াই কি ঠিক ওঁর পক্ষে? ইজি চেয়ারে হেলান দিয়েই একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারেন না—ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও।

সিগারেট ধরিয়ে বলেন—ভালোই হল। ছেলেটি নাকি এখন থেকে তোমার সুলেখা মাসীমার ওখানেই থাকবে। নিজের মাকে তো দেবব্রত অল্পবয়সেই হারিয়েছে—লণ্ডন থেকে ফিরে বাপকেও আর দেখতে পেল না!—একটু থেমে বাবা যেন নিজের মনে বলে যান কথাগুলো: ওরা দু'জনেই এখন একলা—ছেলে থেকেও তোমার মাসীমা এখন একলা।... ভালোই হল।

বাণী চুপ করেই থাকে। এসব কথার কি উত্তর দেবে সে।

—তারপর তুমি এখন কি লিখছো, বললে না তো ?—বাবা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন।

—একটা থিওরেটিক্যাল প্রবন্ধ—ধনবাদী যুগে ধর্মের ভূমিকা।—একটু থেমে বাণী বলেঃ মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লিখছি। কথাগুলো অবশ্য নতুন কিছু নয়। লেনিনের কথাগুলিরই পুনরুক্তি বলা চলে।

একটু ভেবে নিয়ে বাবা উত্তর দেন—তা এ ব্যাপারে নতুন কথা বলার স্কোপ—সুযোগ কোথায়! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ এক কথাই তো বলতে হবে সবাইকে।

বাণী অন্য কথা তোলে।—তুমি নতুন একটা বই লিখবে বলেছিলে—

প্রশ্নভরা চোখে বাণীর দিকে তাকিয়ে বাবা বলেন—রবীন্দ্র সাহিত্যে দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি—এই বইটার কথা জিজ্ঞেস করছো ?···ঐ বইটা নিয়েই তো ভাবছি এখন। ভাবনাটা আগে মাথার মধ্যে দানা বাঁধুক—তারপর তো লেখা।···গোটা রবীন্দ্র-সাহিত্য আবার নতুন করে পড়তে হবে।

—তোমার লিখতে কষ্ট হলে আমাকে ডিক্‌টেশন দিতে পার।

—ডিক্‌টেশন নিয়ে কেন সময় নষ্ট করবে মা ? বরং নিজে—Original যদি কিছু লিখতে পার। ঐটুকুই তো থাকে।—বাবা কেমন উদাস-উদাস গলায় বলে যান।···যতটুকু ভালো কাজ করে যাওয়া যায়, মানুষের অমরত্ব তো ঐখানেই।

স্বপ্নাবিষ্টের মত কিছুক্ষণ চুপ করে সিগারেট টেনে যান তিনি। তারপর হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে বাণীকে লক্ষ্য করে বলেন—তুমি যাও মা, বিশ্রাম কর গিয়ে।

হ্যাঁ, সারাদিন একটুও বিশ্রাম পায়নি সে। কিন্তু বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প না করতে পারলে ওর মন খারাপ হয়ে যায় আজকাল। বাবার ঐ স্ট্রোকটার পর থেকেই মনটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে বাণীর।

বাণী আস্তে উঠে নিজের ঘরে চলে আসে। এসেই কয়েকখানা জার্নাল নিয়ে পড়তে বসে—বিদেশী জার্নাল। facts—তথ্য তো ওদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। এবং facts—তথ্য-এর ভিত্তি করেই তো তার নিজের বক্তব্য রাখতে হবে।

জার্নালগুলির পাতা উলটিয়েই চললো বাণী—লেখাগুলি কিছুই যেন

ওর মাথায় ঢুকছে না আজ। আসলে পড়ায় আজ আর মন বসছে না ওর।

মাসীমা ও দেবব্রতের জন্যে বাবা বেশ চিন্তা করছেন। ওরা দু'জনেই এখন একলা···না, আজ আর লেখায় মন বসবে না।

নিজের উপর বিরক্ত হয়েই বাণী বইপত্তর রেখে উঠে পড়ে।

সুস্থ হয়ে উঠলেও মানসী তার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পায়নি এখনও। একটু পরিশ্রম করলেই হাঁপিয়ে পড়ে। অথচ পরিশ্রম না করে উপায়ই বা কি! স্কুলের চাকরিটা তো ছেড়ে দেওয়া চলে না। স্কুলের কর্তৃপক্ষ কতদিন আর ছুটি দেবেন! পরে তো দিতেই হবে। একটানা তিন মাসের ছুটি।

কষ্ট হলেও মানসী তাই আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছে। ছুটির পর বাড়িতে ফেরার সময় এখনও কেমন যেন ভয়-ভয় করে। হঠাৎ যদি আবার সেই লোকটা— ।

হ্যাঁ, খুব সতর্ক হয়েই মানসী আজকাল পথ চলে। বাস-স্টপে এসে ভিড় ঠেলেই বাসে উঠে পড়ে। একবার বাসে উঠে পড়লেই নিশ্চিন্তি।

বাড়ি পৌঁছে স্কুলের জামা-কাপড় পালটেই খাটের উপর চিৎ হয়ে পড়ে—খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে তবে স্নান করতে যায়। স্কুল থেকে এসেই স্নান করতে অরবিন্দও অবশ্য নিষেধ করেছে। দুর্বল শরীর হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। অরবিন্দ আজকাল ওর শরীর সম্বন্ধে খুবই যত্ন নেয়। মানসী মা হতে চলেছে তাই হয়তো ভাবনায় পড়ে গেছে। গত সপ্তাহেও নিজে সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে লেডি ডাক্তারকে দেখিয়ে এনেছে।

বিকেলেও মানসী স্কুল থেকে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হয় সে। নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে দেয়।

স্নান সেরে মানসী সবে রান্নাঘরে ঢুকেছে, অরবিন্দ ততক্ষণে টিপটে চা ভিজিয়ে ফেলেছে। আর তখুনি অনুপ এসে ঢুকলো রান্নাঘরে।

চেয়ারে বসেই অরবিন্দকে লক্ষ্য করে স্মিত হেসে বললে—খুব কাজের লোক হয়ে পড়েছ দেখছি।

অরবিন্দ অমনি টিপ্পনি কাটে।—কুলি-মজুরের তো এটাই একমাত্র মূলধন।···Labour-time অর্থাৎ শ্রমের সময় অনুযায়ীই তো পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়।

অনুপ অমনি হেসে ফেলে। বলে—অত শক্ত শক্ত কথা আমার মাথায় ঢুকবে না।

অরবিন্দকে সরিয়ে দিয়ে মানসী নিজে চা করতে বসে।

অনুপের পাশেই চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে অরবিন্দ। অনুপের দিকে তাকিয়ে বলে—অনেকদিন বাদে তোমার দেখা পেলাম। বাড়িতে গিয়েও তোমাকে সেদিন ধরতে পারিনি।

—হ্যাঁ, অন্নসংস্থানের ধান্দাতেই তো—

—তা যা বলেছ, অন্নসংস্থান! গোটা সমাজ ব্যবস্থাই তো নির্ভর করছে এই ব্যাপারটার উপর—মার্কসবাদের মূল কথা।

—কথাটা এক পেশে।—অনুপ অমনি প্রতিবাদ করেঃ কিন্তু "Man cannot live by bread alone."

অরবিন্দ ঠাট্টার হাসি হাসে। বলে—নিছক খাওয়ার জন্যেই মানুষের জীবন—মার্কস কোথাও একথা বলেননি—অমন সর্বাত্মক বৈজ্ঞানিক দর্শন আর সৃষ্টি হয়নি—তাকে বিকৃত কোরো না।

—মার্কসবাদের ভূত এখনও তোমার ঘাড় থেকে নামেনি দেখছি।—সঙ্গে সঙ্গে অনুপ উত্তর দেয়।

—মার্কসবাদের ভূত! অরবিন্দর মুখে ঠাট্টার হাসি।—তবে এ ভূতের কোন ওঝা নেই।

অনুপ আবার কি যেন বলতে যাবে মানসী তাকে বাধা দিয়ে বলে—তর্ক রেখে এখন খেয়ে নাও তো। চা যে জল হয়ে গেল। টেবিলে চা-খাবার নামিয়ে রাখে মানসী। খাবার মানে চা-টোস্ট-মাখন। বিকেলে মানসী আজকাল আর পরোটা-ফরোটার হাঙ্গামা করে না। পেরেও ওঠে না।

চায়ের পাট সারা হলেই অনুপ একটা ছুতো করে উঠে পড়ে।—যাই, আমার একটু তাড়া আছে।—

অনুপ চলে যেতেই মানসীর মুখের দিকে চেয়ে অরবিন্দ বলে—আজ তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে—বাসে উঠে বসতে জায়গা পেয়েছিলে? ক্রিকেট ম্যাচ ছিল বলে বাসে-ট্রামে আজ সত্যি প্রচণ্ড ভিড় ছিল।

—জায়গা না পেলেও করে নিয়েছিলাম।—মানসী উত্তর দেয়।

উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে অরবিন্দ ওর সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করে: এই তো চাই, সংসারে নিজেকেই নিজের জায়গা করে নিতে হবে। স্বেচ্ছায় কেউ কি কখনো তার দখল ছেড়ে দেয়?

কিন্তু জবরদস্তি—অন্যায়-জুলুমও তো চলেছে! সেদিনকার ঘটনাটা হঠাৎ মনে পড়ে যায় মানসীর।

—মুখ কালো করে কি ভাবছো এত?—অরবিন্দ জিজ্ঞেস করে।

মানসীর মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে যায় কথাগুলো—জান, রাস্তায় স্কুল থেকে ফেরার সময় একটা লোক একদিন আমার পিছু নিয়েছিল।

সিগারেট ধরিয়ে অরবিন্দ মুচকি হাসে। বলে তা তো নিতেই পারে। এমন সুন্দর মুখ দেখলে পিছু নেবার ইচ্ছে হওয়াটা কিছু আশ্চর্যের নয়।

—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।—মানসী গম্ভীর মুখে উত্তর দেয়: যদি আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেইজ্জত করতো!

অরবিন্দ ঐ কথাটাকে কোন গুরুত্বই দিলে না। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলে—কার সাধ্য তোমাকে বেইজ্জত করার?—একটু চুপ করে থেকে বলে—গঙ্গা কখনো অপবিত্র হয়?...মনে যার ময়লা নেই, বাইরের ময়লা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

কথাগুলো শুনে মনটা অনেক হালকা হয়ে যায় মানসীর। তবু বলে—তুমি তাহলে আমাকে আবার গ্রহণ করতে কি!

ভুরু কুঁচকে অরবিন্দ মানসীর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে—আমাকে কি তুমি ছুঁচিবাইগ্রস্ত বিধবা মনে করেছো?

মানসী লজ্জা পেয়ে যায়। সত্যিই তো ওকে ঐ কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু মানসী কি সাধে বলেছে? সেদিনকার ঘটনাটা ওকে না বলা পর্যন্ত মনে শান্তি ছিল না। তবু তো সুবোধের নামটা সে উচ্চারণ করেনি। করেনি ভয়েই—অরবিন্দকে তখন আর ঠাণ্ডা রাখা যেত না। কিন্তু ঐ পশুটার সঙ্গে লড়াই করা কি সহজ কথা।

ছাই-দানিতে সিগারেটের শেষ টুকরোটা গুঁজে দিয়ে অরবিন্দ উঠে পড়ে। —তুমি চটপট রান্নাটা সেরে ফেলো।···আমি ততক্ষণে গিয়ে প্রুফগুলো দেখে ফেলি—বলেই অরবিন্দ বেরিয়ে যায় রান্নাঘর থেকে।

মানসীর নিজের মনে হাসে। আশ্চর্য কাজ-পাগলা মানুষ। মনটা ওর শিশুর মতই সরল···মানসীর কথাগুলো শুনেও এতটুকু সন্দেহ করলো না।

অরবিন্দর কথাগুলি শুনে আজ মনের গ্লানি সমস্ত কেটে গেছে মানসীর। রাত্রে শুতে এসে অনেকদিন পরে সে নিজে থেকেই আবার জড়িয়ে ধরলো অরবিন্দকে।

বিকেলে আজ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে গেছল অরবিন্দ। স্কুল ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাই মানসীও তাড়াতাড়ি ফিরে এল বাড়িতে।

এসে কিন্তু দেখা পেল না অরবিন্দর। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দিব্যি বেরিয়ে গেছে। না, কথার কোন ঠিক নেই তার।

ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তালা খুলে বাড়িতে ঢুকলো মানসী। শোবার ঘরে এসে হাতব্যাগটা টেবিলের উপর রাখতে গিয়েই ঐ দরখাস্তগুলোর উপর নজর পড়লো।

দরখাস্তগুলো উলটে-পালটে দেখতে থাকে মানসী। বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্ম এবং কারখানায় চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছে অরবিন্দ। ও এখন তাহলে চাকরির চেষ্টা করছে? কিছু আশ্চর্য নয়।···মানসীর শরীরের কথা চিন্তা করেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তা ছাড়া সংসারে নতুন অতিথি আসছে, তারও তো একটা খরচা আছে। নিজের বরাদ্দ মাসোহারা আর মানসীর স্কুলের মাইনেতে তখন সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। মানসীর শরীরের যা হাল হয়েছে তাতে বিনে মাইনেয় স্কুল থেকে মানসীকে কিছুদিন ছুটি নিতেও তো হতে পারে।···হ্যাঁ, অরবিন্দকে চাকরি করতে হবে বৈকি।

মানসী জামা-কাপড় বদলে স্নান সেরে ফিরে এল শোবার ঘরে। তারপর আধঘণ্টা কেটে গেল, তবু অরবিন্দর দেখা নেই।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। একা একা চা খেতে কোনদিনই ভালো লাগে না মানসীর।

টেবিলের পাশে বসে সকালের কাগজখানাই উলটে-পালটে দেখতে থাকে সে। সকালে দেখা অরবিন্দর দরখাস্তগুলোর উপর আবার দৃষ্টি পড়ে যায়। দেরাজটা টেনে কাগজগুলি রাখতে গিয়েই হঠাৎ মায়ের চিঠিখানা বেরিয়ে পড়লো—মানসীকেই লিখেছেন। কখন এল চিঠিখানা? চট করে খামের মুখটা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়ে ফেললো মানসী। ওমা, এ যে অনেকদিন আগেকার চিঠি। তবু যাক, কোন খারাপ সংবাদ নেই। চিঠিতে মায়ের নাম ঠিকানা দেখে ভয় ধরে গিয়েছিল ওর—বাবার জন্যে ভাবনা হচ্ছিল—ব্লাডপ্রেসারের রোগী, কিছু বিশ্বাস নেই।

নিজের অজান্তেই মানসীর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বাবার সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না। তবু যাহোক ওঁরা যে ভালো আছেন। দাদার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মানসীকে নেমন্তন্ন করেছিলেন মা। কিন্তু অরবিন্দর নামও উল্লেখ করেননি।

মানসী আবার খাটের উপর গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেল। যাক, এতক্ষণে আসার সময় হল ওর!

দরজা খুলে অবাক!···অরবিন্দ নয়, বাণী। বাণী একলা নয়, সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোক।

—আসুন। ভদ্রলোকেব দিকে চেয়েই বলে উঠল মানসী।

শোবার ঘরে ঢুকেই বাণী পরিচয় দিলে ভদ্রলোকের—সুলেখা-মাসীমার ভাসুর পো, নাম দেবব্রত।

নমস্কার করে চেয়ারটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে মানসী খাটের উপর গিয়ে বসলো বাণীকে নিয়ে।

এদিক-ওদিকে তাকিয়ে বাণী জিজ্ঞেস করলে—অরবিন্দ বুঝি বাড়িতে নেই?

—না। মানসী থতমত খেয়ে উত্তর দেয়ঃ তবে এখুনি হয়ত এসে যাবে।

—তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন উনি। মৃদু হেসে বলে।

ভদ্রলোক এতক্ষণে মুখ খুললেন।—বারীনবাবুর মুখে আপনাদের কথ শুনে অবধি আলাপ করার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। সময়ের অভাবে আসতে পারিনি এতদিন।

—হ্যাঁ অরবিন্দর সঙ্গে আলাপ করে খুশিই হবেন।···আমার বাবার মতই দুর্দ্দান্ত আশাবাদী লোক।

—আশাই তো জীবন।···লাইফ্ ইট্‌সেলফ ইজ এ নেগেশন অব পেসিমিজম্—জীবনই নৈরাশ্যবাদের এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ।—ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করেন।

মানসী নিজের মনে হাসে। এ যে দেখছি, বারীনকাকার মতই একজন দার্শনিক।

ভদ্রলোকের কথার সূত্র ধরে বাণী বলে—এক নামকরা বিদেশী সাহিত্যিকের লেখায় পড়েছি—পরাজিত এক বিপ্লবী নাকি প্রতি রাত্রে তার মাথার কাছে একটা অস্ত্র রাখতো—ভবিষ্যতে লড়াই করে জয়ী হবার আশায়।—একটু চুপ করে থেকে বলে—আশা ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে।

—আপনি আপনার বাবারই মেয়ে।—প্রশংসা ভরা চোখে বাণীর দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলেন।

—বাবার মত আর হতে পারলাম কোথায়!—বাণীর গলায় আক্ষেপের সুর।

মানসীর হঠাৎ খেয়াল হল—ওদের চা দেওয়া হয়নি। খাট থেকে নামতে যাবে, বাণী অমনি ওর হাত চেপে ধরে। বলে—কোথায় যাচ্ছ?

—চা নিয়ে আসি।

—না, আমরা চা খেয়েই বেরিয়েছি। তুমি চুপ করে বসো তো বাধ্য হয়েই বসতে হয়।

ভদ্রলোক আবার বারীনকাকার কথা তোলেন—বারীনবাবুর সঙ্গে আলাপ করে সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি। আপশোষ হচ্ছে এতদিন কেন দেখা হয়নি ওঁর সঙ্গে!···যাদবপুর তো এমন কিছু দূরের পথ নয়।

—এখন তো আমাদের আরো কাছে এসে গেলেন—মাসীমার ওখানেই যখন—। বাণী কথা শেষ না করেই থেমে যায়।

ভদ্রলোক হঠাৎ ছটফট করে ওঠেন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন—না আজ আর অরবিন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ করা হল না! আর একদিন এসে গল্প করা যাবে। ভদ্রলোক উঠে পড়েন, সঙ্গে বাণীও।

ওদের সঙ্গে মানসী সদর দরজা অবধি এগিয়ে এসেছিল। যাবার মুখে হাত তুলে মামুলি বিদায় জানিয়ে দু'জনে রাস্তায় গিয়ে নামেন। মানসীর দিকে আর ফিরেও তাকায় না। মশগুল হয়ে গল্প করতে করতে এগিয়ে যায়। মানসী যে তখনও সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, এটা খেয়ালই নেই ওদের।

বাণীর অনুরোধে পড়েই দেবব্রতবাবু অরবিন্দদের বাড়িতে যেতে রাজী হয়েছিলেন। দেবব্রতবাবুদের ওখান থেকেই বাণী ফিরে আসবে ভেবেছিল। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় মানসীদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হল। এত কাছে এসেও ওদের সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবে!

সুলেখা মাসীমার চায়ের নেমন্তন্নে সেদিন উপস্থিত হতে পারেনি সে।

পারেনি অনুপের জন্যেই। বিকেলবেলায় ওর জ্বরটা এমন চেপে এল যে ওকে ঐভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে মন সরলো না।

মিতা তো এসব ব্যাপারে একেবারে ছেলেমানুষ—অসুখ দেখলেই nervous—ঘাবড়ে যায়। সব ব্যবস্থা তাই বাণীকেই করতে হল শেষ পর্যন্ত। রাত নয়টার আগে বাড়ি ফিরতে পারলো না। তখন তো আর চায়ের নেমন্তন্নে যাওয়া চলে না।

ক'দিন থেকেই তাই মাসীমাদের ওখানে যাবার কথা ভাবছিল বাণী।

মাসীমা হয়তো অভিমান করে আছেন ওর উপর। আজই একবার ঘুরে আসা যাক ওঁদের বাড়ি থেকে।

শনিবার বিকেলে চা খেয়েই বাণীর বাবা বেরিয়ে গেছেন বাড়ি থেকে। আজ ফিরতে ওঁর নিশ্চয় একটু দেরি হবে।

জামা-কাপড় বদলে বাণী বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

কিন্তু মাসীমাদের বাড়িতে ঢুকে হতাশ হয়ে গেল। মাসীমা নাকি উত্তরপাড়ায় তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন—আজ ফিরবেন না।

খবরটা জানালেন দেবব্রতবাবু। বাইরের ঘরে সোফায় বসে কি একটা জার্নাল পড়ছিলেন। বাণীর পায়ের আওয়াজ পেয়েই জার্নাল থেকে মুখ তুললেন—ও, আপনি আসুন, আসুন।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করলেন বাণীকে। বাণী যেন এক মহামান্য অতিথি!

—যাই, মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।—বাণী সোজা বাড়ির অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক পিছু ডাকলেন—কোথায় যাচ্ছেন?···আপনার মাসীমা বাড়িতে নেই।

—মাসীমার সঙ্গে তাহলে আজ আর দেখা হবে না?—

—তাই তো মনে হয়।···বসুন।—পাশের একটা গদি-আঁটা সোফা দেখিয়ে দিয়ে দেবব্রতবাবু বলেনঃ মাসীমা না থাকলেও বাড়িতে অন্য লোক তো আছে!

বাণী সোফায় বসে পড়লো। দেবব্রতবাবুও আবার তাঁর পরিত্যক্ত সোফাখানিতে গিয়ে বসলেন।

অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে বাণী বলে—সেদিনকার অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পারিনি—

বাণীর কথা শেষ হতে না হতেই ভদ্রলোক বলে···হ্যাঁ, আপনাকে আমরা সবাই সেদিন মিস্ করেছিলাম বৈকি!···কাকীমা অনেকক্ষণ আপনার খাবার আগলে বসে ছিলেন।

—আর লজ্জা দেবেন না।···সেদিনকার মিষ্টিটা আজ মাসীমার কাছ থেকে আদায় করবো বলেই তো এসেছিলাম।

—মাসীমার কাছ থেকে না পেলেও তার ভাসুর পো—ছেলের কাছ থেকেও তো আদায় করা যায়।

হাসির ছলে কথাগুলো বলে দেবব্রতবাবু আবার উঠে দাঁড়ালেন। মৃদু হেসে বললেন—আপনি বসুন, আমি চায়ের কথা বলে আসি—বলেই দ্রুত পায়ে অন্দরমহলের দিকে চলে যান।

একটুবাদেই ফিরে এলেন। সোফায় বসে বললেন—ভাববেন না। চায়ের সঙ্গে মিষ্টির ব্যবস্থাও করে এসেছি।

আচ্ছা ছেলেমানুষ তো ভদ্রলোক। বাণীর হাসি পায়। সোফায় পড়ে থাকা জার্নালখানার দিকে তাকিয়ে বলে—কি পড়ছিলেন?

—রেডিও-ফিজিকস্-এর উপর একটা প্রবন্ধ—ডাঃ অরুণ সেনের লেখা। সূর্যগ্রহণের সময়ে সৌরজগতে কি কি পরিবর্তন দেখা দেয়—লেখাটা সেই সম্বন্ধে।

—আপনি এসব জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়েও চর্চা করেন?

—বিজ্ঞানের যুগে জন্মে বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে এক-আধটু চর্চা করবো না?···এখন সত্যি আপশোষ হয়, এতদিন এদিকে খেয়াল হয়নি কেন। বিজ্ঞানের জগতে যে এমন রোম্যানটিক থ্রিল আছে, আগে বুঝতে পারিনি।

—তাই বুঝি নতুন করে এখন আবার বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেছেন?

—শুরু করেছি, কিন্তু কতটুকুই বা জানার সুযোগ পাবো?—ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন সিরিয়াস হয়ে পড়েন: মানুষের একটা মাত্র জীবন। তা-ও আবার অল্প মেয়াদের। দুঃখ তো এইখানেই।

দেবব্রত'র গাম্ভীর্য বাণীকেও এসে স্পর্শ করে যেন। গম্ভীর মুখে বলে—জ্ঞানের সত্যি তো শেষ নেই। পারফেক্‌শন বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন না।

বাণীর কথাটা দেবব্রতবাবু যেন লুফে নেন।—খাঁটি কথা। পারফেক্‌শন ইজ এ মিস্‌নোমার।···শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই। বিশ্ব-সংসারে সব কিছুই রিলেটিভ্‌লি এ্যাবসোল্যুট—আপেক্ষিকভাবে সত্য। —একটু থেমে নিজের সঙ্গেই যেন তিনি কথা বলে যান—মানুষের চিন্তাজগতে সর্বক্ষণ নলেজ অ্যাণ্ড ইগনোরেন্স—জ্ঞান ও অজ্ঞতার দ্বন্দ্ব চলেছে—এই দ্বন্দ্বের ফলেই মানুষ এগিয়ে চলেছে জ্ঞানের পক্ষে—অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে।

কথাগুলো নতুন না হলেও শুনতে ভালই লাগছিল। এমন আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে উনি কথা বলেন যে পুরানো কথাও যেন নতুন হয়ে ওঠে ওর মুখে।

কথা বলতে বলতে তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন দেবব্রতবাবু। চা-খাবারের ট্রে হাতে বামুনঠাকরুণ হঠাৎ ঘরে ঢুকলে সম্বিৎ ফিরে এল।

ওদের সামনে টিপয়ে ট্রেটা নামিয়ে রেখেই মহিলা বেরিয়ে গেলেন।

—আসুন, এবার এগুলির সদগতি করা যাক। বাণীর দিকে একটা হাসি মাখা দৃষ্টি মেলে দেবব্রতবাবু বললেন।

বাণী কাপে চা ঢালছিল। দেবব্রতবাবু অমনি বলে উঠলেন—আমি চিনি খাই না, মনে আছে তো?

মাথা নেড়ে বাণী সায় দিয়ে চায়ের কাপ দেবব্রতবাবুর দিকে এগিয়ে দেয়। দেবব্রতবাবু অমনি সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করলেন। সিগারেট ধরিয়ে বাণীর দিকে চেয়ে বললেন—মাপ করবেন। Without your permission—আপনার বিনা অনুমতিতেই—

বাণী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—সিগারেট সম্পর্কে আমার কোন inihibition—সংস্কার নেই।···আমার বাবাকে তো অনেকে chain-smoker বলেই মনে করেন।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে দেবব্রতবাবু চায়ের কাপ হাতে তুলে নেন। মিষ্টির প্লেটটা লক্ষ্য করে বলেন—ঐগুলি শুধু আপনার জন্যেই—ওতে ভাগ বসানো ঠিক হবে না।

—বেঠিক কাজের মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে। তাই না? বাণী হেসে উত্তর দেয়।

কৌতুক-উজ্জ্বল দৃষ্টিটা বাণীর মুখের দিকে তুলে দেবব্রতবাবু বলেন—তা যা বলেছেন, বেঠিক কাজের সব ত্রুটি সত্ত্বেও প্রত্যহের একঘেঁয়েমি নেই, বরং বৈচিত্রের স্বাদ আছে। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে দেবব্রত-বাবু কাপটা নামিয়ে রাখলেন টিপয়ে।

বাণীরও ততক্ষণে চা খাওয়া শেষ হয়েছে। প্লেট থেকে নিজে একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে বাণী প্লেটখানি এগিয়ে ধরলো দেবব্রতবাবুর সামনে।

এক সঙ্গে ছুটো সন্দেশ তুলে নিয়ে তিনি বললেন—এগুলিতে আর ভাগ বসাবো না।

—সবগুলো একা আমাকে খেতে হবে?

প্রথমে আপত্তি জানালেও শেষপর্যন্ত বাণী একাই বাকী চারটে মিষ্টি উদরস্থ করে।

খাওয়া হয়ে গেলে বাণী বলে—এবার উঠতে হয়।

—এখুনি যাবেন?

বাণী খানিক ইতস্ততঃ করে। হ্যাঁ, এখুনি বাড়ি গিয়ে করবে কি! বাড়ি ফেরার আজ তেমন তাড়া নেই। বাবার ফিরতে আজ নিশ্চয় দেরি হবে। অরবিন্দের ওখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলে মন্দ কি?

একটু ভেবে বাণী শেষপর্যন্ত ঐ প্রস্তাবটা করে।—চলুন না আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেই, কাছেই থাকে তারা। ছেলেটি কমরেড, সক্রিয় রাজনীতি করে—আমাদের মত সমাজতন্ত্রের নিষ্ক্রিয় সমর্থক নয়।

দেবব্রতবাবুর দোমনাভাব—যাবেন, কি যাবেন না। সামান্য ইতস্ততঃ করে বলেন—কিন্তু আমার যে আজ একটু তাড়া আছে—ন'টার মধ্যে ফিরতে হবে।

—আপনি তো দারুণ পাঙচুয়াল!

—তা বলতে পারেন।—ঈষৎ হেসে দেবব্রতবাবু উত্তর দেন: দেখুন, 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায় ঐ কথাটা মোটেই ঠিক বলেনি—"সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙচুয়াল হওয়া শোভা পায়।"···ব্যাপারটা ঠিক উলটো, সময় অল্প বলেই আমাদের পাঙচুয়াল না হয়ে উপায় নেই।

বাণী কৌতুক বোধ করে।

আগের কথার জের টেনে দেবব্রতবাবু বলেন—আমার মনে হয় অমিত রায়, যাকে বলে একটু stunt-প্রিয় সব সময়েই একটা না একটা চটকদার কথা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে;—একটু থেমে বলে—তা যেতে হলে চলুন; আপনার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে আসা যাক, বেশিক্ষণ না বসলেই তো হল।

দু'জনে উঠে পড়ে বেরুনোর জন্যে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বাণী বলে: সাতটা বাজতে চললো—এতক্ষণে নিশ্চয় সে বাড়ি ফিরে এসেছে। ···অল্প দিন আগেই বিয়ে করেছে।

—বিয়ে করলে বুঝি ঘড়ি ধরে বাড়ি ফিরতে হয়?—রাস্তায় নেমে রসিকতার ছলে দেবব্রতবাবু বলেন—আমার অদৃষ্টে তাহলে বিয়ে লেখা নেই।

এই ঘটনার দু'দিন বাদে গড়িয়াহাটের মোড়ে হঠাৎ দেবব্রতবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল বাণীর।

সন্ধ্যার পূর্বক্ষণ। আকাশে গোধূলির আলো তখনও মিলিয়ে যায়নি।

—কোথায় চললেন?—বাণীকে দেখে বলে উঠলেন দেবব্রতবাবু।

—এই তো এদিকে এসেছিলাম, এক বন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে।

—তা এখন কোনদিকে যাবেন? সামান্য ইতস্তত করে দেবব্রতবাবু প্রস্তাব করলেন—চলুন না লেকের ধারে খানিকটা বেরিয়ে যাওয়া যাক।

—চলুন। বাণী রাজী হয়ে যায়। লেকের ধারে বেড়াতে ওর ভালোই লাগে, আর পাশে যদি দেবব্রতবাবুর মত একজন সঙ্গী থাকে।

দেখতে দেখতে লেকে পৌঁছে গেল। লেকের পাশেই নির্জন একখানি বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেলেন দেবব্রতবাবু। প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে বেঞ্চিটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—বসুন।

বাণীর বসার জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই আগে বসে পড়লেন। বাণীকে ওঁর পাশেই বসতে হল অগত্যা। ইচ্ছে ছিল, বেঞ্চিটায় না বসে জলের কিনারায় গিয়ে বসে। তা আর হলো না।

অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় বাণীর। হ্যাঁ, এই বেঞ্চিটাতেই ওরা এসে বসেছিল—ও আর অনুপ। ঐ গাছটার তলায় বাণীকে দাঁড় করিয়ে ফটো তুলেছিল সে। ওকে নিয়ে কত ছেলে-মানুষিই না করতো অনুপ!

—এত তন্ময় হয়ে কি ভাবছেন?—নীরবতা ভেঙ্গে দেবব্রতবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করেন।

একটু ইতস্ততঃ করে বাণী বলে—কয়েক বছর আগে আমার এক

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে ঠিক এই বেঞ্চিটাতেই এসে বসেছিলাম।—নিজের অসতর্ক মুহূর্তে কথাটার সঙ্গে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বাণীর বুক থেকে।

দেবব্রতবাবু সেটা লক্ষ্য করলেন কিনা বোঝা গেল না। দিনান্তের শেষ আলোটুকু সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে তখন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেবব্রতবাবু বলেন—সেই বন্ধুটি এখন বুঝি আর কলকাতায় থাকেন না?

—হ্যাঁ, এখন কলকাতাতেই ফিরে এসেছেন আবার বউ নিয়ে। —বাণী হেসেই উত্তর দেয়।

—বন্ধুটির সম্পর্কে একসময়ে আপনার একটা scft corner ছিল, মনে হচ্ছে।—দেবব্রতবাবু ঠাট্টার ছলে জিজ্ঞেস করেন।

—ঠিক ধরেছেন। শুধু soft corner নয়। ওর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবার কথা ছিল। কিছু না ভেবেই বাণী বোকার মত কথাগুলো বলে ফেললো দেবব্রতর কাছে। একটু থেমে বললে—আমাদের দুজনার সঙ্গে এখনও বন্ধুতার সম্পর্ক বজায় আছে।

—দারুণ ফ্রি তো আপনি—ছেলেদের সম্পর্কে।

—হ্যাঁ, দোষ-গুণ যাই বলুন না কেন, আমার বেশির ভাগ বন্ধুই ছেলে। কলেজে কো-এডুকেশন ছিল, অফিসে চাকরি করছি এখন, সব জায়গাতেই ওরা দলে ভারী। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে উপায়।

—ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। এবং স্বাস্থ্যকরও বটে। হালকা হেসে দেবব্রতবাবু মন্তব্য করেন।

একটু ভেবে নিয়ে বাণী বলে—কিন্তু ব্যাপারটা আপনাদের ক্ষেত্রেও তো প্রযোজ্য।

নিশ্চয়। ছেলে-মেয়ে সবার সঙ্গেই আমি এতাবৎকাল সমানভাবে বন্ধুতা করে এসেছি। মিশুকে বলে বরাবরই আমার খ্যাতি ছিল।

বাণীর হাসি পায় কথাগুলি শুনে। হাসি চেপে বলে—শুধু বন্ধুতাই করেছেন? ভালবাসায় পড়েন নি কখনো?

—না। জীবনে এ পর্যন্ত কোন রোম্যান্টিক এক্সপিরিয়েন্স্ হয়নি। ...তবে ভাব হয়েছিল অনেক মেয়ের সঙ্গেই। অন্য কেউ হলে হয়তো

ওইটুকু ঘনিষ্ঠতা হবার আগেই বিয়ের প্রস্তাব করে বসতো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ওদের কাউকে বিয়ে করার কথা আমার একবারও মনে হয়নি। কিংবা—রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় অমিত রায় যেমন বলেছিল,—কোন মেয়ের হাতে উচ্ছ্বাসের মাথায় আংটি-ফাংটি পরিয়ে কোন মেলোড্রামাও সৃষ্টি করিনি।

—প্লেটোনিক লভ্ ?—বাণী টিপ্পনী কাটে।

যা মনে করেন।—দেবব্রতবাবু মৃদু হাসেন। একটু চুপ করে থেকে আগের কথার জের টেনে বলেন—তা সত্ত্বেও একটি মেয়ে আমার জন্যে প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিল। আমাকে না পেলে নাকি সে সারা জীবন—। শেষ পর্যন্ত ফাঁড়াটা কেটে গেল। ওর বাবা চটপট মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন অন্যত্র।

হালকা মেজাজে কথাগুলি বলে দেবব্রতবাবু হঠাৎ কেমন চুপ মেরে গেলেন, কি যেন ভাবছিলেন নিজের মনে।

একটা গাছে হঠাৎ কোকিল ডেকে উঠল। বাণী বললে—বসন্তকাল পেরিয়ে গেছে—এখনো কোকিলের ডাক !

মৃদু হেসে দেবব্রতবাবু অমনি উত্তর দিলেন—বিলম্বিত বসন্ত বলেও তো একটা কথা আছে।

বাণী ইচ্ছে করেই কথাটা চাপা দিলে। বললে—বসে থেকে পা ধরে গেছে। চলুন না, খানিকটা পায়চারি করা যাক।

—যথা আজ্ঞা।—বলেই দেবব্রতবাবু উঠে পড়লেন।

হ্যাঁ, প্রায় আধঘণ্টা ওরা সারা চৌহদ্দিটা ঘুরে বেড়াল। তারপর এক সময় বাণীই তাড়া দিলে—এবার ফেরা যাক।

কথা বলতে বলতে ওরা দু'জনে বাস-স্টপে এসে পৌঁছুল।

বাসে ভিড় থাকলেও একটুবাদেই পাশাপাশি দু'টি সীট খালি পেয়ে গেল ওরা। বাসের ঝাঁকুনিতে দেবব্রতবাবুর বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্শ কতবার যে অনুভব করলো বাণী। আর তখুনি সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত এক শিহরণে বারবার শিহরিত হতে লাগলো বাণীর সর্বাঙ্গ।

বাসটা খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেল রাসবিহারী এ্যাভেন্যুর মোড়ে। এখান থেকে অন্য বাস করে দেবব্রতবাবুকে বালিগঞ্জের দিকে যেতে হবে।

বাণীদের বাড়ি তো সেই ভবানীপুরে—আরো অনেকখানি পথ একলা যেতে হবে ওকে!

আশ্চর্য ব্যাপার, দেবব্রতবাবু কিন্তু ওকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দেবার কথা একবারও উচ্চারণ করলেন না।

বাস থেকে নামবার আগে শুধু আস্তে তাঁর হাতখানা রাখলেন বাণীর হাতের উপর। হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন—চলি।

বলেই নেমে গেলেন তিনি।

বাণী মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইল। হাতের ঐ স্পর্শটুকু আজ বাণীর সমস্ত অন্তরাত্মা অধিকার করে বসেছে যেন।

বাণীর জন্যেই এ যাত্রায় বেঁচে উঠেছে অনুপ। জ্বরের খবর পেয়েই ছুটে এসেছিল সে, জ্বরটা তখন বেশ চেপে এসেছে। কিন্তু অসুখ দেখলে বাণী কখনই ঘাবড়ায় না। বরং মনের বল যেন ওর আরো বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসা, ওষুধপত্র আনা—সব ব্যবস্থা করে ফেললো চটপট। বাইরের কোন কাজই মিতার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

জ্বর ছেড়ে গেলেও দুর্বলতার জন্যে আরো কয়েক দিনের ছুটি নিতে হয়েছিল অনুপকে। অসুখ ভালো হয়ে গেলেও বাণী রোজই একবার এসে খবর নিয়ে যেত ওর। খবর নিয়েই অবশ্য চলে গেছে—পাঁচ মিনিটও বসে গল্প করেনি। ইচ্ছে হলেও অনুপ ওকে আটকে রাখার চেষ্টা করেনি। বাড়িতে ওর অন্য কাজও তো থাকতে পারে।

কিন্তু অনুপ স্কুলে যাওয়া শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই বাণী এ বাড়িতে আসা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। সময়ের অভাব? তাই হবে হয়তো। স্কুল করে বাড়ি ফিরে অনুপ এখনও কেমন দুর্বল বোধ করে। তাই বেরুতে ইচ্ছে করে না আর। চা—জলখাবার খেয়েই চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতেই ভালো লাগে।

তবে শুয়ে শুয়ে সে বাণীর জন্যে প্রতীক্ষা করে বইকি! মিতা অবশ্য এর মধ্যে একদিন বাণীদের বাড়িতে যাবার কথা তুলেছিল। বলেছিল—

আমাদেরও তো উচিত ওঁদের একটা খবর নেওয়া—ওঁদেরও তো অসুখ-বিসুখ করতে পারে।

তা পারে বইকি! শরীর থাকলে অসুখ করবে, এ আর এমন আশ্চর্য কি! যাই-যাই করেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

মিতাকে না জানিয়েই আজ সন্ধ্যার দিকে অনুপ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বাণীদের বাড়িতে।...

সদর দরজায় কড়া নাড়তেই বামুনদি এসে দরজা খুলে দিলেন।

—ওরা কেউ বাড়িতে নেই নাকি?—অনুপ জিজ্ঞেস করলো তাঁকে।

—হ্যাঁ। দিদিমণি বাড়িতেই আছেন।—বলেই মহিলা তাঁর কাজে চলে গেলেন।

অনুপ সোজা এগিয়ে গেল বাণীর শোবার ঘরের দিকে। ঘরের কাছাকাছি যেতেই বাণীর গলা শোনা গেল—কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা গেল না।

অনুপ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছিল। এমন সময়ে অন্য একটি কণ্ঠস্বর কানে এল—অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠ।—তা যা বলেছেন, গঙ্গার সঙ্গে লেকের কোন তুলনা হয় না।...নদীর পারে বেড়াতে আমারও খুব ভালো লাগে।...চলুন না, একদিন ডায়মণ্ডহারবার থেকে বেড়িয়ে আসা যাক।

অনুপ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। পা দুটো কেমন কাঁপতে লাগলো। শরীরটা এখনও সবল হয়নি ওর।—আসতে পারি?—অনুপ অনুচ্চ কণ্ঠে কথা দুটি উচ্চারণ করার সঙ্গে বাণী চেঁচিয়ে বলে উঠল—এসো, এসো।

অনুপ ঘরে ঢোকার আগেই খাট থেকে নেমে পড়েছিল বাণী। অনুপকে দেখে কেমন যেন বিহ্বল-বিচলিত হয়ে পড়ল সে। সে-ভাবটা সামলে নিয়ে অনুপকে পরিচয় করিয়ে দিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে।—আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনুপ। তার চেয়েও বড় কথা, উনি একজন কবি মানুষ।—এ বরন আর্টিস্ট—জাত কবি।

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে অনুপের করমর্দন করলেন।

—এখন আপনার পরিচয়টা দিতে দিন।—বাণী সহজ হাসি হেসে বললে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে : মিঃ দেবব্রত চৌধুরী, সুলেখামাসীমার ভাসুরপো। কিছুদিন আগে লণ্ডন থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছেন—যাদবপুর য়ুনিভারসিটিতে অধ্যাপনা করছেন।

অনুপ জোর করেই হাসলো একটু। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললে —আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলাম।

—So am I—আমিও খুশি হয়েছি চেয়ারে বসে ভদ্রলোকও হেসে উত্তর দিলেন।

নিজে খাটের উপর বসে অনুপকে কাছে ডাকলো বাণী।—এসো তুমি এখানে এসে বোসো।

বাধ্য হয়ে বাণীর পাশে গিয়ে বসতে হল অনুপকে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনুপের দিকে তাকিয়ে বাণী যেন জরীপ করছিল অনুপের মুখের ভাব। নীরবতা ভেঙ্গে একটু বাদে বলে উঠল—এখন কেমন আছ ?…আর জ্বর-টর হয়নি তো ?

—না।—সংক্ষেপে ওর কথার উত্তর দিয়ে অনুপ চুপ করে রইল। বলার ছিলও না কিছু। তাছাড়া, ভদ্রলোক সম্পূর্ণ অপরিচিত ওর। অপরিচিত লোকের সামনে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায় না।

ওরা দু'জনেও চুপ করেছিল। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা।

নীরবতা ভেঙ্গে বাণী হঠাৎ বলে উঠল—আপনাদের জন্যে কি আনবো বলুন—চা, না কফি ?

—কফি।—ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন নিঃসঙ্কোচে।

অনুপের কিন্তু সঙ্কোচ কাটে না। বলে—না, আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না। এইমাত্র চা খেয়ে আসছি।

—তা হলে হরলিকস্ ?…হরলিকস্ খেতে তো আপত্তি নেই।

অনুপের সম্পর্কে বাণী আজ যেন একটু বেশি ফরম্যাল্ হয়ে পড়েছে।

বাণী আর কোন কথা না বলে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বাণী বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক অনুপের দিকে চেয়ে বলে উঠেন।—আপনি তো শুনলাম কবিমানুষ—a born artist—আর একদিন এসে আপনার কবিতা শুনতে হবে।

—শোনাবার মত কিছু এখন পর্যন্ত লিখে উঠতে পারিনি।—অনু হেসেই উত্তর দেয়ঃ বাণীর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। সব কি বাড়িয়ে বলা ওর স্বভাব।

—আমার নিন্দে হচ্ছিল বুঝি?—ঘরে ঢুকে কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গি অনুপের দিকে তাকায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্রেতে কফি ও হরলিকস নিয়ে বামুনদি এসে ঘ ঢোকেন। টিপয়ে ট্রে-টা নামিয়ে রেখেই চলে যান তিনি।

ইচ্ছে না থাকলেও হরলিকসের কাপ হাতে তুলে নিতে হয় অনুপকে

কাপটা নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে সে। ভদ্রলোকের দি চেয়ে বলে—আমি তাহলে চলি এখন। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে

ওর হয়ে উত্তরটা দিলে বাণী।—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফেরাই ভাল রাত করা ঠিক হবে না। শরীরটা এখনও ঠিক সারেনি তোমার।

কোন কথা না বলেই অনুপ আস্তে বেরিয়ে আসে—পিছন ফি তাকায় না আর।

রাস্তায় নেমে যন্ত্রচালিতের মতই পথ চলে সে। নিজের অজান্তে কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক থেকে। না। শরীর সত্যি এখনও সারেনি ওর।

বাণীদের ওখানে আজ না গেলেই ভালো করতো সে।...ঠিক আছে বাণী ডেকে না পাঠালে অনুপ আর যাবে না ওদের বাড়িতে।

সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু বাণী ডেকে পাঠালো না অনুপকে।

দিন দশেক বাদে একদিন সন্ধ্যেবেলা বাণী নিজেই এসে হাজির হল চোখে-মুখে অস্বাভাবিক একটা চঞ্চলতা।

অনুপ চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিল। জানলা দিয়ে আকাশের দি তাকিয়ে কি ভাবছিল মনে নেই। মিতা তখন রান্নাঘরে রান্নাবান্না নি ব্যস্ত!

ঘরে ঢুকেই বাণী কৈফিয়ত তলব করলো—কি ব্যাপার বল তো কোন খোঁজ-খবর নেই।...আমি তো ভাবছিলাম, আবার বুঝি কলকা থেকে উধাও হলে।

ওকে দেখেই অনুপ বিছানার উপর উঠে বসেছিল। গম্ভীর ভাবেই ত্তর দিলে—তবু যাক, এতদিন পরে আমাদের কথা ভাব্‌বার সময় হল।

অনুপের কথা যেন শুনতেই পেল না বাণী। চেয়ারে বসে অনুপকে ক্ষ্য করে বললে—সন্ধ্যেবেলায় ঘরে শুয়ে না থেকে বাইরে একটু ঘুরে লেও তো পার। পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে মন-মেজাজও ালো থাকে।

—একলা থাকতেই আমার ভালো লাগে।—অনুপ বলে: আমার ভাবটাই হয়তো একলা থাকার। বেশিক্ষণ বাইরের মানুষের সঙ্গ রদাস্ত করতে কষ্ট হয়—ক্লান্ত হয়ে পড়ি।…মানুষের সংসর্গ রবীন্দ্রনাথকেও নেছি অনেক সময়ে উদভ্রান্ত করে ফেলতো।

বাণী ঠাট্টার হাসি হাসে। বলে—রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ।—লেই হঠাৎ কেমন সিরিয়াস—গম্ভীর হয়ে পড়ে। বলে—রবীন্দ্রনাথের ়জের মনের মধ্যে বিপুল ঐশ্বর্য—শক্তি—শিক্ষা। তিনি নিজেই ছিলেন ়জের সঙ্গী। নিজেকে তাই কখনো তাঁর একলা মনে হত না।—

বাণীর কথা শেষ হতে না হতেই মিতা এসে ঘরে ঢুকলো। বাণীর ম্পর্কে তার মনেও একটা অভিমান জমা হয়েছিল। বললে—কতদিন াদে এলে।

·হ্যাঁ, আজকাল একদম সময় পাই না।—বাণী উত্তর দেয়। দৃষ্টিটা নুপের দিকে ফিরিয়ে বলে—অফিস থেকে ফিরেই লেখা নিয়ে বসি।… ড়ো বয়সে লেখার বাতিক দেখা দিয়েছে।—বলেই হেসে ওঠে।

অনুপ কোন উত্তর দেয় না। বাণীই আবার কথা বলে—তুমি কিছু লখছো না?

—না।—সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে অনুপ চুপ করে থাকে।

মিতা ব্যস্ত-সমস্তভাবে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। উনুনে কিছু চাপিয়ে েসেছে হয়তো।

—লেখাটা ছেড়ে দিও না।—আগের কথার সূত্র ধরে অনুপকে লক্ষ্য রে বাণী বলে: অভ্যাসটা ছেড়ে দিলে পরে আবার নতুন করে শুরু রা মুশকিল।…বাবা বলেন, অভ্যাসটাই সব থেকে বড় মানুষের ীবনে।

অনুপের হাসি পায় কথাগুলি শুনে। বলে—খুব বক্তৃতা দিতে শিখেছ দেখছি।···আমার মত নগণ্য এক আধজন লোক যদি কবিতা লেখা ছেড়ে দেয়, তাতে সমাজ-সংসারের কিছু ক্ষতি হবে না।

—সমাজ-সংসারের ক্ষতি না হলেও তোমার নিজের তো ক্ষতি হবে। নিজস্ব কিছু হাতে রাখতে হয়। না হলে মানুষ-শেষে বড় একলা হয়ে পড়ে।

বাণী গম্ভীর মুখে বসে থাকে চুপচাপ। অনুপও কোন কথা খুঁজে পায় না। ঘরের মধ্যে একটা পাথর-ভারী স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায় আচমকা। মিতা হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে। সঙ্গে অরবিন্দ।

—বাবা, আজ আমাদের কি ভাগ্যি।—হাসি-হাসি মুখে মিতা বলে—একসঙ্গে সবার আজ আমাদের কথা মনে পড়েছে।

অরবিন্দকে দেখেই বাণী তার পুরানো মেজাজ ফিরে পায়।—বোসো, বোসো। ভাগ্যিস এসেছিলাম, তাই তোমাদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।

খাটের উপর অনুপের পাশেই বসে পড়ল অরবিন্দ।

—হ্যাঁ, অনেকদিন তোমাদের ওখানে যেতে পারিনি। বাণীকে লক্ষ্য করে বলে।– একটু থেমে বলে—দেবব্রতবাবুকে নিয়ে আমাদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলে শুনলাম।···আমার সেদিন একটু দেরি হয়েছিল বাড়ি ফিরতে।

অনুপ অবাক হয়ে যায় অরবিন্দর কথা শুনে। দেবব্রতবাবুকে নিয়ে বাণী অরবিন্দর ওখানেও গিয়েছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে এর মধ্যেই এতখানি ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে! এই জন্যেই আজকাল সময়ের অভাব হয়ে পড়েছে ওর। অনুপ অনেক চেষ্টা করে দীর্ঘশ্বাস চাপলো।

—তোমাদের জন্যে চা নিয়ে আসি?—বলেই মিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল—না, আমার জন্যে আর চা করতে হবে না, আমি এখনি চলে যাবো। আজ আর বসতে পারবো না।

বাণীও অমনি বলে ওঠে।—হ্যাঁ, আমারও চায়ের দরকার নেই। এখুনি ফিরতে হবে।

—বলেই বাণী উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে।—কই যাবে তো চল।—অরবিন্দকে তাড়া দেয়।

দু'জনে বেরিয়ে যায় ব্যস্তসমস্তভাবে—না গেলে এখুনি যেন ট্রেন ফেল করবে!

অনুপ ওদের সঙ্গে সদর দরজা অবধি এগিয়ে এসেছিল, সেটা খেয়ালই হল না ওদের।

রাস্তায় নেমে পিছন ফিরে বাণী শুধু বললে—চলি।—হঠাৎ যেন মনে পড়েছে কথাটা।

এসেই যদি চলে যাবে আসার দরকার ছিল কি?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাবার ঘরে বসে বাবার সঙ্গে কথা বলছিল বাণী। এমন সময়ে দেবব্রতবাবু হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। হাতে একগাদা বইপত্তর। এসেছেন অবশ্য বাণীর বাবার কাছে।

হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে এর মধ্যেই ওঁর বেশ ভাব হয়ে গেছে। একসঙ্গে দুখানা বই লিখতে শুরু করেছেন বাণীর বাবা। লেখার ব্যাপার নিয়েই ওঁর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা।···সন্ধ্যার দিকে দেবব্রতবাবু প্রায়ই তো এসে বাবার সঙ্গে আড্ডা দেন।

ইচ্ছে করেই বাণী আজকাল পাশ কাটিয়ে চলে ওঁকে। সামনে গেলেই কেমন একটা সঙ্কোচ অনুভব করে—কিছুতেই যেন সহজ হতে পারে না। ওঁকে দেখেই তাই চলে আসছিল।

দেবব্রতবাবু অমনি পিছু ডাকলেন—ওকি আপনি চললেন কোথায়? এই বইগুলি রাখুন, অনেক খুঁজে পেতে নিয়ে এলাম—আপনার বাবার কাজে লাগবে।

—ওকে আবার 'আপনি' বলছো কেন?—বাণীর বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন: বয়সে তোমার চেয়ে কত ছোট ও—বছর দশেকের তো হবেই।

—মহিলাদের সম্মানই আলাদা—বয়সের হিসাব রাখে না।—দেবব্রতবাবু মৃদু হেসে উত্তর দেন।

দেবব্রতবাবুর হাত থেকে বইগুলি নিয়ে বাণী তক্তপোষে নামিয়ে রাখলো।

বাণীর বাবা ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারেন না। দেখি। কি বই আনলে।

চলে আসার একটা ছুঁতো খুঁজছিল বাণী।—যাই, চা নিয়ে আসি।—বলেই বেরিয়ে যাবে। দেবব্রতবাবু অমনি বলে উঠলেন—না, চায়ের দরকার নেই আমার। এখুনি যেতে হবে।—বাণীর বাবার দিকে চেয়ে বললেন—আজ আর গল্প করা হল না, পরে আসবো খন।—

বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

দেবব্রতবাবু চলে গেলে বাণী আবার তার বাবার কাছে বসে পড়ল। ভদ্রলোক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা হঠাৎ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। এসেই চলে গেলেন কেন, না এলেই পারতেন। মনের মধ্যে আচমকা যেন আলোড়ন জাগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।···কণ্ঠস্বরটা সত্যি আশ্চর্য অভিব্যক্তিময় দেবব্রতবাবুর—চলে গেলেও কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে যেন।

নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল বাণী, বাবার কথায় চিন্তায় বাধা পড়ল।—কি লিখছো এখন ?—বাবা জিজ্ঞেস করেন।

—ক্রাইসিস্ ইন্ দি বুর্জোয়া পলিটিক্যাল সিস্টেম্—বুর্জোয়া রাজনীতিক কাঠামোর সঙ্কট।—বাণী আমতা-আমতা করে বলেঃ প্রবন্ধটা সবে লিখতে শুরু করেছি।—তা এব্যাপারে তুমি দেবব্রতর সাহায্য পেতে পার। হিসট্রির ছাত্র হলেও ইকনমিকস্ পলিটিক্যাল সায়ান্স সম্বন্ধেও ওর যথেষ্ট পড়াশুনা আছে।···আমার নতুন বইটার জন্যে লাইব্রেরি ঘেঁটে অনেক ভালো ভালো লেখা যোগাড় করে এনেছে।···সুলেখার পক্ষে এখন তো আর অত ছুটোছুটি করা সম্ভব নয়।—বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাণীর বাবা।

বেশি কথা বলতেও এখন যেন ওঁর কষ্ট হয়। শরীরটা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছে। অথচ পড়ার উৎসাহ দিন দিনই বেড়ে উঠছে। বলেন—জীবনটা অতি অল্প মেয়াদের—কাজগুলো তাই তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলাই ভালো, ফেলে রাখা ঠিক নয়, রাবণরাজা ঠিকই বলেছিলেন—ভালো কাজ ফেলে রাখতে নেই।

অসাধারণ উৎসাহী, আশাবাদী লোক বাণীর বাবা, অথচ আজকাল মধ্যে মধ্যে এই ধরণের দু'একটা কথা বলে ফেলেন।

তবে এসব কথার মধ্যে কোন আক্ষেপের সুর নেই। সাংসারিক ব্যাপারেও সম্পূর্ণ অনাসক্ত। দেবব্রতবাবুর মেণ্টাল মেক্-আপ—মনের গড়ন কতকটা বাণীর বাবার মতন।

বাবা একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে টান দিয়ে পুরানো কথার জের টেনে বললেন—দেবব্রত তোমাকে লেখার ব্যাপারে অনেক ফ্যাক্টস—তথ্য যোগাড় করে দিতে পারবে।

—না, আমার লেখার ব্যাপারে ওঁকে অনর্থক কষ্ট দেবার কোন মানে হয় না।—আমি নিজে গিয়েই তো লাইব্রেরি থেকে বই যোগাড় করে আনতে পারি।

—তা পার বৈকি!—কৌতুকের হাসি হেসে বাণীর বাবা বলেন: তবে গুণী লোকের সাহায্য পেলে লেখার ব্যাপারে অনেক সুবিধা হয়, এই আর কি!

—তা হয়। বলেই বাণী ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলে—বিকেলে ছানাটা খেয়ে নিয়েছিলে তো?

ডাক্তার চিনি খেতে নিষেধ করেছেন বাবাকে। তাই বাণী এখন আর সন্দেশ করে না ওঁর জন্যে।

মাথা নেড়ে বাবা বলেন—ছানা? না, ঐ ছাই-ভস্মগুলো আর মুখে রোচে না। তার চেয়ে চা-টোস্টের সঙ্গে নরম করে একটা আমলেট দিতে বোলো।

—কিন্তু ডাক্তার যে তোমাকে ডিম খেতে—

—রেখে দাও ওদের কথা।···ওদের কথা শুনে চলতে গেলে বেঁচে থাকার অর্থই হয় না।···চায়ের সঙ্গে এক-আধটা অম্লেট্ও যদি খেতে না পাই—

—আচ্ছা দিচ্ছি। বাণী রান্নাঘরে গিয়ে যৎসামান্য ঘি দিয়ে একটা অম্লেট্ তৈরী করে আনলো বাবার জন্যে। নিজে মুখ ফুটে খেতে চাইলেন, না দিয়ে থাকা যায়?

পরের দিন বিকেলে। বাণীর বাবা বেড়াতে বেরিয়েছেন খানিক আগেই।

বাণী নিজের ঘরে এসে চুল বাঁধতে বসলো। চুল বাঁধার ধরনটা এখন অনেক বদলে ফেলেছে সে। সবাই ঠাট্টা করে ঐ টেনেটুনে খোঁপা বাঁধার ধরণ দেখে। রোগা-পাতলা গড়নের মেয়েদের নাকি একটু ঢিলে-ঢালা করে চুল বাঁধা উচিত—খোঁপাও হবে ঘাড়ের কাছে। দেখতে নাকি তাতে অনেক ভালো লাগে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজের মনেই হেসে উঠল বাণী। যা না চেহারা একখানা! প্রসাধন করেও এর কিছু হবার নয়। প্রসাধনের কথা এতকাল মনেও পড়েনি বাণীর। স্নো-পাউডার ঘষে কালো রঙ কি ফর্সা করা যায়? তবে হ্যাঁ, গরমের সময়ে গায়ে ট্যালকাম্ পাউডার সে ব্যবহার করে বৈকি। তা-ও ঐ রাত্রে। ঘুমবার আগে। হাত-মুখ ধুয়ে গায়ে পাউডার মেখে শুতে গেলে বেশ আরাম বোধ হয়।

বেশ পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে বিনুনীটা বেঁধে ফেললো বাণী। বেশ নীচু করেই খোঁপা বাঁধলো সে। সত্যিই তো দেখতে এতে অনেক ভালো লাগে।…না শাড়ীটাও বদলে ফেলা দরকার। কড়া-মাড় দেওয়া বম্বে প্রিন্টের একটা সাদা শাড়ী ড্রয়ার থেকে বের করে পরে নিলে বাণী। সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। হ্যাঁ, এখন এই পোষাকে ওকে কেউ দেখলে মনে করবে, কোথাও বুঝি বেড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু বেড়াতে যাবার কোন কল্পনাই নেই ওর মনে। বেড়াতে না গেলেও বিকেলের দিকে সবাই তো এই রকম টিপ্‌টপ্-ফিটফাট হয়েই থাকে। বাণীই কেবল থাকতো না। প্রসাধনের পিছনে সময় দেওয়াটা ও সময়ের অপব্যবহার বলেই মনে করে এসেছে এতদিন।

নিজের মনে আবার হাসে বাণী। আর পাঁচ পাঁচটা মেয়ের মত সে-ও কি প্রসাধন-বিলাসী হয়ে গেলো!

হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। না, বাবা এত শীগগির ফিরে আসতে পারেন না। তবে?…দেবব্রতবাবু? তিনি তো কাল এসেছিলেন, আজ কি আর আসবেন? তাহলে?…

বাণী তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দেয়। খুলেই অবাক! ওমা, দেবব্রতবাবু!

অভ্যর্থনার জন্যে অপেক্ষা না করেই ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন।—রথীনবাবু বাড়িতে নেই নাকি?

—না, বেড়াতে বেরিয়েছেন।—সামান্য ইতস্ততঃ করে বাণী বলে বাবার জন্যে অপেক্ষা করবেন না? ··তিনি এখুনি এসে যাবেন। ··বসুন।

—তা আপনিও বসুন তাহলে।—দেবব্রতবাবু চেয়ারে বসে বলেন।

উত্তর না দিয়ে বাণী খাটের উপর গিয়ে বসে।

দেবব্রতই আবার কথা বলেন—আপনার বাবা অবশ্য আপনাকে 'আপনি' সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন। তা অনুমতি না নিয়ে তো কোনো মহিলাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করা চলে না—তা বয়সে সে আমার চেয়ে যত ছোটই হোক না কেন!

বাণী হাসি সামলাতে পারে না। হেসে বলে—হ্যাঁ, আমাকে আপনি এখন থেকে তুমিই বলবেন।

—বাঁচলাম। তোমাকে 'আপনি' বলতে আমারও যেন কষ্ট হচ্ছিল। আর তোমারও নিশ্চয় লজ্জা লাগছিল শুনতে, তাই নয় কি?

বাণী মুখ নীচু করে হাসে একটু। তারপর জিজ্ঞেস করে আপনার জন্য কি আনাবো বলুন? গরম না ঠাণ্ডা কিছু?

—ওসব পরে হবেখন, [illegible] একটু [illegible]। বসো তো।—স্থির দৃষ্টিটা বাণীর মুখে। উপর রেখে বলে—এখন নতুন কি লিখছো বল।

বাণী উত্তর দিতে যাবে, এমন সময়ে বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন।—আরে তুমি, কখন এলে?

—এই তো একটু আগে। আপনার কন্যা তো আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বিদায় করে দেবার চেষ্টায় ছিলেন। ইচ্ছে না থাকলেও ভদ্রতার খাতিরে শেষপর্যন্ত অবশ্য বসতে বলেছেন।

বাণী গাম্ভীর্য বজায় রেখেই উত্তর দেয়—তাহলে বসলেন কেন? যে কোন একটা ছুতো করেই তো চলে যেতে পারতেন।

বাণীর বাবা অমনি হেসে উঠলেন হো হো করে। সঙ্গে দেবব্রতবাবুও।

—না, আপনার কন্যার সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠা শক্ত। দেবব্রতবাবু মন্তব্য করেন।

—এত তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন কি বাবা ?—বাণীর বাবা রসিকতার ছলে বলেন: আপস-আলোচনার মাধ্যমেই আজকাল মানুষ বড় বড় সমস্যার ফয়শালা করতে চেষ্টা করছে—নিতান্ত দায়ে না পড়লে যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে ঢুকতে চায় না।

—কিন্তু ওয়ার টেন্‌শন্—যুদ্ধের আবহাওয়া তো আগের মতই বজায় আছে।—দেবব্রতবাবু উত্তর দেন।

—সে তো থাকবেই। ধনবাদী সভ্যতা তা নইলে বাঁচবে কি করে ? অনুন্নত দেশগুলিতে নিজেদের hegemony—কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হলে ওয়ার টেন্‌শন্ বজায় রাখতেই হবে।

আলোচনাটা একেবারে ভিন্ন খাতে চলে গেল। কথা বলতে বলতে দু'জনেই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন, বাণী কখন উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ওরা লক্ষ্য করলেন না।

বামুনদির হাতে দেবব্রতবাবুর চা পাঠিয়ে দিয়ে বাণী নিজের ঘরে এসে খাতাপত্তর নিয়ে বসলো। কিন্তু চেষ্টা করেও লেখায় মন বসাতে পারলো না। পাশের ঘরে তখন শক্ত শক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা চলেছে। দু'জনার কেউ আস্তে কথা বলতে পারেন না। মার্কসীয় দর্শন, কোয়ানটাম্ থিওরী, আইনস্টাইনের ল অব্ রিলেটিভিটি কিছুই বাদ গেল না আলোচনা থেকে।

যাক, এতদিনে বাবার আর একটি মনের মত সঙ্গী জুটলো—যাঁর সঙ্গে বসে দু'দণ্ড মন খুলে কথা বলতে পারেন।

অনেকদিন ভূপেশের কোন খবর পায়নি বারীন। ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে যাতায়াত করা এখন খুবই কষ্টকর ওর পক্ষে।

কিন্তু ভূপেশের সঙ্গে বেশিদিন দেখা না হলেই মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে বারীনের।

আজ বিকেলে সে তাই মনে জোর করেই ভূপেশের ওখানে রওনা হল। বাণী তখনও অফিস থেকে ফিরে আসেনি।

কিন্তু কষ্ট করে ভূপেশের বাড়িতে গিয়ে ঐ খবরটা শুনে আরো বেশি কষ্ট পেতে হল বারীনকে।

সমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে যূথী নাকি ছেলেদের নিয়ে তার মামার বাড়ি চলে গেছে। ভূপেশ তখন বাড়ি ছিল না। ললিতার নিষেধ সে গ্রাহ্যই করেনি।

কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরেই ভূপেশ তাই ছুটে গেছে যূথীর মামার ওখানে—নাতিদের ছেড়ে বেচারী একদিনও থাকতে পারে না এখন। রাত্রে বড় নাতি কাছে না শুলে নাকি ওর ঘুমই হয় না। যূথীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করেছিল ভূপেশ। যূথী রাজী হয়নি কিছুতেই।

ড্রয়িং-রুমে ভূপেশের পাশে সোফায় চুপ করে বসেছিল বারীন। এমন সময়ে ললিতা এসে ঘরে ঢুকলো। বারীনকে দেখে যেন একটু চমকে উঠল সে।—একি চেহারা হয়েছে ?···অসুখ করেছিল বুঝি ?

বারীন কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো। বললে—শরীর থাকলে অসুখও থাকবে, জীবন মানেই জীবন-মৃত্যুর লড়াই। তবে মানুষ অমৃতের পুত্র—মৃত্যুর নয়। শেষের কথা গুলো যেন শুনতেই পেল না ললিতা। বললে এসব কথা রেখে শরীরটা চটপট ভালো করে ফেলুন।

ভূপেশ তখনও গুম্ হয়ে বসে কি যেন ভেবে চলেছে—ওদের কথাবার্ত্তা যেন কানেই ঢুকছে না।

পরিবেশটাকে হালকা করার উদ্দেশ্যেই বারীন বললে—কথায় বলে উপদেশে পেট ভরে না। কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন আগে। বিকেলে চা-জলখাবার না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি।

ললিতা আর দাঁড়ায় না ম্লান হেসে বেরিয়ে যায় তখুনি।

মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল ভূপেশ। ঘরের দুঃসহ নীরবতা ভেঙ্গে বারীন জিজ্ঞেস করে—সমীর নিজে গিয়ে যূথীকে নিয়ে আসতে পারলো না ?

—তা হলে তো কথাই ছিল না। হতভাগার মাথায় এখন অন্য খেয়াল চেপেছে—যূথীকে ডিভোর্স করে অন্য মেয়ে—সাধে কি যূথী—

—বল কি ? বারীন উত্তেজিত হয়ে বলে ঃ তুই ছেলের বাপ হয়ে—।

ভূপেশ দুঃখের হাসি হাসে। আর বল কেন ভাই। একটু থেমে বলে—তোমার কথায় আজন্মের সংস্কার ঝেড়ে ফেলে আমি যূথীকে পুত্র-বধূর মর্যাদা দিয়েছিলাম—

কথাটা শেষ না করে ভূপেশ আবার চুপ করে যায়। ওর করুণ মুখের দিকে চেয়ে বড় দুঃখ হয় বারীনের। মুখে কোন কথা যোগায় না। কিন্তু একটা কিছু বলে ওকে সান্ত্বনা দিতে হবে তো।—এমন ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন ভাই ? নিজেকেও তো বাঁচতে হবে। অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে বারীন বলে।

কথাটা শেষ না হতেই ললিতা ঘরে ঢোকে আবার। সঙ্গে বেয়ারাও। ট্রে করে বেয়ারা চা ও খাবার নিয়ে এসেছে ওদের জন্যে।

টিপয়ে ট্রেটা নামিয়ে রেখেই চলে যায় সে। একটা প্লেটের খাবার লক্ষ্য করে বারীন বলে—মিষ্টি পদার্থ মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, হালুয়া, আপনি খাবেন বলে ঘি ছাড়াই তৈরী করেছি।—দুধ একটু বেশি দিলে ঘিয়ের তেমন প্রয়োজন হয় না।

বারীনকে ডাঃ মুখার্জি ঘি-মাখম খেতে নিষেধ করেছেন, কথাটা ললিতার জানা. কিন্তু ইদানীং চিনি খেতেও যে নিষেধ করেছেন এটা জানে না।

বারীন চেপে গেল কথাটা। মাঝে-মধ্যে এক-আধটু অনিয়ম করলে এমন কি আর ক্ষতি হবে। তা ছাড়া বেচারী কষ্ট করে নিজের হাতে তৈরী করে এনেছে।

হালুয়ার প্লেট বারীনের সামনে এগিয়ে দিয়ে ললিতা কাপে চা ঢালছিল, চামচে করে প্লেট থেকে হালুয়া মুখে দিয়ে বারীন বললে—বেশ হয়েছে, ঘি দেননি, বোঝাই যায় না।

সামান্য দুটো কথা বলে যদি কাউকে খুশি করা যায়, তাতে ক্ষতি কি ? আর ললিতা অল্পতেই একটু স্নেহের প্রকাশ দেখলেই খুশি হয়ে ওঠে ওর উপর। এই তো কিছুদিন আগে ওর দেওয়া চন্দন কাঠের বোতাম

ক'টি নিজের নতুন পাঞ্জাবীতে লাগিয়ে ওকে দেখাতে এসেছিল বারীন। তাতেই কত খুশি হয়েছিল ললিতা। এক মুখ হাসি নিয়ে বলেছিল—সামান্য জিনিস, তাই নিয়ে এত সমারোহ—দামী কিছু হলে যে কি করতেন।

বারীন উত্তর দিয়েছিল—দামটা বোতামের নয়, স্নেহের, তাই সেলিব্রেট করলাম নতুন পাঞ্জাবীতে পরিয়ে।

ললিতা হেসেছিল একটু—খুশির হাসি। কোন কথা বলেনি।

চায়ের কাপ ও বিস্কুটের প্লেট বারীনের সামনে এগিয়ে দেয় ললিতা। চায়ের সঙ্গে বারীন নোনতা বিস্কুট পছন্দ করে এটা কোন সময়েই সে ভোলে না।

—আপনিও নিন।

—নেব বইকি। আগে অতিথির সৎকার করে নিই।—হাসি-হাসি মুখে ললিতা উত্তর দেয়।

আশ্চর্য ব্যাপার, ওদের সংসারে যে এতখানি অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, ললিতার হাবভাব দেখে বুঝবার উপায় নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, বারীন বেড়াতে এলে মনের ভার অনেক হালকা হয়ে যায় ললিতার। সংসারের দুঃখ-অশান্তির কথা মনেই থাকে না।

কতদিন বাদে দেখা করতে এল। তা ওঁদের কাছে দু'দণ্ড বসে গল্প করতে পারলো না ললিতা। ঠিক ঐ সময়েই কী মহিলার আসার সময় হল! বারীন অবশ্য এসেছিল, তাঁর বন্ধুকেই দেখতে। তবে ওঁকে দেখে ললিতাও খুশি হয়েছিল। ভেবেছিল, যুথীর ব্যাপারটা সে খুলে বলবে বারীনের কাছে। তিনি যদি ভূপেশকে বোঝাতে পারে। বউ যখন সমীরের সঙ্গে ঘর করতে রাজী নয়, তখন তাকে ডিভোর্স না করে উপায় কি? অমন দজ্জাল বউ নিয়ে কেউ কি ঘর করতে পারে।

ভূপেশ অবশ্য এসব কথা শুনলে খেপে ওঠে। বলে—পাগল হয়েছ? আমার নাতিদের মা, তাকে ত্যাগ করার কথা চিন্তা করাও মহাপাপ। অথচ আগে ঐ যুথীর নাম পর্যন্ত শুনতে পারতো না।...কি জেদ

বউয়ের ! শ্বশুর আনতে গেলেন, তা কিছুতেই আসতে রাজী হল না।···

ভূপেশ শেষ পর্যন্ত তাঁর নাতিদের কথা উল্লেখ করে বলেছিল—ছেলে দুটোর ভবিষ্যতটাও তো তোমার চিন্তা করা উচিত।

যুথীর মেজাজ তাতে নাকি আরো গরম হয়ে উঠেছিল। ছেলে দুটো তাদের দাদুকে দেখেই তাঁর কাছে ছুটে এসেছিল—যুথী তাদের জোর করেই সরিয়ে দিল। তারপর শ্বশুরের মুখের উপরই বলে বসলো—না, ও বাড়িতে আমি জীবন থাকতে যেতে দেব না ওদেরকে।···আপনাদের বিষয়-আশয়, বাড়ি-গাড়ী দেখে আমি আপনার ছেলের ঘর করতে যাইনি।

কথাগুলো শুনে ভূপেশ স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সামাজিক সম্পর্কের কথা ছেড়ে দিলেও বয়সেরও তো একটা সম্মান আছে ! সভ্যতা-শালীনতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। তা আজকাল অধিকাংশ মেয়ে-বউ এসব নীতিবোধকে জঞ্জালের মতই ঝেড়ে ফেলছে।

যুথীকে দোষ দিয়ে কি হবে। ও তো পরের মেয়ে। নিজের মেয়ে মানসী সেই বা কি করছে ! অথচ বাপের চোখের মণি ছিল ঐ মেয়ে ! তেজ ওর-ও কম নয়। অত দারিদ্র্য সত্ত্বেও তেজ কমছে না। ···ভজুয়ার মুখে ওদের অভাবের কথা শুনে ভূপেশ গোপনে কিছু টাকা পাঠিয়েছিল—ভজুয়ার হাত দিয়ে। মেয়ে সে-টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। স্কুলে চাকরি করে সংসার চালাচ্ছে। ঘরকন্নার কাজও নাকি এক হাতে করে। একটা ঠিকা-ঝি রাখার পর্যন্ত সামর্থ্য নেই।···অত খাটুনি ওর সইবে কেন ? শরীরটা তাই হয়ত অমন ভেঙ্গে পড়েছে। চোখের কোলে কালি, মুখখানাও শুকিয়ে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে।···কি হয়েছে কে জানে। ছেলে-পুলে হবে না তো ? তখন কি উপায় করবে শুনি ? স্কুলে চাকরি করা মাথায় উঠবে। বেবির দুধ জোগাতেই হিমসিম খেয়ে যাবে। অরবিন্দর তো এক পয়সার মুরোদ নেই। লেখাপড়া শিখলে কি হয় ? মানসীর মাথায় কিছু নেই। নিজের ভালো তো পাগলেও বোঝে। বাপ-মায়ের কথা শুনে চললে আজ কি দুঃখ ছিল ওর ! আশ্চর্য জেদী মেয়ে। ভাই-পোর অন্নপ্রাশনের

দিন ললিতা আসতে লিখেছিল—আসা দূরে থাক, মেয়ে সে-চিঠিখানার জবাব পর্যন্ত দিলে না।

ক'দিন থেকে ঘুরে-ফিরে মানসীর কথাটা কেন যেন মনে পড়ছিল ললিতার। একদিন বিকেলবেলা সে এসে উপস্থিত হল। একেই বলে নাড়ীর টান! মেয়ের চেহারা দেখে আঁতকে উঠল ললিতা—ওমা একি চেহারা হয়েছে তোর!

মানসী কোন উত্তর দিলে না—শুধু একটু ম্লান হাসলো।

ভূপেশ তখন বাড়ি ছিল না। মায়ের খাটের উপর দুঃখী-দুঃখী মুখ করে বসে ছিল মানসী।

হ্যাঁ, এখনও সেই কালির পোঁচ চোখের কোলে। সর্বাঙ্গে মাতৃত্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট। ললিতা চিন্তায় পড়ে যায়। বলে—একবার ডাক্তার দেখিয়ে নে—বাচ্চা হবে না তো?—একটু ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে ললিতা।

—দেখিয়েছি।—কথাটা তখুনি চাপা দিয়ে মানসী অন্য কথা তোলে। —তারপর তোমরা সবাই কেমন আছ বল? বাবার শরীর ভালো আছে তো?

—এই মোটামুটি চলে যাচ্ছে।

—আর কাউকে দেখছি না যে!

যুথী ওদের কথাই জিজ্ঞেস করছে মানসী, কথাটা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু অপ্রিয় ঐ ব্যাপারটা মানসীর কাছে বলতে ইচ্ছে করে না ললিতার। কে জানে শুনে মেয়ে হয়তো ওর দাদার উপরই চটে যাবে।

ইচ্ছে না হলেও ললিতা শেষ পর্যন্ত সব কথাই বলে ফেললো মানসীর কাছে।

যুথীকে ডিভোর্স করার কথাটা শুনেই মানসী ভ্রূকুটি করে মন্তব্য করলে—দাদার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

ললিতা ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললে—তোর বাবা সন্ধ্যে নাগাদ নিশ্চয় এসে যাবেন—ওঁর সঙ্গে দেখা করে একেবারে খেয়ে-দেয়ে যাবি, কেমন?

—না, মা অত দেরি করতে পারবো না। আমাকে সন্ধ্যার আগেই

বাড়ি ফিরতে হবে।—একটু চুপ করে কি যেন ভাবলো মানসী। তারপর বললে—তুমি আমাকে চিঠি লিখেছিলে, কিন্তু আমি আসতে পারিনি। আমার, শরীরটা তখন খুবই অসুস্থ ছিল।

—তাই বল। আমিও তাই ভাবছিলাম। আমার চিঠি পেয়েও ও না এসে থাকতে পারে!

কষ্ট করে এলাম—ভেবেছিলাম, বাবার সঙ্গে আজ দেখা হবে।—মানসী বলে আপশোষের সুরে।

—তাড়াতাড়ি এসে যেতেও পারেন।—ললিতা ওকে আশ্বাস দেয়।

—চা দিতে বলি?

—না, চা খেতে এখন আর ইচ্ছে করছে না।

কি অভিমানী মেয়ে গো! প্রাণের টানে বাপের বাড়িতে ছুটে এসেছে, কিন্তু বাপের বাড়ির জলও স্পর্শ করবে না। কথাটা মনে হতেই মনটা খারাপ হয়ে যায় ললিতার। তবু না বলে থাকতে পারে না—চা না হয় না খেলি, দুটো মিষ্টি খাবি তো?

—না, ওসব আমার আজকাল একেবারেই সহ্য হয় না, অম্বল হয়।

ললিতা আর কথা বাড়ায় না, চুপ করে যায়।

মানসী উঠে পড়ে একটু বাদেই। যাবার মুখে আবার বাপের কথা তোলে। না, বাবার সঙ্গে দেখা হল না—আর কবে আসতে পারবো জানি না।—বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

না, বিয়ে করে মানসী সুখী হয়নি। বাপ-মায়ের অমতে বিয়ে করলে কেউ সুখী হয় না।

মুখ কালো করে মানসী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। চলার ধরনটাও ওর কেমন মন্থর হয়ে পড়েছে যেন।

হ্যাঁ, অনেক কষ্ট করেই মানসী স্কুলের পর বাবাকে দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু গিয়ে দেখা পেল না। সেদিন ছোটমামার ওখানে তাঁর চোখে জল দেখে অবধি ঘুরে-ফিরে কেবল তাঁর কথা মনে পড়ছিল। অরবিন্দকে না জানিয়েই তাই স্কুলের পর সোজা চলে গিয়েছিল।

কিন্তু মায়ের মুখে খবরটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। দাদার সঙ্গে

ঝগড়া করে বৌদি নাকি— । ঝগড়া-বিবাদ করতে হয়, বাড়িতে বসেও তো করা চলে। কোন্ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া না হয় !

বিষণ্ণ মনে মানসী বাড়ি ফিরে এল। এসে দেখে অরবিন্দ আগেই বাড়িতে ফিরে এসেছে— শোবার ঘরে বসে ছুজন কমরেড-এর সঙ্গে গল্প করছে।

মানসী ঘরে ঢুকতেই বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে —আজ এত দেরি হল যে ?

—একজনের বাড়িতে গিয়েছিলাম।—বলেই মানসী জামা-কাপড় নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। কলের তলায় মাথা পেতে বসে পড়ল।··· মানসী তার বাবার ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল, কথাটা ইচ্ছে করেই অরবিন্দর কাছে গোপন করে গেছে। বিয়ের আগে অরবিন্দকে ওর বাবা নাকি একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর মানসী তাঁর ওখানেই বেড়াতে গেছে। কথাটা শুনলে মনে নিশ্চয় ছুঃখ পেত অরবিন্দ। কিন্তু বাবা রাগের মাথায় যাই করুন না কেন, প্রাণটা ওর বড় স্নেহপ্রবণ।···মানসীকে একদিন না দেখে থাকতে পারতেন না। মানসীও কি কম ভালবাসে ওঁকে ? অরবিন্দকে উনি হেনেস্তা করেন বলেই না—

কিন্তু ইদানীং মনটা কেমন যেন ছুর্বল হয়ে পড়েছে মানসীর। ঐ ছুর্ঘটনাটা কিছুতেই যেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। অরবিন্দ ত ভাল কথাই বলুক না কেন, নিজের প্রতি কেমন যেন একটা ঘেন্না ধরে গেছে। সারা জগৎ-সংসারটাকেও নোংরা মনে হয়। মরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অরবিন্দ আর তার ভবিষ্যৎ সন্তানের কথা মনে হলে আর মরতে ইচ্ছে হয় না। হু হু করে কান্না ঠেলে ওঠে বুকের ভেতরে। নিজের বুকের স্পন্দনের সঙ্গে ওর সন্তানের স্পন্দনও যেন সে শুনতে পায় আজকাল। না, অরবিন্দকে ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও শান্তি নেই মানসীর।···স্নেহ-প্রীতি, উদারতার সত্যি অন্ত নেই অরবিন্দর।

মানসীকে সমস্ত ছুঃখ-কষ্টের হাত থেকে আগলে রাখার কত চেষ্টাই না করছে সে। অল্পদিন হল কারখানায় একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। এক সঙ্গে পার্টির কাজ, কারখানায় কাজ করে যাচ্ছে। ফলে প্রচণ্ড

খাটুনি চলেছে ওর। তবু মুখে হাসি লেগে আছে সর্বক্ষণ। মানসীর মুখ একটু মলিন দেখলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে—শরীর খারাপ লাগছে? আগে থেকে বোলো কিন্তু।

কিন্তু রোজ রোজ অসুস্থতার কথা বলে ওর মন খারাপ করে দিতে ভালো লাগে না। মানসী তাই গোপন করে যায় অনেক কথা। বলে—না শরীর তো ভালই আছে এখন, সামান্য দুর্বলতা, ধীরে ধীরে সেরে যাবে।

অরবিন্দ অমনি নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া নিয়ে বসে যায়। নতুন পত্রিকাটার জন্যেও ওর কম খাটুনি যাচ্ছে না।

মানসী স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। অরবিন্দর কমরেডরা ততক্ষণে চলে গেছে। কিন্তু অরবিন্দও কি বেরিয়ে গেল তাদের সঙ্গে।

চুল আঁচড়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরে মানসী রান্নাঘরে এসে ঢুকলো এসে দেখে অরবিন্দ ততক্ষণে চা তৈরী করে ফেলেছে।

—তুমি আবার কষ্ট করতে গেলে কেন?—মানসী বলে।

—তুমি একাই বা কষ্ট করবে কেন?—অরবিন্দ হেসে উত্তর দেয়: Division of labour—কাজটা দু'জনে ভাগাভাগি করে নেওয়াই তো ভালো। এখন সুস্থ হয়ে বসে খাও তো।

আনন্দে বেদনায় মানসীর চোখে জল এসে যায়। এমন স্বামী পেয়েও মানসী সুখী হতে পারছে না। মনের মধ্যে সেই অপমানজনক দুর্ঘটনাটা যেন কাঁটার মত বিঁধে আছে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে অরবিন্দর গা ঘেঁষে বসে পড়ে মানসী। হাত দুটো ওর কাঁধের উপর রেখে বলে—আমাকে একটু আদর করো তারপর খাবো।

অরবিন্দ অমনি ওর ঠোঁটে এক গভীর চুম্বন এঁকে দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার। চুমু খেলেই মানসীর মনের সমস্ত অপমানের গ্লানি যেন ধুয়ে-মুছে যায়। ঘৃণ্য কামনা চরিতার্থ করার জন্যে এক পাষণ্ড যে কোনদিন ওর সমস্ত মান-ইজ্জত নষ্ট করেছে, তা মিথ্যা বলেই মনে হয়।

দিন কয়েকবাদেই বিকেলবেলা ভজুয়া হঠাৎ আবার এসে হাজির হল। মাসখানেক আগেও সে একবার ঘুরে গেছে মানসীদের বাড়ি থেকে। দিদিমণিকে বেশিদিন না দেখে থাকতে পারে না ও। কিন্তু ফিরে গিয়ে মা-বাবার কাছে সেই তো আবার আক্ষেপ করতে বসবে। না, মানসী তাদের আর্থিক অভাবের কথা জানতে দিতে চায় না কাউকে। এ যুগের মানুষ টাকা-পয়সাটাকেই সব চেয়ে বড় বলে মনে করে। একেই বলে ধনিক সভ্যতা!

তবে এসে যখন পড়েছে, ভজুয়াকে খাতিরযত্ন না করে উপায় নেই। ওকে দুঃখ দিতে কষ্ট হয় মানসীর। মুখে হাসি টেনে ওকে বসতে বললে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেঝেয় বসে পড়ল ভজুয়া। আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে। বয়স তো কম হয়নি।

কিন্তু মুখখানাও কেমন বিষণ্ণ লাগছিল ওর।

—কি ব্যাপার ভাই?...বাড়ির সবাই ভালো আছেন তো?

—আর বোলো না দিদিমণি! কর্তাবাবুকে ওরা সবাই পাগল করে দেবে।

মানসী চিন্তায় পড়ে যায়।—কি হয়েছে বলবে তো।

—কি আর হবে! দাদাবাবুর মাথায় আর এক বদ খেয়াল চেপেছে—বৌদিকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করবে।...কথাটা শুনেই কর্তাবাবুর মাথা গরম হয়ে উঠেছে—উঠবেই তো। অমন অন্যায্য কথা তিনি মানতে পারেন কখনো? কথাগুলো বলে ভজুয়া চুপ করে রইল।

মানসীই আবার কথা তুললো।—তা বৌদি এখনও বাড়িতে ফিরে আসেন নি?

হতাশার সুরে ভজুয়া বলে—না, তিনি নরম হলে তো কথাই ছিল না।—একটু থেমে বলে—দাদাবাবু আজকাল রাত্রে প্রায়ই বাড়ি ফেরেন না। কিন্তু বৌদিকে ত্যাগ না করে তো ঐ মেয়েটাকে ঘরে আনতে পারছেন না।...ঝি-চাকরদের কাছেও কর্তাবাবুর আর সম্মান রইল না। ...বাবুকে সত্যি ওরা পাগল করে দেবে দিদিমণি। উত্তেজিত হয়ে কথাগুলি বলে ভজুয়া প্রায় কেঁদে ফেলে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মানসীর বড় মায়া লাগে। সান্ত্বনা দেবার

মিথ্যা চেষ্টা করে। বলে—কিন্তু আমাদের হাতে তো কিছু নেই ভাই, এ নিয়ে অনর্থক দুঃখ করে লাভ কি!

—লাভ-লোকসান ছাড়াও তো মানুষ মানুষের জন্যে চিন্তা করে।—কাঁদ-কাঁদ স্বরে ভজুয়া হঠাৎ একটা দামী কথা বলে ফেলে।

মানসী মাথা নেড়ে সায় দেয় ওর কথায়। হ্যাঁ লাভ-লোকসান ছাড়াও মানুষ মানুষের জন্যে চিন্তা করে—ভালবাসে। মানুষের মনুষ্যত্ব তো ঐখানেই।

ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে মানসী বলে—তুমি একটু বোসো, আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

ভজুয়া অমনি হা হা করে ওঠে।—না দিদিমণি, এই শরীর নিয়ে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তার চেয়ে তুমি বরং আমার কাছে বোসো একটু। কতদিন বাদে তোমাকে দেখলাম।···সেদিন তুমি ও বাড়ি গিয়েছিলে, শুনলাম। এমনি কপাল, তোমার সঙ্গে দেখা হল না।···আমি তখন বাজার করতে বেরিয়েছিলাম।

ভজুয়া আজকাল বেশি কথা বলে। একবার বলতে শুরু করলে আর থামতে চায় না।

বয়সেরই হয়তো ধর্ম এটা।

অফিসের মাইনে পেয়েই বাণী ঝোঁকের মাথায় খান কতক বাছাই করা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড কিনে ফেললো। নিজে গাইতে না জানলে কি হয়, গান শুনতে তো ভালবাসে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ওর বাবাও খুব পছন্দ করেন। পাশের বাড়িতে গ্রামোফোনে সেদিন রবীন্দ্রনাথের ঐ রেকর্ডখানি বাজছিল।

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধূলো যত
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহুতের মতো···"

কি তন্ময় হয়েই না বাবা শুনছিলেন গানটি। মুখে একটা সাবলাইম্—আত্মসমাহিত ভাব ফুটে উঠেছিল।

অফিস থেকে ফেরার পথে বাণী নিজের পছন্দমত খানকতক রেকর্ড

কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলো। আগের রেকর্ডগুলো শুনে শুনে পুরানো হয়ে গেছে।

বাবা ওর আসার আগেই চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়েছেন।

বাণীও চা-খাবার খেয়ে নিজের শোবার ঘরে রেকর্ডগুলি নিয়ে বাজাতে বসলো। হ্যাঁ, এখন যতক্ষণ ইচ্ছে বসে সে এই গানগুলি শুনবে নিশ্চিন্ত মনে—কোথাও আজ আর বেরুনো নয়।

"কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।..."

গ্রামোফোন রেকর্ডে এই গানখানি শেষ হলেই বাইরের ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল। বামুনদি কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। কে এল আবার। বাবা নন নিশ্চয়।

বাণী রেকর্ডখানি তুলে খাপে ভরে বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একি, দেবব্রতবাবু—একলা বসে আছেন। তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছেন। বামুনদি তখন বেরিয়ে গেছেন ঘর থেকে। হাতের বইখানি খোলা থাকলেও বইয়ের পাতায় মন ছিল না দেবব্রতবাবুর। সামনে খালি চায়ের কাপ। বামুনদি তাহলে ওকে চা দিয়ে গেছেন এর মধ্যেই।

বাণীকে দেখেই যেন সজাগ হয়ে উঠলেন দেবব্রতবাবু।

—কখন এলেন?—বাণী জিজ্ঞেস করলে।

—তা প্রায় আধঘণ্টার উপর।

—আমাকে খবর দেন নি কেন?

—মনের মধ্যে যখন গানের সুর ঘনিয়ে আসে, তখন কাউকে disturb—বিরক্ত করতে নেই—সুর কেটে যায়।—বলে মৃদু হাসলেন দেবব্রতবাবু।

অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে বাণী বলে—আজ খানকতক নতুন রেকর্ড কিনে আনলাম।

—হ্যাঁ, বসে বসে গানগুলি শুনছিলাম।...তোমার পছন্দের তারিফ করতে হয়। অপূর্ব সিলেক্‌শন্।—দেবব্রতবাবু উত্তর দেন।

—কিন্তু আপনি এতক্ষণ একলা বসে ছিলেন।

—মধ্যে মধ্যে একলা থাকাও প্রয়োজন মানুষের পক্ষে।

—দেবব্রতবাবু হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে পড়েন যেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—একটা জায়গায় মানুষ সত্যিই সম্পূর্ণ একলা।

বাণী অবাক হয়ে যায় ওঁর কথা শুনে। এমন আড্ডাবাজ লোক, এত যাঁর বন্ধু-বান্ধব, তা সত্ত্বেও উনি নিজেকে একলা মনে করেন।—বাণী প্রতিবাদ না করে থাকতে পারে না। বলে—কথাটা মোটেই ঠিক নয়। মানুষ কখনই একলা—নিঃসঙ্গ নয়।

দেবব্রতবাবু তাঁর পুরানো মেজাজ ফিরে পান। হেসে বলেন—আমি কি তাই বলতে চেয়েছি ?···এই যে আজ তোমার কাছে মন খুলে এই কথাগুলো বলতে পারছি, এ সুযোগই তো জুটতো না তাহলে!··· একজনের কাছে মন খুলে সব কিছু বলতে পারার সৌভাগ্য তো সবার হয়না।···তোমার স্বভাবের মধ্যে আশ্চর্য একটি অকৃত্রিম সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ—একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে।···তোমার স্বভাবের এই অকৃত্রিম সৌন্দর্যবোধ এবং সত্যনিষ্ঠার জন্যেই হয়তো আমি আমার গভীরতম চিন্তা-ভাবনাগুলিকে অতি সহজে তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারি।··· মনের শূন্যতা আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে ওঠে।—

দেবব্রতবাবু নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলে যান—"লভিয়াছি চির স্পর্শমণি, আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি···"—বাণীর দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে বসে আছেন দেবব্রতবাবু।

আনন্দে-বেদনায় বাণীর চোখে জল আসে।

মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে সে। সলজ্জ মধুর সেই নীরবতা ভেঙ্গে দেবব্রতবাবু একসময় বলে উঠলেন—তুমি গান বন্ধ করে চলে এলে কেন ?

—বা, আপনি একলা বসে থাকবেন!—সামান্য ইতস্তত করে বললে —তা, গান শোনার ইচ্ছে হলে চলুন না আমার ঘরে—এক সঙ্গে বসে গান শোনা যাবে।

—চল।

দেবব্রতবাবুকে নিয়ে বাণী আবার তার শোবার ঘরে এসে ঢোকে।

—বসুন। বাণী চেয়ার এগিয়ে দেয় দেবব্রতবাবুর দিকে। নিজে খাটের উপর গিয়ে বসে।

দেবব্রতবাবু খাটের পাশেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন।

রেকর্ডগুলি তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়ে বাণী বললে—কোন গানটা শুনবেন বেছে দিন।

—নাও ধর।—একখানি রেকর্ড বাণীর হাতে তুলে দিলেন তিনি।—"চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে…"

পরপর কয়েকখানি গান শুনে উঠে পড়লেন দেবব্রতবাবু। বললেন—না, আর দেরি করা চলে না।—বলেই বেরিয়ে গেলেন।

বাণীর বাবার ঘর পেরিয়ে সোজা রাস্তায় গিয়ে নামলেন। যাবার আগে একটি কথাও বললেন না। নিজের মধ্যে যেন তলিয়ে গেছেন মানুষটি—ওর মনের নাগাল পাওয়া সত্যিই কঠিন।

দেবব্রতবাবু চলে গেলেই বাণী সদর দরজা বন্ধ করে আবার অন্দরে এসে ঢুকলো। নিজের ঘরের দিকে যেতে গিয়েও রান্নাঘরে বামুনদির গলার আওয়াজ পেয়ে উঁকি মেরে দেখলো—ওমা, মিতা! রান্নাঘরে মেঝেয় পিঁড়ির উপর বসে বামুনদির কাছে ঘুঘনি তৈরীর তালিম নিচ্ছে। দোরগোড়ায় বাণীকে দেখেই উঠে পড়লো।

—তুমি কখন এলে?…চল, ওঘরে গিয়ে বসবে। মিতাকে লক্ষ্য করে বাণী বলে।

বাণীর ঘরে দু'জনে খাটের উপর এসে বসে পড়ে।

বাণী হেসে বলে—রান্নাঘরে গিয়ে বসেছিলে কেন?

—তোমরা গান শুনছিলে।—আমতা-আমতা করে মিতা বলে: ভদ্রলোকের সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই।

—না-ই বা থাকলো, হতে কতক্ষণ! আচ্ছা মেয়ে!

মিতা মিষ্টি করে হাসলো একটু।—নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে আমার লজ্জা লাগে।

—তোমরা দু'টিতেই দেখছি রাজযোটক।—বাণী ঠাট্টার ছলে বলে: তা অনুপ এল না যে?

—তাঁর ইচ্ছে। স্কুল থেকে ফিরে কোথাও আজকাল আর বেরুতে চায় না।

—খুব ঘরকুনো হয়ে পড়েছে দেখছি। এখানেও অনেকদিন আসেনি।

মিতা মুখ টিপে হাসে। বলে তোমার উপর ভীষণ অভিমান ওঁর। বলে—তুমি নাকি ওঁকে আর আগের মত খাতির কর না।

কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে যায় বাণীর। মানুষকে সামান্য কারণেই ভুল বোঝে অনুপ। মনের ভাব গোপন রেখে বাণী অন্য কথা তোলে।—ওর শরীর ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ, শরীর তো আজকাল ভালই আছে।···আমাকে নিয়েই এখন যত ঝামেলা।

—কেন তোমার আবার কি হল?

— সকালের দিকে বড্ড অম্বল হচ্ছে, তা ছাড়া—

—ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিলেই পার।

—হ্যাঁ, পাশের বাড়ির মাসীমাও তাই বলছিলেন। তাঁর কথামত পরশুদিন হাসপাতালে গিয়ে লেডি ডাক্তারকে দেখিয়ে এসেছি।

—কি বললেন?

মিতা সলজ্জ হেসে মুখ নীচু করে? উত্তর দেয় না। ব্যাপারটা এত স্পষ্ট যে উত্তরের প্রয়োজন হয় না। ঠাট্টার হাসি হেসে বাণী বলে—মা হতে চলেছ, তাই না?

মাথা হেঁট করে মিতা নীরবে সম্মতি জানায়। একটু পরে বলে—কাউকে জানাতে ও নিষেধ করেছিল। তা তোমাকে না জানিয়ে আমি থাকতে পারি?

বাণী নিজের মনে হাসে। মিতা আপন আবেগে বলে যায়—সবাই তো আমাকে বাঁজা মেয়ে বলেই সন্দেহ করেছিল।

ভারী সরল প্রকৃতির মেয়ে মিতা। ঢেকে-রেখে কথা বলতে জানে না। বাণীকে অবশ্য ও সহোদর ভগ্নীর মতই মনে করে। কিন্তু এসব সাংসারিক কথা শুনতে ভালো লাগে না বাণীর। তবু মিতাকে খুশি করার জন্যে বললে—তোমাকে তো আজ আমার মিষ্টি খাওয়ানো উচিত ছিল—এমন একটা আনন্দের সংবাদ দিলে।

মিতার মুখে খুশির হাসি। বলে—তোমার কথাই তো মিষ্টি বাণীদি।

খানিকবাদেই মিতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে। বাণীও ওকে আর বাধা দেয় না। একলা থাকতেই আজ ভালো লাগছে বাণীর।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় বাণী বেড়াতে গেল অনুপদের ওখানে। মিতা নিজে যেচে এসে ঐ খবরটা জানিয়ে গেল, না যাওয়াটা ভালো দেখায় না। তা ছাড়া যা অভিমানী ছেলে অনুপ, রাগ করে হয়তো আসাই বন্ধ করে দেবে।

অনুপদের বাড়িতে গিয়ে কিন্তু দেখা হল না অনুপের সঙ্গে। এক সম্পাদকের সঙ্গে নাকি দেখা করতে গেছে।

—ও এখন তাহলে আবার লেখা শুরু করেছে?—বাণী জিজ্ঞেস করে মিতাকে।

—হ্যাঁ, ফাঁক পেলেই তো লিখতে বসে যায়।···গেল মাসেও একটা কবিতা বেরিয়েছে। বলেই 'উষসী' মাসিক পত্রিকাখানি মিতা এগিয়ে দিলে বাণীর হাতে।—চা নিয়ে আসছি। বলেই মিতা আচমকা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সূচিপত্র দেখে অনুপের লেখা কবিতাটা সঙ্গে সঙ্গে বের করে পড়তে শুরু করলো বাণী।

শেষ হলে নিজের অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। উঃ, কি পেসিমিস্‌টিক—নৈরাশ্যে ভরা কবিতা! কবিতাটির প্রতি ছত্রে জগৎ-সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুন। এই ধরনের কবিতা ওর হাত থেকে বেরুল কি করে!

চুপচাপ বসে কি ভাবছিল, খেয়াল ছিল না। মিতা চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই চমক ভাঙ্গলো। দু'হাতে দুকাপ চা। একটি কাপ বাণীর হাতে এগিয়ে দিয়ে মিতা বললে—তুমিও দেখছি ওঁর মত ভাবুক হয়ে উঠেছো, আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবছিলে এত?

বাণী ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করে—অনুপের আসতে নিশ্চয় দেরি হবে?

—ওর কি কিছু ঠিক আছে!—মিতাও চায়ে চুমুক দিয়ে বলে: আজকাল কি হয়েছে ওর, যতক্ষণ বাড়িতে থাকে মুখ ভার করেই তো আছে। কথা-বার্তা খুব কমই বলে আজকাল।

—তা তুমি ওকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে তো পার।

—গেলে তো! আমাকে আজকাল ও কেন যেন এড়িয়ে চলতে চায়। কিছু বলার উপায় নেই। যা অভিমানী, হয়তো সাতদিনের মধ্যে কথাই বলবে না!

ঠাট্টা করার ইচ্ছে হলেও নিজেকে সামলে নিলে বাণী। অনর্থক বেচারা মনে দুঃখ পাবে। হাসি চেপে বলে—আগে তো এমন ছিল না। —বাণী অন্য কথা খুঁজে পায় না।

দু'জনে নির্বাক হয়ে চা খাচ্ছিল, এমন সময়ে অনুপ হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকলো। বাণীকে দেখে কি একটু চমকে উঠল সে? কিন্তু ওকে দেখে আগের মত অনাবিল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না।

চায়ের খালি কাপ দু'টি নিয়ে মিতা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গম্ভীর মুখে অনুপ খাটের উপর গিয়ে বসলো।—কখন এলে? বাণীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে।

—খানিক আগে।···তুমি শুনলাম, এক সম্পাদকের কাছে গেছলে।

—হ্যাঁ, নতুন করে আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছি।

বাণী হেসে ফেললো।—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। একটি কবিতা ছাপিয়েও ফেলেছ দেখলাম।

কথাটা শুনে অনুপ ভ্রূকুটি করলো একটু।—কেন, তুমি পড়েছ নাকি?

—কবিতা তো মানুষের পড়ার জন্যেই ছাপানো হয়, তাই না?

অনুপ কোন উত্তর দেয় না। মুখ কালো করেই বসে থাকে।

বাণীই আবার কথা বলে।—তা হঠাৎ এসব ছাই-ভস্ম লিখতে শুরু করেছ কেন?···মিষ্টি কিছু লিখতে পার না?···মানুষকে যদি কিছু আশা-ভালবাসা—উজ্জ্বল-ভবিষ্যতের কথা—

বাণী তার বক্তব্য শেষ করতে পারে না। তার আগেই অনুপ বলে ওঠে—ও সব প্রেম-ভালবাসার কথায় আমার অরুচি ধরে গেছে, সংসারে মিষ্টি কিছু থাকলে তো লিখবো?—

অনুপ আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বাণী ওকে থামিয়ে দেয়। বলে—বাজে বকো না। তোমার একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তো সংসারকে বিচার করলে চলবে না।

অনুপ চট করে উত্তর দেয় না। খানিকবাদে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে—ওসব বইয়ের কথা বাদ দাও—স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা বলে কিছু নেই।···মানুষ নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না।···

কথাগুলো শুনে বাণীর রাগ ধরে যায়। বলে—মানুষ নিজেই আবার কখনো সব চেয়ে বেশি শত্রুতা করে নিজের সঙ্গে—এটা ভুলে যেও না।

অনুপ উত্তর দেয় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত বিদ্রূপের হাসি হাসে। না, ওর সঙ্গে আর তর্ক করে লাভ নেই। ইচ্ছেও হয় না তর্ক করতে। তবে ওর পরিবর্তন দেখে মনে দুঃখ পায় বৈকি। কি সরল, স্নেহপ্রবণ ছিল অনুপ।···দম্ভে আঘাত লাগলে মানুষের স্নেহ-ভালবাসাও কর্পূরের মত উবে যায়।

কাজের ছুতো করে বাণী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ওদের বাড়ি থেকে।

বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনের মেঘ কেটে গেল বাণীর। বাবার ঘরে তখন দস্তুর মত আসর বসে গেছে। আসরে লোকের সংখ্যা অল্প হলেও জোর তর্ক চলেছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র ওর বাবা। তা ছাড়া আছেন, দেবব্রতবাবু, ডাঃ মুখার্জী এবং কমরেড অরবিন্দ।

বাণীকে দেখে সবাই খুশি। অরবিন্দ হাত ধরে নিজের পাশে টেনে নিলে বাণীকে।

—যাক, আমাদের হোস্টেস এসে গেছেন।—ডাঃ মুখার্জী খুশি হয়ে বলে উঠলেন। কথাটা বাণীর বাবার যেন কানে ঢুকলো না। পুরানো কথার জের টেনে তিনি বললেন—আইনস্টাইন সত্যি কি আশ্চর্য একখানি সর্বাত্মক 'ল' আবিষ্কার করে গেছেন।

মাথা দুলিয়ে তাঁর কথায় সায় দিয়ে দেবব্রতবাবু বলেন—হ্যাঁ 'ল অব্ রিলেটিভিটি' বিশ্ব-সংসারের সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ডাঃ মুখার্জীও চুপ করে থাকার লোক নন। 'ল অব্ রিলেটিভিটি' ছেড়ে তিনি শেষমেষ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। এবং অরবিন্দ ঐ তত্ত্বমূলক আলোচনার মধ্যেই ফাঁক পেলেই রাজনীতি—শ্রেণীসংঘর্ষের ইতিহাস প্রচার করার চেষ্টা করছিল।

নীরব শ্রোতার মধ্যে একমাত্র বাণী। চুপচাপ বসে ওদের কথা শুনছিল। কিন্তু ওর বাবা চুপ করে বসে থাকতে দিলে তো। বাণীকে লক্ষ্য করে এক সময়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—তুমি দেখছি চুপ করে বসে আছ—চায়ের কথা ভুলে গেলে নাকি ?

বাণী ঘরে ঢোকার আগে ওঁরা একবার চা খেয়েছেন, খালি কাপগুলো টিপয়ে তখনও পড়েছিল। কিন্তু বাবা যখন আবার চায়ের ফরমাশ করলেন বাণী না উঠে করে কি !

উঠে চায়ের যোগাড় করতে গেল।

খানিকবাদে ট্রে করে চা নিয়ে বাবার ঘরে ফিরে এল বাণী।

চায়ে দুধ-চিনি মেশাচ্ছিল সে, এমন সময়ে ডাঃ মুখার্জী একটা ছেলেমানুষি করে বসলেন। নিজেব এ্যাটাচিকেস থেকে একটা ক্রিমক্রাকার বিস্কুটের প্যাকেট এবং এক ঠোঙা ক্যাসুনাটস্ বাণীর হাতে এগিয়ে দিলেন। মিষ্টি হেসে বললেন—এগুলি এনেছিলাম আমার মাস্টার মশাইয়েব জন্যে। কিন্তু আমাদের সবাইকে ভাগ না দিয়ে উনি খেতে পারবেন না।

—ভুজনের ছলেব অভাব হয় না।—বাণীর বাবা সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনি কাটলেন।

—হ্যাঁ, ওঁর ভাগেই বেশি পড়া উচিত, কারণ উনিই এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ।

—তা যা বলেছ।—বাণীব বাবা দেবব্রতকে লক্ষ্য করে বলেন—তোমার কাকীমা এলে আমি মনে একটু জোর পেতাম। তোমাদেব সঙ্গে আমাকে আড্ডা দিতে দেখলে সবাই মনে করবে বুড়ো এখন সিঙ ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকবার চেষ্টা করছে।—বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

বাণী সবাইকে প্লেটে কবে বিস্কুট-ক্যাসুনাটস্ ভাগ করে দিলে।

—ওকি, তুমিও নাও।—ডাঃ মুখার্জী হঠাৎ বলে উঠলেন বাণীকে লক্ষ্য করে।

—নেব বইকি !—বাণী হেসে উত্তর দেয়।

—ও, হ্যাঁ ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি তো আমাদের মা ঠাকুরমাদের যুগের মেয়ে নও, যে নিজে না খেয়েই—

বলেই হেসে উঠলেন ডাঃ মুখার্জী—অনাবিল প্রাণ খোলা হাসি।

আশ্চর্য সরল প্রকৃতির মানুষ! অত বড় নামজাদা হার্টস্পেসালিষ্ট অথচ সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার। মনের মধ্যে কোন কম্‌প্লেকস্ নেই ওঁর।... কি স্নেহ প্রবণ মন, বাবার জন্যে নিজের হাতে করে বিস্কুট-ক্যাস্থনাটস্ নিয়ে এসেছেন। বাবা এই নোনতা খাবারগুলি পছন্দ করেন তাই।

নতুন বইখানি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে খুবই পরিশ্রম করতে হচ্ছে বারীনকে। ডাঃ মুখার্জীর উপদেশ এবং বাণীর শাসন অমান্য করেই সে তাই রাত জেগে বই লিখছে। বাণী শুয়ে পড়ার পর উঠে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বই লেখে। লেখা শুরু করে ফেলে রাখতে ইচ্ছে করে না। যতক্ষণ না শেষ হয়, মনে সোয়াস্তি পাওয়া যায় না।

তা বইটা প্রায় শেষ করে এনেছে বারীন। শুধু লেখা নয়, পড়াশুনাও করতে হচ্ছে যথেষ্ট। না পড়ে কি এসব বই লেখা সম্ভব কারো পক্ষে 'ফ্রম্ হেগেল টু মার্কস'—কত বই ঘেঁটে তবে না এই বইয়ের রসদ যোগাড় করতে হয়েছে।

অনেক রাত অবধি কাল লেখাপড়া করেছে বারীন। এঙ্গেলসের 'ল্যুদভিগ ফয়ের বাখ' এবং 'এন্টি ড্যুরিং'-এর পাতা ওলটাতে ওলটাতেই তো রাত ছুটো বাজলো। তারও অনেক পরে বারীন শুতে গেছে। ভাগ্য ভালো বাণী টের পায়নি। সকালে উঠতে আজ দেরি হয়ে গেছে বারীনের। বাবাকে দেরিতে উঠতে দেখে মেয়ে তো চিন্তায় পড়ে গেছে। —এত দেরিতে উঠলে? শরীর খারাপ হয়নি তো?

—না, মাঝরাত্রে ঘুমটা হঠাৎ কেন যেন চটে গেল, তাই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।—

আজেবাজে ক'টা কথা বলে মেয়েকে নিশ্চিন্ত করলো বারীন। এসব কথাকে বারীন কখনই মিথ্যার পর্যায়ে ফেলে না। উদ্দেশ্যটা যখন স্নেহপ্রসূত।

বারীন চটপট হাত মুখ ধুয়ে চা খেতে বসলো। বাণী এতক্ষণ চা না খেয়েই বসে ছিল বাবার জন্যে। সকালে রোজ বাবার সঙ্গে বসে চা খাওয়া চাই মেয়ের।

চায়ের পাট শেষ হলেই বাণী তার নিজের কাজে চলে যায়। বারীনও তার ঘরে এসে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। বেলা দশটার আগেই নেয়ে-খেয়ে বাণী বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। অফিসের উপস্থিতি সম্পর্কে সে বরাবরই পাঙচুয়াল—সজাগ।

বাণী আফিসে চলে গেলে বারীনও স্নান সেরে খেতে বসে। বামুন-ঠাকরুণকে অনর্থক কেন আর বসিয়ে রাখা। তাছাড়া, ডাক্তারও সকাল-সকাল খেয়ে নিতে বলেছে বারীনকে।

খাওয়া হয়ে গেলেই বারীন খাটের উপর এসে চিত হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তবে খাতা-পত্তর নিয়ে বসা যাবে। শরীরটা আজ তেমন জুতসই মনে হচ্ছে না। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বলেই বারীন আরো এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে। তা ছুটি নেবার তো বয়স হয়েই গেছে। অন্য চাকরি হলে কবেই তো পেন্‌সন্ নিতে হত।

বিছানায় শুতে না শুতেই চোখের পাতা কেমন জড়িয়ে এল বারীনের। তারপর নিজের অজান্তেই একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হতেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল আচমকা। এমন ভর দুপুরে কে আবার বেড়াতে এল!

বামুনঠাকরুণ অন্দরমহলে ঘুমিয়ে ছিলেন। বারীনই উঠে দরজাটা খুলে দিলে।—ভূপেশ! এমন সময়ে!

—এসো।—বারীন বললে ভূপেশের দিকে চেয়ে।

ভূপেশ ঘরে ঢুকেই চেয়ারে বসে পড়ে। বড় ক্লান্ত-বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল ওকে।

—কি ব্যাপার!—খাটের উপর বসে বারীন প্রশ্ন করে: সবাই ভালো আছ তো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভূপেশ উত্তর দেয়।—ভালো থাকলে কি এমন অসময়ে তোমার কাছে ছুটে আসতাম।—ভূপেশ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে—সমীরকে নিয়ে মহাহাঙ্গামার মধ্যে আছি। যুথীর বিরুদ্ধে কোর্টে ডিভোর্স মামলা রুজু করেছে সে।—আমাকে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি।...কত কেলেঙ্কারীই না সইতে হবে আমাকে!

—ওর মা কি বলেন?

—মা-ই তো উস্কানি দিচ্ছেন।—

কথা অসমাপ্ত রেখেই ভূপেশ চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে—আমার দুঃখ হয় ঐ বাচ্চা ছেলে দুটোর জন্যেই। ওদের কথাটাও তো সমীরের চিন্তা করা উচিত ছিল।

—উচিত কাজ কি মানুষ সব সময়ে করে থাকে?—বারীন বলে: তাহলে তো সংসারে দুঃখই থাকতো না।

বারীনের কথাগুলো যেন কানেই ঢুকলো না ভূপেশের। বললে—আমি এখন কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। ছেলেকে যে ত্যাগ করবো সে উপায়ও নেই। গিন্নী তাহলে আবার গোঁসা করে ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবেন।

বারীন কোন উত্তর খুঁজে পায় না। সিগারেট ধরিয়ে নীরবে সিগারেট টেনে যায়।

ভূপেশই আবার কথা বলে।—কোর্টে কেস উঠলে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আমার মান-ইজ্জত বলে কিছু থাকবে না।—একটু থেমে বলে—তুমিই বা কি করবে! তবু তোমার কাছে ছুটে এসেছি। একজনের কাছে কথাগুলো বলতে না পারলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

বারীন তবু চুপ করে থাকে। কথা বলে না। ভূপেশকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে সে! মাকড়সার জালে একবার জড়িয়ে পড়লে বেরিয়ে আসা যায় না। ভূপেশকে সে রক্ষা করবে কি ভাবে!

বারীন অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। সেটা লক্ষ্য করেই হয়তো ভূপেশ বলে—তুমিও তো অসুস্থ, দুপুরবেলায় এসে তোমাকে অনর্থক বিরক্ত করলাম।

বারীন কোন কথা বলে না। দুঃখের হাসি হেসে আস্তে ওর হাতটা চেপে ধরে। খানিকবাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—তোমাকে কিছু বলার নেই আমার—বলেই ভূপেশের হাত ছেড়ে দেয়।

ভূপেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অন্য কথা তোলে। —তুমি এখনও ছুটিতে আছ শুনলাম।

খানিক ইতস্ততঃ করে বারীন বলে—হ্যাঁ শরীরটা এখনও ঠিক হয়নি। তাই আরো কয়েকদিন ছুটি নিয়েছি।

ভূপেশ মনে মনে লজ্জিত হয়। বলে—না, না, তুমি শুয়ে পড়, আমি যাই।…এখন তোমার বিশ্রাম নেওয়াই উচিত।

—বিশ্রাম তো নিতেই হবে একদিন।—বারীন হেসে বলেঃ তার জন্যে এত তাড়া কিসের ভাই?

ভূপেশ আচমকা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

—ওকি, তুমি এখুনি যাবে? চা খেয়ে যাবে না?

—না, বিকেলে চা খাওয়া আজকাল ছেড়ে দিয়েছি।—বারীনের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ভূপেশ বলে—চলি।

—শীগগিরই যাবার চেষ্টা করবো—অবশ্য যদি শরীর ঠিক থাকে।—বারীন উত্তর দেয়।

শরীরটা সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা নইলে এত ঘন ঘন ঐ কথাটাই বা মনে পড়বে কেন!

অনেকদিন বারীনের সঙ্গে দেখা হয় না সুলেখার। শীগগিরই আসবে বলে গিয়েছিলো, কিন্তু এতদিনের মধ্যেও যখন এলো না—

বিকেলবেলায় বলতে গেলে একরকম ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ সুলেখা চলে এল বারীনের বাড়িতে।

দরজাটা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকে দেখে বারীন চোখ বুজে বিছানায় তখনও শুয়ে আছে! শরীর নিশ্চয় ভালো নেই, না হলে এমন অসময়ে শুয়ে থাকবে কেন?

সুলেখার পায়ের আওয়াজ পেয়েই হয়ত চোখ মেলে দেখলো।—বসুন।—বলেই বারীন উঠে বসলো খাটের উপর। সুলেখা ওর খাটের পাশে চেয়ারে বসলো।

—শরীর কেমন আছে?—সুলেখাকে জিজ্ঞেস করে বারীন।

বারীনের সে কথার উত্তর না দিয়ে সুলেখা পাল্টা প্রশ্ন করে—এখনও শুয়ে আছেন—শরীর খারাপ বোধ করছেন নাকি?

—না, রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, তাই মাথাটা একটু ধরেছে। এই আর কি।

—না, না, আপনি শুয়ে পড়ুন।—সুলেখা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে যেন।

বামুনঠাকরুণ ঘরে ঢুকে এক কাপ হরলিকস বারীনের সামনে টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিলেন। বারীন তাঁকে পিছু ডাকলেন—মাসীমাকে চা দিয়ে যান। বামুনঠাকরুণ নিঃশব্দে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

হরলিকসের কাপ বারীনের হাতে এগিয়ে দিয়ে সুলেখা বলে—অসুখ-বিসুখ হলে অন্ততঃ আমাকে একটা খবর দেওয়া উচিত।

—হ্যাঁ, উচিত তো অনেক কিছুই।—বারীন দুঃখের হাসি হাসে।

হরলিকসের কাপে চুমুক দিয়ে বলে—এখন আর অনুবীক্ষণ নয়, দূরবীক্ষণের পালা।—বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সুলেখা নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বারীন বলে—জীবনে ভুল-ভ্রান্তি তো কতই করেছি। সে-সব নিয়ে না ভাবাই ভালো। প্রখর স্মরণশক্তি অনেক সময়েই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।···ভুলতে পারাও একটা বড় ক্ষমতা মানুষের।

সুলেখা নির্বাক হয়ে ওর কথা শোনে।

আগের কথার সূত্র ধরে বারীন বলে—তবে জীবনে এক একটা milestone—দিক-চিহ্ন থাকে। যা মানুষ চিরদিন সস্নেহে আঁকড়ে ধরে রাখে। যা পাইনি, তা নিয়ে আজ আর আপশোষ নেই—যা পেয়েছি, সে-ঋণও তো শোধ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়ে বারীন। সেটা লক্ষ্য করেই সুলেখা বলে—বেশি পরিশ্রম এখন আপনার আর সহ্য হবে না।···রাত জেগে নিশ্চয়ই লেখাপড়া করছেন।

—না, আপনার চোখকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

—ফাঁকি দেবার চেষ্টা না করাই ভালো। সুলেখা হাসির ছলে উত্তর দেয়ঃ কাউকে ফাঁকি দিতে গেলে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ফাঁকির জালে জড়িয়ে পড়তে হয়।···তাই নয় কি?

বারীন অন্য কথা তোলে। স্মিত হেসে বলে—তা চলে যাবার আগে বইটা শেষ করে যেতে হবে তো, একটু পরিশ্রম না করলে তাড়াতাড়ি শেষ হবে কি ভাবে?

কথাটা শুনে সুলেখার মুখ কালো হয়ে যায়। জোর করে মুখে হাসি এনে বলে—আপনিও দেখছি এখন পেসিমিস্টিক—নৈরাশ্যবাদীদের মত কথা বলতে শুরু করেছেন।...চলে যাবার মত কি হয়েছে আপনার ?

—চলে সবাইকেই যেতে হবে একদিন, কথাটা মেনে নেওয়ার মধ্যে কোন পেসিমিজম নেই!—বারীন হেসেই উত্তর দেয়ঃ তা নিয়ে তুঃখ করাই হল পেসিমিজম। তাই নয় কি ?

তু'জনে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বারীন যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলে যায়—মৃত্যুর পটভূমিকাতেই তো জীবনের মূল্যায়ন...মৃত্যু আছে বলেই না জীবন এমন সুন্দর—মাধুর্যময়।

বারীন আজ যেন একটু বেশি কথা বলছে।—আর কথা বলবেন না। আর একদিন এসে আপনার কথা শুনবো।

সুলেখার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বারীন বলে—চিন্তার কিচ্ছু নেই—আমি ঠিক ভালো হয়ে উঠবো।

বারীন আশ্বাস দিলেও চিন্তা দূর হয় না সুলেখার। না, ডাঃ মুখার্জীকে একবার দেখিয়ে নেওয়া দরকার।

কিন্তু বাণী অফিস থেকে ফিরতে আজ এত দেরি করছে কেন!

বাণীর কথা ভাবতে ভাবতেই বাণী এসে গেল। বিকেলবেলায় বারীনকে ঐভাবে বালিসে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে থাকতে দেখে সে-ও চিন্তিত হয়ে পড়ে।

—শরীর খারাপ লাগছে নাকি বাবা ?

—না।—বারীন মেয়েকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে বলেঃ একটু ক্লান্ত লাগছে, তাই আজ আর বেড়াতে বের হইনি।

বাণী বাবার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কি ভাবতে ভাবতে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

কাপড়-জামা বদলে হাত-মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ বাদেই আবার এসে ঘরে ঢুকলো।

বালিসে হেলান দিয়ে বারীন তখনও খাটের উপর বসে ছিল। বাণী

কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে এখন কি খেতে দেব বাবা? চা, না ওভালটিন?

—কিচ্ছু না। কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না এখন।

চা খেতেও ইচ্ছে করছে না—নেশার জিনিসও খেতে চাইছে না! সুলেখা চিন্তিত হয়ে পড়ে।

—তোমরা চা খেয়ে নাও।—বাণীকে লক্ষ্য করে বারীন বলে: তারপর পার তো ঐ গানখানি শোনাও।

বাণী প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে থাকে বারীনের দিকে। বারীন বলে —ঐ যে তুমি সেদিন কিনে আনলে—

"এই কথাটি মনে রেখো,
তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥..."

গানের পদগুলি আবৃত্তি করতে গিয়ে হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল বারীন।

—চা-ও খাবে না বাবা?—বাণীর কথায় যেন সজাগ হয়ে উঠল সে।

—শরীরটা কি বেশি খারাপ বোধ করছো?...ডাক্তার কাকাকে একটা টেলিফোন করে আসি।—বলেই বাণী আস্তে বেরিয়ে যায়। পাশের বাড়িতে গিয়ে ডাঃ মুখার্জীকে ফোন করে।

বেশি দেরি করলো না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই আবার ফিরে এল বাণী। এসে সুলেখাকে লক্ষ্য করে বললে—হ্যাঁ, কাকা এখুনি এসে দেখে যাবেন।—দৃষ্টিটা বারীনের দিকে ফিরিয়ে বললে—তুমি ততক্ষণ শুয়ে শুয়ে গান শোন।—বলেই বাণী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তন্ময় হয়ে গান শুনছিল বারীন। গানটি শেষ হতে না হতেই ডাঃ মুখার্জী এসে ঘরে ঢুকলেন।—গান শুনছিলেন? গুড্।—বারীনের দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হেসে ডাঃ মুখার্জী বললেন—হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে গান ওষুধের মত কাজ করে।

তারপর নানাভাবে বারীনকে পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন—বুকে সামান্য কনজেস্‌শন আছে। সঙ্গে একটু টেম্পারেচারও দেখছি।...হার্ট

ব্লাডপ্রেসার সবই ঠিক আছে। জেনারল্ উইকনেসটাই বড্ড বেশি।—একটু চুপ করে থেকে বারীনকে জিজ্ঞেস করেন—রাত জেগে পড়াশুনা করছেন না তো?…ডাক্তারের সঙ্গে একটু কো-ওপারেট করুন।—বলেই হেসে ফেলেন।

ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর পক্ষে কো-ওপারেট করা কি সহজ কথা!—বলে বারীনও হেসে ফেলে। হাসিটাও কান্নার মত ছোঁয়াচে।

ডাক্তার খসখস করে প্রেস্‌ক্রিশন লিখে বাণীর হাতে দেন। বললেন—কাল থেকে একটা করে এই ইনজেক্‌শনটা দিতে হবে…তুটো ইন্‌জেকশন পড়লেই অনেক ভালো বোধ করবেন।…

ডাক্তারের কথা শুনেও বাণী নিশ্চিন্ত হল না। গম্ভীর হয়েই বসে ছিল। তাকে লক্ষ্য করে ডাক্তার হঠাৎ বলে উঠলেন—একি তুমি এখনও চুপচাপ বসে আছ, আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করবে না?

বাণী চেষ্টা করে একটু হাসলো। তারপর আস্তে উঠে বেরিয়ে গেল।

চা খেয়েই ডাঃ মুখার্জী উঠে পড়েন। কাজের মানুষ কতক্ষণ আর বসে থাকতে পারেন।

ডাক্তার চলে গেলে বাণী বারীনের খাবার নিয়ে এল—টোস্ট আর মুরগীর সুপ্।

হ্যাঁ, ডাক্তার আজ হালকা খাবারই দিতে বলে গেছেন।

বারীনের খাওয়া হয়ে গেলেই সুলেখা বললে—আমি তাহলে যাই এখন? বাড়িতে গিয়ে দেবব্রতকে বরং পাঠিয়ে দেব—রাত্রে একজন বেটাছেলে থাকা দরকার।

বারীন অমনি প্রতিবাদ করে—নাঃ, আপনারা মেয়েরা দেখছি, এখনও সাম্যবাদে বিশ্বাস করেন না।…বাণীই আমার পাঁচ ছেলের সমান।…দেবব্রতকে পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া আমি তো এখন ভালই আছি। শুধু শুধু বেচারীকে কষ্ট দেওয়া কেন?

সুলেখাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে বাণী বলে—আমি আজ বাবার ঘরেই শোব।

—বাবাকে পাহারা দেবে? কিন্তু—কথাটা অসমাপ্ত রেখেই বারীন চুপ করে যায়।

ওর কথার কোন উত্তর দেয় না বাণী। সুলেখাকে লক্ষ্য করে বলে—পাশের বাড়িতেই তো টেলিফোন আছে, দরকার পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবো।

সুলেখা কিছুটা আশ্বস্ত হল কথাটা শুনে। বলে—হ্যাঁ, দরকার হলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে।

বাণী বারীনের খাটের উপরই বসে ছিল। মেয়ের মুখের দিকে একটা সস্নেহ দৃষ্টি মেলে বলে—আজ বুঝি তুমি লেখাপড়া করবে না?···বাবাকে আগলাবে? তাই না?···চলে যাবার সময় হলে কেউ কি আগলে রাখতে পারে মা?

কথাটা শুনে বাণীর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। কান্না জড়ানো গলায় বলে—তুমি ওসব কথা কেন ভাবছো বাবা? তোমার এমন কিহয়েছে?

—না, আমার নিজের কথা বলছি না। ওটা একটা জেনার‍্যালাইজেশন্—বলে বারীন ম্লান হেসে: সবকিছু নিয়ে জেনার‍্যালাইজ্ করা তোমার বাবার একটা মুদ্রাদোষ বলতে পার।

বারীনের কথাবার্তার ধরন আজ মোটেই ভালো লাগছে না সুলেখার। রাত হলেও তাই উঠতে ইচ্ছে করছিল না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বাণী চমকে ওঠে।—এবার ঘুমের ওষুধটা দেই বাবা?

—দেবে?—দাও।—অনিচ্ছা সত্ত্বেই যেন রাজী হয় বারীন।

ওষুধ খেয়ে ঢকঢক করে গেলাসের সবটুকু জল খেয়ে সে মাথাটা আবার এলিয়ে দেয় বালিসের উপর: ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল।

—এতক্ষণ বলনি কেন?

—বুঝতে পারিনি। এই তো খানিক আগেই এক গেলাস জল খেয়েছি। গলাটা আজ কেন যেন বারে বারে শুকিয়ে আসছে।

ঘরের জোরালো আলোটা নিভিয়ে সবুজ বাল্‌বটা জ্বালিয়ে দিলে সুলেখা। বারীন তখনও খাটের বাজুতে বালিসে হেলান দিয়ে বসে ছিল:

—ওকি, এখুনি আলো নিভিয়ে দিলেন?

—ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন।—সুলেখা বলে: এখন শুয়ে পড়াই তো উচিত।

—হ্যাঁ, এখন শুয়ে পড়াই উচিত। ডাক্তারও তাই বলে গেছে—ভালো ঘুম হলেই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবো।

বারীন শুয়ে পড়ে।

বাণীও উঠে আচমকা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বারীনের খাটের পাশে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সুলেখা। তারপর আস্তে তার হাতখানি স্পর্শ করে বললে—যাই তাহলে? আরো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সুলেখা বলে—কাল এসে নিশ্চয় অনেক ভালো দেখবো।

—হ্যা, ভাববার কিছু নেই, I will come out of the woods—আমি ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবো।—বারীন আশ্বাস দেয়।

কিন্তু সুলেখা দারুণ একটা উৎকণ্ঠা নিয়েই সে রাত্রে বাড়ি ফেরে।

বাবাকে আগলাবে?···চলে যাবার সময় হলে কেউ কি আগলে রাখতে পারে মা?—বাণীর বাবা বলেছিলেন বাণীকে।

বাণীও পারেনি তার বাবাকে আগলে রাখতে। পাশেই তো ক্যাম্পখাটে শুয়ে ছিল। বাবা অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন—ঘুমের মধ্যে কখন যে চলে গেলেন সে টেরও পেল না।

বাবা চলে গিয়ে জীবনটা যেন শূন্য হয়ে গেছে বাণীর। এত শূন্যতা নিয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে?

একদিন একদিন করে একটা মাস পেরিয়ে গেল। কিন্তু বাবা যে চলে গেছেন একথাটা বাণী এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। ··মাসীমা ওকে তাঁদের বাড়িতেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বাণীই যেতে রাজী হয়নি। বাবার স্মৃতিতে ভরা এই বাড়ি থেকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকার কথা মনে হলেই যেন বাবাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে মনে হয়।

মাসীমা তাই দিন কতক ওর কাছেই ছিলেন।

ছুটির মেয়াদ ফুরালে বাণী আবার অফিসে যেতে শুরু করেছে। অফিসে কাজকর্ম নিয়ে থাকলে তবু কিছুটা সময় সব ভুলে থাকা যায়।

শরীরে কুলালে মাসীমা অবশ্য সন্ধ্যের দিকে মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যান বাণীকে। দেবব্রতবাবু তো প্রায়ই আসেন।

বাবার লাইব্রেরি ঘরটি তিনি নতুনভাবে সাজিয়ে নতুন একটি লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করেছেন। দেওয়ালের গায়ে নতুন এক শেলফ তৈরি করিয়ে বাবার বাক্স ভর্তি বইগুলি সাজিয়ে রেখেছেন সুন্দরভাবে। অনেকগুলি তাক তাতে। আরো প্রায় দু তিনশ বইয়ের জায়গা আছে। সাজানোর ধরণটাও ওস্তাদ লাইব্রেরিয়ানের মতন।

বাবার অসমাপ্ত বই দু'খানি সম্পূর্ণ করার জন্যে তিনি এখন উঠে-পড়ে লেগে গেছেন। এসেই খাতাপত্তর নিয়ে বসে যান। লেখার ব্যাপারে বাণীর উপরেও খানিকটা দায়িত্ব এসে পড়েছে বইকি!

—সব কাজ ফেলে এখন তোমার বাবার বই দু'খানি সম্পূর্ণ করে ফেলা দরকার—বাংলা সাহিত্যের এটি হবে এক অমূল্য সম্পদ।—বাণীকে লক্ষ্য করে দেবব্রতবাবু বলেন। ওঁর উৎসাহ দেখে বাণীও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, বাবার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করাই এখন ওর প্রধান দায়িত্ব।

দেবব্রত এলেই ও তাই সব কাজ ফেলে খাতাপত্তর নিয়ে বসে যায় এবং তাঁর নির্দেশমত বিভিন্ন জার্নাল থেকে তথ্য যোগাড় করে ওঁর হাতে এগিয়ে দেয়।

লিখতে বসে অনেকদিনই সময়ের কথা ভুলে যায় ওরা। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে দেবব্রত খাতাপত্তর গুটিয়ে উঠে পড়েন। বলেন—হ্যাঁ, এবার যেতে হয়—অনেক রাত হয়ে গেছে।—বলেই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যান। বাণীর অনুরোধ সত্ত্বেও ডিনার সেরে যেতে রাজী হন না। মাসীমা নাকি ওর জন্যে খাবার নিয়ে বসে থাকেন। উনি বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত নিজেও খাবেন না।

হ্যাঁ, মনটা মাসীমার আজকাল বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। মাথার সব চুলগুলো তো এই অল্প দিনের মধ্যে সাদা হয়ে গেছে। কাজকর্ম করতে ওঁর এখন বেশ কষ্ট হয়। প্রায়ই তো কলেজ থেকে ছুটি নিচ্ছেন। তবু কষ্ট করে মধ্যে মধ্যে দেখতে আসেন বাণীকে। কি গভীর স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বাণীর দিকে! আনন্দে-দুঃখে বাণীর চোখে জল আসে।

মাসীমা অবশ্য বেশিক্ষণ বসেন না।—না আর দেরি করবো না।

বাড়িতে গিয়ে বরং শুয়ে পড়ি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাসীমা চলে যান—ধীর-মন্থর গতি।

ওঁর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে যায় বাণীর।

সম্প্রতি নতুন একটা কাজ পেয়েছে বাণী। কাজটা সাংবাদিকের। ও যে আবার কোন দিন সংবাদপত্রে লিখতে পারবে, আগে বুঝতে পারেনি।

উৎসাহটা ওর যুগিয়েছেন দেবব্রতবাবুই। একদিন বিকেলে আনন্দে টগবগ করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন।—কনগ্র্যাচুলেশন। উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে বাণীর হাত ধরে একটা ঝাকুনি দিয়ে বললেন—না, তোমাকে আর রোখা গেল না। এখন থেকে দেখছি তোমাকে সমীহ করেই কথা বলতে হবে।

—কি রকম?—প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে বাণী।

দেবব্রতবাবু বলেন—যুগান্তর পত্রিকার এক জার্নালিস্ট তোমার লেখার দারুণ প্রশংসা করছিলেন।···তুমি দেখছি এখন একজন স্বনামধন্য জার্নালিস্ট হয়ে উঠেছ।

—আমাকে জার্নালিস্ট বলে ঐ ভদ্রলোক নিশ্চয় ঠাট্টা করেছেন। জার্নালিজমের আমি কি বুঝি?

প্রথমে অনেকে অনেক কিছুই বোঝে না। সব কিছুই grow করে। কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লেই মানুষ ক্রমশঃ কাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

একটু থেমে আগের কথার জের টেনে বলেন—পাভলভ যখন পরিপাকগ্রন্থির গবেষণার জন্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন, তখন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তাকে পাত্তা দেননি। এবং 'Conditioned Reflex' নিয়ে নানা বিদ্রূপ করেছেন।···ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে সহজ হলেও এটা প্রমাণ করতে পাভলভকে অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাই পাভলভকে অনেক বিজ্ঞানীই মস্তিকাশ্রিত মনোবিদ্যার জনক বলে অভিহিত করেছেন।

—কার সঙ্গে কার তুলনা!···আমাকে আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

—তোমার বিনয় সত্যি প্রশংসনীয়।—দেবব্রতবাবু বলেন।

—বেশি প্রশংসায় মাথা বিগড়ে যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—নগদ পাওনা বেশি পাওয়া ভালো নয়—তাতে মানুষ শেষকালে দেউলে হয়ে পড়তে পারে।

—নিঃসন্দেহে দামী কথা।···কিন্তু ও সব তর্ক রেখে তোমার নতুন লেখাটার কতদূর হল বল।

অনুপের পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেছে বাণী। বাবা চলে যাবার পর ও এ বাড়িতে আসা একরকম বন্ধ করেই দিয়েছে। দু'দিন নাকি এসে ফিরে গেছে। কথাটা বামুনদির কাছেই শুনেছে। বাণীর শোবার ঘরে ব'সে দেবব্রতবাবু আর বাণী তখন নাকি চা খাচ্ছিল।···কিন্তু বাণীর ঘরে না গিয়ে অনুপ এসেই চলে গেল কেন? অদ্ভুত কমপ্লেকস্—সেরেফ কমপ্লেকস-এ ভুগছে। ছেলেটার জন্যে সত্যি শুধু দুঃখ নয়, রাগও হয়। বাবা নেই। এখন বাণীর সঙ্গে ওর এই রকম ব্যবহার করা কি উচিত হচ্ছে!

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত বাণী নিজেই একদিন দেখা করতে গেল অনুপের সঙ্গে। অফিস ছুটি ছিল। সকালে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল সে। রোদ ওঠার আগেই ফিরে আসতে পারবে।

ছুটির দিন হলেও অনুপ সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। খাতাপত্তর নিয়ে এর মধ্যেই লিখতে ব'সে গেছে। মিতা ঘরে ছিল না। রান্নাঘরে রান্নাবান্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল হয়তো।

—আসতে পারি? মামুলি একটা প্রশ্ন করেই অনুপের ঘরে ঢুকে পড়ে বাণী।

বাণীকে দেখে বিস্ময়ে যেন অবাক হয়ে গেল অনুপ। নির্বাক হয়ে ওর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললে—তুমি! কি মনে করে?

কথার ধরন দেখে বাণী একটু ক্ষুণ্ণ হয়।—তোমাদের খবর নিতে এলাম। এই আর কি।—একটু থেমে বললে—আমাদের ওদিকে আর যাও না কেন?

অনুপ চট করে উত্তর দিলে না। একটু কি যেন ভাবলো তারপর ঠাট্টার ছলে বললে—অনর্থক তোমাদের গিয়ে বিরক্ত করে লাভ কি।

বাণী স্তম্ভিত হয়ে যায় কথাটা শুনে। কোন উত্তর খুঁজে পায় না। প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। বলে—মিতাকে দেখছি না যে।

—রান্নাঘরে গেলেই দেখতে পাবে।

—বাণী ইচ্ছে করেই ওর কথায় কান দেয় না। বলে—খাতাপত্তর নিয়ে বসেছ দেখছি, কি লিখছিলে? কবিতা নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, তবে তোমাকে শোনাবার মত নয়।

—আইডিয়াটা জানতে ইচ্ছে করছে।

—জানাতে আপত্তি নেই।—অর্থপূর্ণ হাসি হেসে অনুপ উত্তর দেয়ঃ কিন্তু শুনে খুশি হবে না।

—শুনতে দোষ কি? খুশি হওয়া, না হওয়া তো পরের কথা।

—কবিতার নাম "রোদনভরা এ বসন্ত"।—নামটি অর্থবহ শুনেই বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়।

—দেখি।—বাণী কবিতাটা দেখার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়।

—না। দেখার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি তো 'ছাইভস্ম' বলে ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দিতে বলবে।

বাণীর বড় দুঃখ হয় ওর কথাগুলো শুনে। বাণীকে ও এখন আর ওর কবিতা দেখাতে চায় না। অথচ এমন দিন ছিল যখন কবিতা লিখে সে প্রথমেই ছুটে যেত তার কাছে।...

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বাণীর বুক থেকে।

সেটা লক্ষ্য করেই অনুপ হয়তো একটু লজ্জা পেল। বললে—রাগ কোরো না। এই যে দেখ।—বলেই ওর লেখা নতুন কবিতাটি এগিয়ে দিলে বাণীর হাতে।

লেখাটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই বাণী ফিরিয়ে দিলে অনুপকে। একটু চুপ করে থেকে বললে—এই ধরনের কবিতা কেন লিখছো অনুপ?

অনুপের মুখ ব্যথায় ম্লান হয়ে যায় এক মুহূর্তে।—কেন লিখছি, তুমি কি জান না?

—না, জানার আমার কোন প্রয়োজন নেই।...কিসের অভাব

তোমার? কি পাওনি যে তা নিয়ে অনর্থক দুঃখ করছো? –যা ছিল, তা তো হারাওনি।

কথাগুলো শুনেও অনুপের মুখে হাসি ফুটলো না—গুম হয়ে বসে রইল।

বাণী উঠে পড়ার কথা ভাবছে, ঠিক তখুনি মিতা ট্রে করে চা-জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। হেসে বলে—আমি তোমাকে আসার সময়েই দেখতে পেয়েছি।

অনুপের ভাবান্তর সে লক্ষ্যও করলে না। বাণীর দিকে চেয়ে বললে —গরম গরম খানকতক আলুর কচুরি ভেজে নিয়ে এলাম, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।

ট্রেটা টিপয়ে নামিয়ে রেখে বাণীর গা ঘেঁষেই বসে পড়লো মিতা। —কতদিন একসঙ্গে বসে চা খাইনি বাণীদি।—স্মিত হেসে মিতা বললে। বলেই চায়ের কাপে চা ঢালতে লাগলো।

মিতার মিষ্টি ব্যবহারে বাণীর মনটা হালকা হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। এমন বউ পেয়েও অনুপ সুখী হতে পারছে না!

অরবিন্দ কিন্তু তার বন্ধুত্ব আগের মতই বজায় রেখেছে। ফাঁক পেলেই ছুটে আসে বাণীদের বাড়িতে। তা ছাড়া, ওর পত্রিকায় লেখার জন্যে প্রায়ই এসে বাণীকে তাগাদা দিয়ে যায়। বলে—আমাদের পত্রিকার জন্যেও একটু সময় দাও। তোমরা সবাই নজর না দিলে এসব পত্রিকা বাঁচবে কি করে?

সময় দিতে না পারলেও ওর কথা শুনে মনটা খুশি হয়ে ওঠে বাণীর। তা ও বেচারা সত্যি মহাহাঙ্গামার মধ্যে আছে। হাঙ্গামা মানসীকে নিয়েই। মানসীর বাচ্চা হবে, কেসটা নাকি তেমন সহজ মনে হচ্ছে না। মনটাও কেন যেন বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে মানসীর। কোথাও একলা বেরুতে চায় না, ভয় পায়। ছুটিতেই আছে।

বাধ্য হয়েই অরবিন্দকে এখন ব্যারাকপুরের এক কারখানায় কাজ নিতে হয়েছে—উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে।…অসাধারণ স্প্রিট—মনোবল বলতে হবে।

দেবব্রতবাবুর সঙ্গে এর মধ্যে ওর বেশ ভাব জমে উঠেছে। মনের মধ্যেও ওর কোন কমপ্লেকস্ নেই অনুপের মত।

সন্ধ্যেবেলায় সেদিন নিজের ঘরে বসে চা-জলখাবার খেতে খেতে দেবব্রতবাবুর সঙ্গে গল্প করছিল বাণী। এমন সময় অরবিন্দ এসে ঘরে ঢুকলো ঝড়ের মত।—তাই বল, আমাদের ফাঁকি দিয়ে এখানে বসে চুপি-চুপি তোমরা ডানহাতের কাজ সারছো।—বাণীকে লক্ষ্য করে রসিকতার ছলেই বলে।

দেবব্রতবাবু অমনি হেসে উঠলেন হো হো করে।—তা যা বলেছেন, লুকিয়ে খাওয়ার স্বাদই আলাদা।

—বোস, বোস। তুমিও শেয়ার কর—ভাগ নাও।—বাণী হেসে বলে।

অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে খাটের উপর বাণীর পাশেই বসে পড়ে।—দাও, আগে চা-টা খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেই।

নিজের জন্যে সবে চা ঢালছিল বাণী, সেটা অরবিন্দর হাতে এগিয়ে দিয়ে বলে—যাই, বামুনদিকে আরো খানকতক পরোটার কথা বলে আসি, এক আধখানা পরোটায় তো তোমার পেট ভরবে না।

—তা যা বলেছ, যাও চট করে বলে এসো। খেয়েই পালাতে হবে আজকে। মানসীটা আজকাল বড্ড ছিঁচকাঁদুনে হয়ে উঠেছে। ফিরতে একটু দেরী হলেই ধরে নেয়, আমার বুঝি কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

বাণী আর দাঁড়ায় না। রান্নাঘরে গিয়ে বামুনদিকে পরোটার অর্ডার দিয়ে আসে।

দেবব্রতবাবুর সঙ্গে অরবিন্দ ততক্ষণে রাজনীতি আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে বলে—নাভিশ্বাস, বুঝলেন দেবব্রতবাবু। ধনবাদের এখন নাভিশ্বাস উঠেছে—দি ক্যাপিট্যালিস্ট ইকনমি ইজ্ অন্ ইটস্ লাসট্ লেগস্—তাই তো এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদীরা।

—বক্তৃতা রেখে আগে খেয়ে নাও তো।—ওর কথার মাঝখানেই বাণী বলে ওঠে; চা-টা যে জল হয়ে গেল। এক চুমুকে চাটা খেয়ে নেয় অরবিন্দ।

বামুনদি ততক্ষণে পরোটা দিয়ে গেছেন। মৃদু হেসে অরবিন্দ খাবারের থালায় হাত দেয়।

খাওয়া হয়ে গেলেই অরবিন্দ যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে—বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল তার।

বাণীও আর বাধা দিল না, অনেকদূর যেতে হবে ওকে।

অরবিন্দ চলে গেলে দেবব্রত বাণীকে জিজ্ঞেস করে—এখন কি লিখছো?

—সব সময় লেখা নিয়ে থাকতে কি ভালো লাগে?…আমি তাই আজকাল অনেকটা সময় গান নিয়ে কাটাই। বাণী উত্তর দেয়।

—তা ভালো, মনটা তাতে প্রফুল্ল থাকে। দেবব্রতবাবু বলেন: গান গঙ্গাস্নানের আনন্দ দেয়।

—বেশ তো গানই শোনা যাক এখন।…কি গান শুনবেন বলুন?

—রবীন্দ্রসঙ্গীত।…গান বলতে আমি ঐ রবীন্দ্রসঙ্গীত বুঝি—শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাথামুণ্ড কিছুই বুঝি না।—দেবব্রতবাবু বলেন। বাণীও রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত! খুশি হয়ে সে রবীন্দ্রনাথের একখানি গান চড়িয়ে দিলে রেকর্ডে—"যদি প্রেম না দিলে প্রাণে।…"

একাগ্র হয়ে দুজনে একটার পর একটা গান শোনে—কোন কথা বলে না।

খানিকবাদে দ্বিতীয় বার চায়ের পাট সারা হলেই দেবব্রতবাবু যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বলেন—আজ আর দেরি করবো না। কাকীমার শরীরটা তেমন ভালো নেই।…ভাবছি, ওঁকে নিয়ে দিন কতক কোথাও থেকে ঘুরে আসবো। তুমিও যদি যাও—

বাণী কোন উত্তর দেয় না। উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই দেবব্রত উঠে পড়েন।—চলি।

বলেই বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। বাণী যে একলা সেই একলা। মাসীমাকে নিয়ে দেবব্রত বাইরে যাবেন হাওয়া বদলাতে।

ওরা চলে গেলে বাণী আরো একলা হয়ে পড়বে। দুঃসহ এই নিঃসঙ্গতা কি দিয়ে পূর্ণ করবে সে!

একটি একটি করে দীর্ঘ পাঁচ মাস কেটে গেল। বাবা তবু ফিরে এলেন না, কোন দিনই আর ফিরে আসবেন না! কথাটা যেন, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না বাণীর।

জগত-সংসারের সবই তো আগের মত ঠিক আছে। শুধু সেই সবচেয়ে আপনার কাছের মানুষটিই নেই।

সন্ধ্যেবেলায় নিজের শোবার ঘরে চুপচাপ বসে ছিল বাণী। বিকেলের দিকে জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—বৃষ্টি বলে বৃষ্টি! রাস্তায় জল জমে যাবার যোগাড় হয়েছিল। বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশটা কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন হয়েই আছে। এই মেঘ-বাদলার মধ্যে কেউ নিশ্চয় আজ আর ঘর থেকে বের হবে না।

মেঘলার দিনে একলা ঘরে মনটা যেন আরো হু হু করে। দেবব্রত এলে তবু কিছুটা সময় অন্যমনস্ক থাকা যেত। কিন্তু ওর পক্ষে আসা আজ অসম্ভব। কাছে-পিঠে বাড়ি হলে তবু একটা কথা ছিল।

অনুপ তো এদিকে আসাই বন্ধ করে দিয়েছে। বই-পত্তর নিয়ে আজ আর বসতে ইচ্ছে করছে না বাণীর।

আস্তে উঠে গ্রামোফোনে সেই বর্ষার রেকর্ডখানি চড়িয়ে দিলে—

"মন মোর মেঘের সঙ্গী,
উড়ে চলে দিগদিগন্তের পানে···"

একলা থাকলে আজকাল বাণী প্রায়ই বসে বসে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনে। একটা কিছু নিয়ে তো নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে হবে।

বামুনদি রান্নাঘরে তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বাণী খাটের উপর বসে গান শুনছিল নিবিষ্টমনে। হঠাৎ দোরগোড়ায় দেবব্রতবাবুকে দেখে চমকে উঠল সে।

কড়া নাড়ার শব্দ সে শুনতেই পায়নি।

—খুব আশ্চর্য হয়ে গেছ দেখছি!—দেবব্রতবাবু বলেন।

—আসুন!—খুশি হয়ে বাণী উত্তর দেয়: এই মেঘ-বাদলার মধ্যে আপনি আসবেন—

কথাটা শেষ না করেই বাণী চুপ হয়ে যায়। গানটাও তখুনি শেষ হয়েছে।

খাটের পাশে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে বসে পড়লেন দেবব্রতবাবু।

—বন্ধ করলে কেন? আর একখানি গান শোনাও।—একটু থেমে বললেন—ঐ গানটা নেই তোমার স্টকে?

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।..."

দেবব্রতবাবুর ফরমাশ মত অনেকদিন আগে কেনা ঐ রেকর্ডখানি বের করে ফেললো বাণী।

—দাও, আমি বাজাচ্ছি, তুমি বরং চায়ের কথা বলে এসো।

—বলার আগেই বামুনদি নিশ্চয় চা তৈরী করে ফেলেছেন।—বলে বাণী রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

যা ভেবেছিল, শুধু চা নয়, বামুনদি মোগলাই পরোটাও ব্যবস্থা করে ফেলেছেন এর মধ্যে। দেবব্রত এলে বামুনদিও আজকাল খুশি হয়ে ওঠেন। মানুষ না হলে কি মানুষ থাকতে পারে কখনো!

ট্রে করে চা-খাবার বাণী নিজেই নিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। অযথা কেন আর ঐ মহিলাকে কষ্ট দেওয়া।

গানটা তখন শেষ হয়েছে। চা-খাবারের ট্রে বাণী টিপয়ে দেবব্রতর সামনে নামিয়ে রেখে বললেন—দেখলেন তো, আমার বলার আগেই চা-খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। বামুনদি দারুণ অতিথিবৎসল—আমার মতন নন।

—বলেই খাটের উপর দেবব্রতর মুখোমুখি হয়ে বসে পড়লো বাণী। কাপে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলে—আর গান শুনবেন না?

—এখন কিছুক্ষণ তোমার কথাই শোনা যাক।...গানে তোমার কণ্ঠস্বর তো ডুবে যাবে।

চায়ের কাপ দেবব্রতর দিকে এগিয়ে দেয় বাণী। কোন কথা বলে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে দেবব্রত বলেন—কি ভাবছো এত?

নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বাণী বলে—রেঁামা রোলার একটা উপমা হঠাৎ কেন যেন মনে পড়ে গেল। জঁা ক্রিস্তভ্-এ সেই যে একটা স্টেশনে দুই বিপরীতগামী ট্রেনের কামরায় এ্যান্টোনাইট এর সঙ্গে ক্রিস্তভের হঠাৎ দেখা হয়েছিল। ওদের দুজনার সেই হঠাৎ মুখোমুখি

দেখাটাকে লেখক বিশ্বপরিক্রমার পথে দু'টি গ্রহের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়।

দেবব্রত স্তব্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন—কি যেন ভাবেন। আগের কথার সূত্র ধরে বাণী বলে—তারপর ক্ষণিকের সেই সাক্ষাৎকারের পর গ্রহ দু'টি কিন্তু আবার মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যায় চিরদিনের মত।

দেবব্রতর হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গে। বাণীর মুখের উপর একখানি পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে বলেন—কিন্তু গ্রহ দু'টি তো কখনো আবার হঠাৎ একই কক্ষপথে এসে পরস্পরের আকর্ষণে যুগ যুগ ধরে নিজেদের প্রদক্ষিণ করে চলতে পারে—পরস্পরের আকর্ষণ কাটিয়ে তখন আর মুক্তির উপায় থাকে না তাদের।

খাবারের প্লেট দেবব্রতর সামনে এগিয়ে দিয়ে বাণী কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল।

দেবব্রত হঠাৎ বলে ওঠেন—একি, তুমি হাত তুলে বসে রইলে কেন? —তুমিও শেয়ার কর।

পরোটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাণী অন্য কথা তোলে। বলে—মাসীমা এখন কেমন আছেন?…এই মেঘ-বাদলার দিনে আপনাকে আসতে দিলেন ?

—দিলেন মানে ? দেবব্রত বলেন ঃ তিনিই তো জোর করে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। বাদলার দিনে একা একা তোমার মন কেমন করছে, তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

—আপনি আসতে আপত্তি করেছিলেন বুঝি ? বাণী হেসে বলে।

—কি মনে হয় ?—দেবব্রত অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন বাণীর দিকে। মুখে অনুগের হাসি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—অভ্যাসটা সত্যি বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, একদিন দেখা না হলেই মনে হয়—

বাণী মুখ নীচু করে থাকে। কোন কথা বলে না।

চায়ের পর্ব তখন শেষ হয়েছে। দেবব্রত বলেন—কাকীমাকে নিয়ে দিনকতক মধুপুর থেকেই ঘুরে আসবো ভাবছি।…তোমার যেতে আপত্তি নেই তো ?

—আপত্তি থাকলেই বা কি?···আমাকে ফেলে আপনারা কি যেতে পারবেন ?—বাণী হাসির ছলে বলে।

—ঠিক আছে।

দেবব্রত খুশি মনে চলে যান।

কারখানা থেকে বাড়ি ফিরতেই সন্ধ্যে উতরে গেল অরবিন্দর। মানসী পথের দিকেই তাকিয়ে ছিল। অরবিন্দকে দেখেই বলে উঠল—এত দেরি হল যে ?···চা খাবে না ? না।—বাণীদের ওখানে গিয়েছিলাম। সেখানেই—

অরবিন্দর কথা শেষ না হতেই মানসী বলে ওঠে। বাণীদি ভালো আছে তো ?

অরবিন্দ হেসে ফেলে। মানসীর কি যে হয়েছে আজকাল। একটুতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।—ভালো না থাকার কি হয়েছে!

—বা, একা একা থাকে বেচারী।

—ওর জন্যে চিন্তা কোরো না। ··অত্যন্ত স্বাবলম্বী মেয়ে।

—আর আমি বুঝি।—মানসী ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান জানায়। মুখ কালো করে উঠে পড়ে। যাই, রান্নাটা সেরে ফেলি।—বলেই শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আশ্চর্য ব্যাপার এমনিতে বাণীদি বলতে অজ্ঞান, কিন্তু অরবিন্দর মুখে ওর প্রশংসা শুনেই মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। স্বামীর মুখে মেয়েরা হয়তো অন্য মেয়ের প্রশংসা সহ্য করতে পারে না।···

অরবিন্দ তার খাতাপত্তর নিয়ে বসে। ওয়ার এ্যাণ্ড ডিস্আরম্যামেন্ট—যুদ্ধ এবং নিরস্ত্রীকরণ প্রবন্ধটি দু'চারদিনের মধ্যেই প্রেসকে দিতে হবে। লেখাপড়ার সময় আজকাল খুব কমই পায় অরবিন্দ। যা একটু সময় তা ঐ রাত্রের দিকেই। মানসী ঘুমিয়ে পড়লে সে তাই টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে লেখাপড়া করে। ঘরে জোরালো আলো থাকলে মানসীর ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

পরের দিন সকালে চা খেয়েই বেরুনোর জন্যে তৈরী হচ্ছিল অরবিন্দ। মিষ্টি হেসে মানসী বলে—এত তাড়াহুড়োর কি হয়েছে? আজ তো ছুটির দিন, সাত-সকালে তাড়াতাড়ি কারখানায় ছুটতে হবে না।

মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে অরবিন্দ বলে—স্নান সেরেই আমাকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে, অনেকগুলো অ্যাপয়ন্টমেণ্ট আছে—অনেক জায়গায় যেতে হবে।

—যেখানে ইচ্ছে যাও, কিন্তু না খেয়ে যেও না।—মানসীর গলায় অভিমানের সুর।

—রাগ কোরো না।—অরবিন্দ হেসে উত্তর দেয়ঃ দুপুরে এসে তোমার সঙ্গে সাধ মিটিয়ে গল্প করা যাবে।

—বলেই বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। এখন না বেরুলে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। এবং অরবিন্দ ফিরে না আসা পর্যন্ত মানসী না খেয়ে বসে থাকবে। ছুটির দিন দুপুরে অরবিন্দ ফিরে না এলে মানসী খায় না।

স্নান সেরে বেরুনোর জন্যেই তৈরী হয়ে নিল অরবিন্দ। মানসীও ততক্ষণে জল-খাবার তৈরী করে ফেলেছে। পরোটা, আলুভাজা, সঙ্গে মানসী আজ হালুয়াও করেছে। এমন লোভনীয় খাবার ফেলে যাওয়া যায়!

রান্নাঘরে টেবিলে মুখোমুখি হয়ে বসে খাবার খাচ্ছিল দু'জনে। অরবিন্দর দিকে তাকিয়ে মানসী হঠাৎ বলে উঠল—একটু সুস্থ হয়ে বসে খাও তো—ট্রেন ফেল করবে না।

অরবিন্দ কোন উত্তর দেয় না। খেতে খেতে বলে—হালুয়াটা বেশ হয়েছে।—অরবিন্দ ওকে খুশি করার চেষ্টা করে।

মানসী খুশি হয় বৈকি কথাটা শুনে। বলে—তা-ও তো ডালডার তৈরী। ভাবছি, সামনের মাসে মাইনে পেয়ে এক কৌটো ক্যাভেণ্ডারের ঘি কিনে আনবো। ছুটির দিন সকালে পরোটা, হালুয়াটা ঘি দিয়েই করা যাবে খাঁটি ঘিয়ের গন্ধই আলাদা।

—তা যা বলেছ।—অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে অরবিন্দ বলে। তারপর চটপট খাওয়া সেরে উঠে পড়ে।

যাবার মুখে মানসী বলে—দুপুরে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো কিন্তু।

—ঠিক আছে। মানসীর কথায় সম্মতি জানিয়ে অরবিন্দ বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। মানসী আজকাল মায়ের মতই আগলে রাখতে চায় অরবিন্দকে। নিজের মনে স্নেহের হাসি হাসে অরবিন্দ ঃ মেয়েরা essentially মায়ের জাত।

পরের সপ্তাহ। রবিবার সকালে বাণীদের বাড়িতে আবার বেড়াতে গেল অরবিন্দ।

বাণীকে দেখে অবাক হয়ে যায়। সারা মুখে আশ্চর্য একটা সলজ্জ আনন্দের আভা। প্রাণচঞ্চল একটা ঝরনা হঠাৎ যেন বিস্ময়ে-আনন্দে স্তব্ধ হয়ে সৃষ্টি রহস্যের দিকে তাকিয়ে আছে। বাণীর এই পরিবর্তনটা সম্পূর্ণ নতুন ঠেকলো অরবিন্দর চোখে।

—কি ব্যাপার বল তো? তোমাকে কেমন যেন আনমনা বলে মনে হচ্ছে আজ?

বাণী স্মিত হেসে উত্তর দেয়—জানই তো আমি বরাবরই একটু মুডি —খামখেয়ালী স্বভাবের। বন্ধু-বান্ধব তাই আমাকে অনেক সময়ে ভুল বোঝে।

বাণীর টেবিলের উপর টেলিফোনটার উপর চোখ পড়তেই অরবিন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে ওঠে—টেলিফোন এনেছ দেখছি।

—হ্যাঁ, বাড়িতে টেলিফোনটা আনায় ভারী সুবিধা হয়েছে।

—হ্যাঁ, একটা টেলিফোনের খুবই প্রয়োজন ছিল তোমার। খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে গেছ!

—দেবব্রতবাবুই চেষ্টা-তদ্বির করে ব্যবস্থা করেছেন, তা নইলে আমার পক্ষে—

বাণী কি যেন ভাবে একটু। তারপর বলে—সামনের সপ্তাহে মাসীমাকে নিয়ে দেবব্রতবাবু মধুপুরে যাবেন, মাসীমার শরীরটা বড় ভেঙ্গে পড়েছে—একটু ইতস্তত করে বলে—আমিও ওদের সঙ্গে দিন কয়েক ঘুরে আসবো, ভাবছি।

—গুড্। খুব ভালো কথা।—অরবিন্দ খুশি হয়ে বলে ঃ বাইরে

থেকে একটু ঘুরে আসা তোমারও প্রয়োজন।...মানসী সুস্থ থাকলে আমিও তোমাদের সঙ্গ নিতাম। দিন কয়েক হৈ হৈ করে কাটিয়ে আসা যেত।

—চা দিতে বলি ? —বাণী জিজ্ঞেস করে।

—না, এখুনি পেটপুরে খেয়ে বেরিয়েছি। চায়ের আর জায়গা নেই। —বলেই অরবিন্দ উঠে পড়ে।—তাহলে চলি। অনুপদের ওখানেও একবার ঢু মেরে যেতে হবে। অনেকদিন দেখা হয় না ওর সঙ্গে।

অরবিন্দ বেরিয়ে আসে বাণীদের বাড়ি থেকে।

আর একটু দেরি হলে অনুপের সঙ্গে দেখা হত না। স্নান-ব্রেকফাস্ট সেরে অনুপ তখন বেরুনোর জন্যে তৈরী হয়েছে।

অরবিন্দকে দেখেই বলে উঠল। পাঁচ মিনিটবাদে এলে আমাকে আর ধরতে পারতে না।

—তুমি তাহলে আজকাল পালিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি ? রসিকতার ছলে অরবিন্দ বলে।

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এই রকম ভাব করে অনুপ বলে—হ্যাঁ, এক সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি—

—তা আমরা কি দোষ করেছি ভাই ? আমাদের সিস্টেমেটিক্যালি বয়কট করে চলেছ। মাঝে-মধ্যে আমাদের পত্রিকার জন্যেও কিছু লেখ।

—আমার লেখা তোমাদের পছন্দ হলে তো !

—তা পছন্দমতই কিছু লেখার চেষ্টা কর না ?

—চেষ্টা করে--অন্যের ফরমাস মত কি কবিতা লেখা যায় ?—ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে অনুপ উত্তর দেয়ঃ নিজে যেটা বিশ্বাস করি না, তা নিয়ে কি—

অনুপ তার কথা শেষ করে না। বক্তব্যটা এত স্পষ্ট যে আর বলার প্রয়োজন হয় না।

অরবিন্দ ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারে না। বলে—হ্যাঁ, Peoples poet—জনগণের কবি অনুপ কুমার এখন নির্ভেজাল সাহিত্যের

উপাসক হয়ে পড়েছেন।—একটু থেমে কিছুটা উষ্মার সঙ্গেই বলে ফেলে : ঐ ধরনের লেখা ছেড়ে দাও অনুপ। অনুপের টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে বলে—নিপীড়িত মানুষের ভবিষ্যত—আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কিছু লেখ।

অনুপ তার মুখের সেই বাঁকা হাসি নিয়েই মন্তব্য করে—এটা ময়দানের বক্তৃতামঞ্চ নয়, দরিদ্র এক স্কুল মাষ্টারের স্বল্প পরিসর একটি কামরা, ভুলে যাচ্ছ কেন ?

—হ্যাঁ, দরিদ্র স্কুল মাষ্টারকেও তো আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে সামিল হতে হবে।

অনুপ ওর কথাটা মোটেই আমল দেয় না। ভুলে যাওয়া কথা হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এই ভাবে বলে—তোমাকে চা দিতে বলি ?

—না, থাক, অনেকবার চা খেয়েছি।

অনুপ চুপ করেই ছিল।

অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে অরবিন্দ বললে—বাণীদের ওখানে গিয়েছিলাম! বাণী বাড়িতে টেলিফোন এনেছে···দেবব্রতবাবুই চেষ্টা-তদ্বির করে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বিদ্রূপের হাসি হেসে অনুপ অমনি মন্তব্য করে—নিজের গরজেই করেছেন। যখন-তখন দূরে বসেও বাণীর সঙ্গে গল্প করতে পারবেন।

কথার ধরন দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় অরবিন্দর। সে-ভাবটা যথাসম্ভব গোপন করেই সে উত্তর দেয়—একলা থাকে, একটা টেলিফোনের খুবই দরকার ছিল বাণীর।

অনুপ সে-কথার কোন উত্তর দেয় না। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে—ওদের সব খবর ভালো তো!

—হ্যাঁ, ওরা—মানে বাণী আর দেবব্রতবাবু মাসীমাকে নিয়ে কিছুদিনে জন্যে মধুপুরে বেড়াতে যাচ্ছেন—মানসী ভালো থাকলে আমিও যেতাম ওদের সঙ্গে।—অরবিন্দ বলে।

কথাটা শুনে অনুপের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। একটু সময় চুপ করে থেকে বললে—কিন্তু তুমি গেলে যে ভিড় হয়ে যেত ওদের পক্ষে।··· মাসীমা পাশ কাটিয়ে থাকতে জানেন, কিন্তু তুমি— ।—ঠাট্টার হাসি হেসে

অনুপ বলেঃ ওদের দু'জনার এখন পূর্ব-রাগের পালা চলেছে। জান না?

অরবিন্দর বিরক্ত লাগে অনুপের কথা শুনে। বলে—না, জানার দরকার নেই আমার, অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো আমার স্বভাব নয়।

অরবিন্দর ধমক খেয়ে অনুপ যেন লজ্জা পেয়ে যায়। আমতা-আমতা করে বলে—না, বাণীর সঙ্গে তোমার তো এক সময়ে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল, তাই ভাবলাম—

—ছিল কেন, বন্ধুত্ব এখনও আছে।—অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়। তা, তুমি আজকাল আর ওদিকে যাও না কেন।

—গিয়ে দেখা পেলে তো। কাকাবাবুর মৃত্যুর পর থেকে ঐ ভদ্রলোক সর্বক্ষণ যেন আগলে রেখেছেন ওকে। গিয়ে নিরিবিলি বসে দুটো কথা বলার উপায় নেই।...দু'দিন গিয়ে বাইরের ঘর থেকেই ফিরে এসেছি।

—বাণীর ঘরে যেতে বাধা ছিল?—ঠাট্টার ছলে অরবিন্দ বলে—বাণীর সঙ্গে তোমারও তো এক সময় যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল।

—ছিল, কিন্তু এখন নেই।—রাগের ভাবে অনুপ উত্তর দেয়।

—না, তুমি খুব ভুল করছো অনুপ। বাণীর উপর তোমার আর অভিমান করা ঠিক নয়। বিশেষ করে—

—না, অভিমান কিসের!—আহত-অভিমানে মুখ কালো করে বসে থাকে অনুপ। একটু পরে বলে—যে সম্পর্ক রাখতে চায় না, তার কাছে গিয়ে হ্যাংলামি করার কোন অর্থ হয় না।

কথাগুলো শুনে অরবিন্দর মেজাজ আরো গরম হয়ে ওঠে। একেই বলে প্রপারটি সেন্স—মালিকানাবোধ।...ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

রাগ করেই অরবিন্দ উঠে পড়ে।—চলি।

অরবিন্দ আস্তে বেরিয়ে আসে ওদের বাড়ি থেকে। না, এখানে এসে অনর্থক সে আর সময় নষ্ট করবে না।

গোপালপুরে বেড়াতে যাবার কোন সঙ্কল্প আগে থেকে ছিল না ভূপেশের।

প্রস্তাবটা করলেন ললিতার ছোড়দা। অফিসের কাজে কিছুদিনের জন্যে তিনি ওখানে যাচ্ছেন, ললিতার ছোট বৌদিও সঙ্গে যাবেন। ভূপেশও যদি ললিতাকে নিয়ে ওদের সঙ্গে যায়, হাওয়া বদলালে শরীরটা হয়তো সেরে উঠবে ওদের।

শরীর সত্যি অনেকদিন থেকেই ভালো যাচ্ছে না ভূপেশের। তা শরীরের আর দোষ কি! সমীর যে কেলেঙ্কারী শুরু করেছে তাতে সমাজে মুখ দেখানোই এখন ভার হয়ে উঠেছে ভূপেশের। যূথী তার ছেলেদের নিয়ে চলে যাবার পর থেকে বাড়িটা খাঁখাঁ করছে। ওদের ঘরের দিকে তাকাতে পারে না ভূপেশ। ললিতা তো পারতপক্ষে কথাই বলে না ওর সঙ্গে। আর কথা বলা মানেই ঝগড়া করা—ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা কাটাকাটি।

মেয়েরা স্বামীর চেয়ে ছেলেকে অনেক বেশি ভালবাসে—তা সে ছেলে যত অপদার্থই হক না কেন! রাত্রে বাড়িতে ফেরা তো ছেড়েই দিয়েছে সমীর। যূথীর সঙ্গে 'লিগ্যাল্ সেপারেশন'—হয়ে গেছে।

নিজের বাড়িতেও ভূপেশের নির্বাসিতের জীবন। তার উপর মানসীর জন্যেও একটা দুশ্চিন্তা। শরীরটা নাকি খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে ওর। অসুস্থ শরীর নিয়েই চাকরি করছে, ঘর-সংসারের সব কাজও করে এক হাতে। লোক রাখার সামর্থ্য নেই অরবিন্দ ছোকরার। ভজুয়া কলকাতায় থাকতে মধ্যে মধ্যে তার কাছ থেকে মানসীর খবর পেত। তা ভজুয়া সেই যে ছেলের অসুখের খবর পেয়ে দেশে চলে গেল, আর ফেরার নাম নেই।

কিছুদিন আগে মানসী নিজে থেকেই একদিন ওদের দেখতে এসেছিল। কিন্তু ভূপেশের সঙ্গে দেখা হয়নি। ললিতার কাছে ওর শরীরের কথা যা শুনলো তাতে চিন্তা আরো বেড়ে গেছে ভূপেশের। ললিতার সন্দেহ যদি সত্যি হয়—কিন্তু ভূপেশের কাছ থেকে তো কোন সাহায্য নেবে না ওরা।…

অদ্ভুত দাম্ভিক ছোকরা। ওর কাছে শিক্ষা পেয়েই মানসী এমন

বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু এত তেজ থাকবে কোথায়! ছেলের দুধের ব্যবস্থা করতেই তো—

মানসীকে গিয়ে একদিন দেখে আসার ইচ্ছে ছিল ভূপেশের। কিন্তু ঐ দাম্ভিক ছোকরার জন্যেই শেষপর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। গিয়ে হঠাৎ যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হলে যদি অসম্মানজনক ব্যবহার করে?

কিন্তু কলকাতায় থেকেই মানসীর কি করতে পারছে ভূপেশ। শুধু চিন্তা করা ছাড়া। ছেলে-মেয়ে, দুটোই ওকে জ্বালিয়ে মারছে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে মানুষের সত্যি কোন শান্তি নেই। মন খুলে এসব কথা বলার এখন লোকও নেই। বারীন চলে গিয়ে ভূপেশ একেবারে একলা হয়ে গেছে।

কিছুদিন তাই কলকাতার বাইরে কাটিয়ে আসা মন্দ নয়। নতুন পরিবেশে মনটা হয়তো একটু তাজা হয়ে উঠবে।

ললিতার ছোড়দার প্রস্তাবে তাই ভূপেশ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

মানসীর কথা ভাবতে ভাবতেই মানসীর চিঠি পেল ভূপেশ। চিঠিটা ওর ঠিকানা থেকে redirected হয়ে এসেছে। ভূপেশ গোপালপুরে এসেছে মানসী জানে না।

ললিতাকে নয়, চিঠিখানা মানসী লিখেছে ভূপেশকেই। কলকাতায় ওদের বাড়িতে গিয়ে সেদিন ভূপেশের সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই দুঃখ করে লিখেছে।

হতভাগা অরবিন্দ ছোকরা মানসীকে কত কষ্টই না দিচ্ছে! স্বামী অসন্তুষ্ট হবে সেই ভয়েই নিশ্চয় নিজের মা-বাপের সঙ্গে এতদিন নিয়মিত এসে দেখা করতে পারেনি মানসী। তা নইলে মানসীর মত স্নেহপ্রবণ মেয়ে—।…অথচ মুখে কত বড় বড় বুলি কপচায় ছোকরা। মেয়েদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের কথা বলে।

তবু যা হক, মানসীর যে এতদিনে সুবুদ্ধি হয়েছে মা-বাপের কথা মনে পড়েছে।

মনে পড়াই তো স্বাভাবিক। যাদের কোলে-পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছিস।

মানসী লিখেছে, শীগগিরই নাকি আবার আসবে ওদের দেখতে। এবার এলে মেয়েকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবে ভূপেশ—অরবিন্দকে যাতে রাজী করাতে পারে সঙ্গে আনতে। ওদের কাছে এসেই তো দুজনে থাকতে পারে। মেয়ে-জামাই কি শ্বশুরের কাছে এসে থাকতে পারে না ?···অরবিন্দ শত হলেও ওর জামাই। রেজিষ্ট্রি করে মানসীকে যখন বিয়ে করেছে সে। ভূপেশ একটু নরম হলেই অরবিন্দর রাগ পড়ে যাবে।

নরম না হয়ে উপায়ই বা কি।···স্নেহ-মমতার কাছে হেরে গেলে মানুষের হার হয় না—জয়ই হয়—বারীন ঠিকই বলেছিল কথাটা।

না, এবার কলকাতায় গিয়েই ভূপেশ মেয়ে-জামাইকে নিজে গিয়ে গাড়ী করে বাড়িতে নিয়ে আসবে।

বাণী ওরা আজ মধুপুরে রওনা হয়ে গেল।

ইচ্ছে থাকলেও স্টেশনে বাণীদিদের সী-অফ্ করতে যেতে পারলো না মানসী। অরবিন্দ একাই ওদের সবাইকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এল। ওদের জিনিসপত্র বাঁধা থেকে শুরু করে সব কাজই তো করতে হয়েছে অরবিন্দকে। দেবব্রতবাবু পণ্ডিত মানুষ—সংসারের কাজকর্ম সম্পর্কে একেবারেই আনাড়ী।

কাজের চাপে দুপুরে বাড়িতে ফিরতে পারেনি অরবিন্দ। অতিরিক্ত খাটাখাটুনিতে বড় ক্লান্ত লাগছিল। বিকেলে পার্টি-অফিসে একবার ঢু মেরেই তাই বাড়ি ফিরে এল সে। আকাশের আলো তখন ম্লান হয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকে মানসীকে বিছানায় ঐভাবে শুয়ে থাকতে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে অরবিন্দ।—শরীর খারাপ লাগছে ?

মানসী অমনি উঠতে যাচ্ছিল, অরবিন্দ বাধা দিলে। না না তুমি শুয়ে থাক, তোমার এখন উঠে দরকার নেই।

—কেন, চা খাবে না ?—ক্লান্ত হেসে মানসী জিজ্ঞেস করে।

—সেজন্যে তোমাকে উঠতে হবে না। আমি আছি কি করতে ?

মানসীর চোখে অমনি জল দেখা দেয়। ছলছল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলে—কত কষ্ট করবে তুমি? সারাদিন পরে এই তো বাড়ি ফিরলে—বলেই মানসী শুয়ে পড়ে আবার। না, শরীরটা সত্যি আজ ক্লান্ত বোধ করছে মানসী, তা নইলে বিনা প্রতিবাদে আবার অমন ভাবে শুয়ে পড়তো না।

অরবিন্দ রান্নাঘরে গিয়ে চা করে নিয়ে এল। রাত্রে ভাতে-ভাত ছু'টি তাও ফুটিয়ে নিলে সে—মানসীকে উঠতে দেয়নি।

শোবার আগে খাটের উপর বসে মানসী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, কি হবে বল তো?

অরবিন্দ ঠিক ধরতে পারে না ওর কথাটা। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ওর প্রশ্নভরা চোখের দিকে তাকিয়ে মানসী বলে—ছেলে, না মেয়ে, কি হবে আমাদের?

—তাই বল।—অরবিন্দ হেসে ফেলে ওর কথায়। ওকে খুশি করার জন্যে বলে—আমার তো মনে হচ্ছে মেয়েই হবে—মেয়ে হলেই ভালো। মা-বাপকে মেয়েরাই বেশি ভালবাসে।

মানসী সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করে ওঠে। বলে— না, প্রথমে ছেলে হওয়াই ভালো, মেয়ে হলে একটু বড় হতে না হতেই সেই তো পরের ঘরে চলে যাবে।

আগের কথার জের টেনে মানসী বলে—দেখ, ঠিক ছেলে হবে আমাদের। আর স্বভাবটাও হবে তোমার মতন, পেটের মধ্যে এখনই যা দস্যিপনা শুরু করেছে।

—কষ্ট হচ্ছে?—মানসীর কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে অরবিন্দ।

—না।—মিষ্টি হেসে মানসী উত্তর দেয়ঃ বরং ভালোই লাগছে। বার বার আমি যেন এমনি ভাবে তোমার ছেলের মা হতে পারি।

অরবিন্দ ওর হাতখানি তুলে নেয় হাতের মধ্যে। বুকে জড়িয়ে ধরে ওকে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে। না, আদর-সোহাগ এখন আর সহ্য হবে না ওর। মুখখানি সত্যি বড় শুকনো

দেখাচ্ছে। এক'দিন ওর দিকে একেবারেই দৃষ্টি দিতে পারেনি অরবিন্দ কাল সকালেই একবার ওকে হাসপাতালে নিয়ে দেখিয়ে আনতে হবে।

কিন্তু সকাল হবার আগেই শেষরাত্রে মানসী ডেকে তুললো অরবিন্দকে।—এই ওঠ, আমার ভীষণ—

—ব্যথা উঠেছে!—ব্যস্ত হয়ে অরবিন্দ ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলো।

পেটে হাত চেপে মানসী বলে উঠল—যাও, শীগগির ওঘরে গিয়ে তোমার শান্তিবৌদিকে ডেকে নিয়ে এসো।

অরবিন্দ এক লাফে বিছানা থেকে নেমে শান্তিবৌদির ঘরের দিকে ছুটলো। তিন ছেলের মা বৌদি। ঘরে ঢুকে মানসীর অবস্থা দেখে তিনি বলে উঠলেন, আর দেরি না করে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যান।

অরবিন্দ ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি ডেকে আনলো।

ট্যাক্সিতে মানসীর মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছিল সে। ব্যথাটা তখন একটু জুড়িয়ে এসেছে।

—তুমি কোন চিন্তা কোরো না, ছেলে কোলে নিয়ে দু'দিন বাদেই আমরা আবার এমনি ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরে আসবো।

মানসীকে ভরসা দেবার জন্য অরবিন্দ বলে—তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি করেই আমি তোমার বাবাকে টেলিফোন করে দেব, তিনি এসে পড়লে—

অরবিন্দর কথা শেষ হবার আগেই মানসী বলে ওঠে—না, ওকাজ করতে যেও না। এমনিতেই তো বাবা হাইপারটেনশনে ভুগছেন, কোনরকম দুশ্চিন্তা ওঁর এখন সহ্য হবে না।...

আশ্চর্য স্নেহপ্রবণ মন! এত কষ্টের মধ্যেও বাবার অসুস্থতার কথা চিন্তা করছে। এই মেয়ে কি করে ওর বাবা-মাকে ছেড়ে চলে এল! কথাটা মনে হতেই নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হল অরবিন্দর।

ব্যথাটা আবার বুঝি চেগে এল মানসীর। দাঁতে ঠোঁট চেপে সহ্য করার চেষ্টা করছিল সে।

দেখতে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছে গেল। সূর্যোদয়ের পরেও আকাশটা মেঘলা হয়েছিলো। এমন আকাশের দিকে তাকালে মনটাও খারাপ হয়ে যায়।

হাসপাতালে ডাক্তারদের কথা শুনে মন আরো খারাপ হয়ে গেল। মানসীকে পরীক্ষা করে সার্জেন ডাক্তার আশ্বাস দেবার মত কিছু বলতে পারলেন না। বললেন—ভয় পাবেন না, এরকম কেস আজকাল আকচার আসছে আমাদের এখানে। সিজারিয়ান্ অপারেশন্ তো সার্জেনদের কাছে এখন জল-ভাত। এ নিয়ে এখন মোটেই চিন্তা করেন না তাঁরা।

সার্জেনদের কাছে সব অপারেশন্-ই তো জল-ভাত। কোন অপারেশন্ নিয়েই তাঁরা চিন্তা করেন না। কিন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজন চিন্তা না করে থাকতে পারে কখনো?…মানসীর যদি খারাপ কিছু হয়। অরবিন্দর কেমন ভয়-ভয় করে। মানসী নিষেধ করলে কি হয়। ওর বাবাকে খবরটা এখুনি জানানো দরকার।

যোগাযোগ না রাখলেও বাপকে অসম্ভব ভালবাসে মানসী। অপারেশন্-এর আগে হঠাৎ তাঁকে দেখার ইচ্ছা হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। তা ছাড়া সিজারিয়ান্ অপারেশন—ভাল-মন্দ কিছু হলে ভদ্রলোকের কাছে ও মুখ দেখাবে কি করে!

মানসীকে হাসপাতালে নার্স-ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে রেখেই অরবিন্দ ছুটে গিয়ে ভূপেশবাবুর বাড়িতে টেলিফোন করলো। আশ্চর্য ব্যাপার, কেউ ধরলো না টেলিফোনটা। বেজেই চললো। বাড়িতে কেউ নেই নাকি? অরবিন্দ পর পর আরো কয়েকটা টেলিফোন করলো ওর কমরেডদের কাছে।

খানিকবদে সে আবার টেলিফোন করে ভূপেশবাবুর বাড়িতে। বেশ কিছুক্ষণ বাজার পর কে একজন এসে ধরলো টেলিফোনটা। অপরিচিত পুরুষকণ্ঠ।

—আপনি কে বলছেন?—অরবিন্দ জিজ্ঞেস করে।

—আমি? আমি এ বাড়িতে বেয়ারার কাজ করি।

—বাড়িতে অন্য কেউ নেই নাকি?

—না, বাবু মাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গেছেন।

—তোমার দাদাবাবু তো আছেন ?

—না, তিনি প্রায় সময়ই বাইরে থাকেন।

—রাত্রে ফিরবেন তো ?

—বলতে পারি না। রাত্রেও বেশির ভাগ দিন তিনি বাড়িতে থাকেন না।

ঠিক আছে।—বিরক্ত হয়ে অরবিন্দ ছেড়ে দেয় টেলিফোন।—না মানসীর বাবাকে জানানো গেল না খবরটা। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ফিরে আসে সে।

অরবিন্দকে দেখেই সার্জেন-ডাক্তার সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন।—আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ?···অপারেশনের সময় হয়ে গেছে—।

অরবিন্দর দু'চারজন কমরেড ততক্ষণে হাসপাতালে পৌঁছে গেছে।

অরবিন্দ যন্ত্রচালিতের মতই খাতাপত্রে সই-সাবুদ যা করতে হয় করে ফেললো।

মানসী চোখ বুজে পড়েছিল।

—আপনি ইচ্ছে করলে অপারেশন-রুমে থাকতে পারেন।—অরবিন্দকে লক্ষ্য করে সার্জেন বলে উঠলেন।

হ্যাঁ, স্বামী হিসাবে মানসীর অপারেশনের সময় ও উপস্থিত থাকতে পারে বৈকি!

কিন্তু উপস্থিত থেকেই বা কি করতে পারলো অরবিন্দ! সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘন হয়ে এসেছে। ডাক্তার—সার্জেন-নার্স সকলের চেষ্টা ব্যর্থ করে মানসী চলে গেল। কথা বলা দূরে থাক, যাবার আগে অরবিন্দর দিকে একবার চোখ মেলে তাকিয়েও দেখলো না।

আশ্চর্য, ছেলেটা কিন্তু বেঁচে রইল। আন্‌ইউজুয়ালি—আশ্চর্য বাড়ন্ত গড়নের—ফুটফুটে ছেলে! অবিকল মানসীর মুখের গড়ন।

হাসপাতালে নার্সের তত্ত্বাবধানেই রইল বাচ্চাটি। এখন কয়েকদিন ওকে নাকি অবজারভেশনে রাখতে হবে।

করণীয় সব কিছু শেষ করে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল অরবিন্দর। কমরেডরা ওর সঙ্গেই ছিল সর্বক্ষণ। তারা সবাই চলে

গেলে অরবিন্দ আস্তে আস্তে তার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরের চারদিকেই মানসীর চিহ্ন। হাসপাতালে যাবার আগে যে শাড়ীটা ছেড়ে রেখে গেছে সেটা মেঝেতে তেমনি পড়ে আছে। অরবিন্দকে পরে বাথরুমে জলে ভিজিয়ে রাখতে বলেছিল মানসী। বিছানায় বালিসে ওর মাথাটা যেখানে ছিল, সে জায়গায়াটা এখনও নীচু হয়ে আছে।

অরবিন্দ আর ধরে রাখতে পারে না নিজেকে।···ঐ বালিসের উপর মুখ গুঁজে হুহু করে কাঁদতে থাকে।

পরের দিন সকালে উঠেই অরবিন্দ ছুটে গেল হাসপাতালে ছেলেকে দেখতে। ছেলে ভালোই আছে। আর দু'দিন অবজারভেশনে রেখেই অভিভাবকের হাতে তুলে দেবে ওকে।

মানসী নেই, তার ছেলে তো বেঁচে আছে। কাল ওর জীবন নিয়েও টানাটানি গেছে। ছেলে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলো অরবিন্দ।

বাড়িতে ঢুকেই দেখে কমরেডরা এসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। বাড়ির চাবি বৌদির জিম্মায় রেখেই হাসপাতালে চলে গিয়েছিল সে।

ছেলের খবর শুনে সবাই নিশ্চিন্ত হল। শান্তি বৌদিই সবাইকে চা দিয়ে গেলেন।

চুপ করে বসে সবাই চা খাচ্ছিল—কারো মুখেই কথা নেই। ঘরের সব মানুষগুলো যেন বোবা হয়ে গেছে!

খানিকবাদেই একে একে উঠে পড়লো সবাই। অরবিন্দও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কমরেডদের সঙ্গে যত বন্ধুত্বই থাক না কেন, আজ এই পরিবেশে একলা থাকতেই ইচ্ছে করছে তার।

কিন্তু একলা থাকার কি উপায় আছে!···

দুপুরবেলায় বৌদির ওখানে দু'টি ভাতে-ভাত খেয়ে চুপচাপ নিজের শোবার ঘরে এসে শুয়ে ছিল সে—সেই খাটে, সেই বিছানায় যেখানে ওরা দু'জনে—

হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। উঠে দরজাটা খুলেই অবাক—রমা!

এর মধ্যেই খবরটা জানলো কি করে? দুঃসবাদগুলো যেন বাতাসের আগেই পৌঁছে যায় সবার কাছে!

দু'জনে শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। খাটের উপর মুখোমুখি হয়ে বসলো ওরা। অরবিন্দর দিকে চেয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল রমা।

—কেঁদ না।—রমার কাঁধে হাত রেখে অরবিন্দ ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

একটুবাদেই রমা নিজেকে সামলে নেয়। আঁচলে চোখের জল মুছে কান্নাধরা গলায় বলে ঃ তুমি ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছ শুনে আমি যে ওর জন্যে কালীঘাটে মায়ের কাছে পূজো মানত করেছিলাম—

—দেব-দেবতায় এখনও বিশ্বাস করো তুমি ?—অরবিন্দ বলে।

—বিশ্বাস না করে বাঁচবো কি ভাবে !—বলেই রমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রমার কথার কোন জবাব দিতে পারে না অরবিন্দ।

হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়েছিল সে। হারান ঘরে ঢুকতেই সম্বিৎ ফিরে এল।

অরবিন্দ কাছে ছল-ছল চোখে এগিয়ে এল হারান।—ভগবানের কোন বিচার নেই ভাই—চোখের জল সামলে নিয়ে বললে।

অরবিন্দর নিজের মনে দুঃখের হাসি হাসে। ভগবানের কাছে বিচার চায় ওরা ? চাষী-মধ্যবিত্ত মানুষ ভগবানে বিশ্বাস ওদের জন্মগত সংস্কার !

তিনজনেই চুপচাপ বসে থাকে—কারো মুখেই কথা নেই।

খানিকবাদে অরবিন্দকে লক্ষ্য করে রমা জিজ্ঞেস করে—ছেলেকে কবে বাড়িতে নিয়ে আসবে ?

—দু'চারদিনের মধ্যেই।

—আমাদের একটা খবর দিও।...মানসী নেই, তার ছেলে তো আছে। গলাটা যেন বুজে আসে রমার। ভুলে যেও না কিন্তু—খানিক পরে বলে।

রমার কথার কোন উত্তর দেয় না অরবিন্দ—দিতে পারে না।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে থেকে রমা উঠে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—এবার যাই, বৌদিকে একলা রেখে এসেছি।

নীরবে মাথা নেড়ে অরবিন্দ সম্মতি জানায়।

ধীর-মন্থর পায়ে রমা রাস্তায় গিয়ে নামে।

—আমিও যাই তাহলে।—হারান রমার সঙ্গ নেয়।

দুপুর গড়িয়ে তখনও বিকেল হয়নি। এমন সময়ে অনুপ এসে ঘরে ঢুকলো। চেয়ারে বসে অরবিন্দর দিকে চেয়ে ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল সে। মুখে কথা নেই। কথা বলতে আজ যেন সবাই ভুলে গেছে।

কথা অরবিন্দকেই বলতে হল।—মিতা ভালো আছে তো?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলে অনুপ। একটুবাদে জিজ্ঞেস করলে বাণীকে খবর দিয়েছ? ও কাছে থাকলে তবু—

—না, দু'দিনের জন্যে বেড়াতে গেছে, এসে তো শুনবেই।—অরবিন্দ উত্তর দেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুপ বলে—মানসী নেই এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিশ্বাস কি অরবিন্দই করতে পারছে! মানসীর কণ্ঠস্বরটা এখনও যেন কানে বাজছে। এই তো দু'দিন আগেই সন্ধ্যেবেলায় খাটের উপর বসে গান গাইছিলো: "আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি। —আমার যত বিত্ত, প্রভু আমার যত বাণী॥···"

কি মিষ্টি ভরাট গলাই না ছিল ওর।

—আমি তাহলে উঠি এখন!—ঘরের চারদিক দৃষ্টি বুলিয়ে অনুপ হঠাৎ বলে ওঠে। মানসীর স্মৃতিতে ঠাসা এই ঘরটিতে বসে থাকতে হয়ত কষ্ট হচ্ছিল ওর।

চোখে জল নিয়েই অনুপ চলে গেল।

অরবিন্দর একলার দুঃখ এখন আর একলার নয়। সমব্যাথী বন্ধু-বান্ধব সবাই এসে তার ভাগ নিয়েছে।

এই ঘটনার মাসখানেক বাদে। অরবিন্দ তখন তার ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

পাশের ঘরের শান্তিবৌদিই ছেলের সব ভার নিয়েছেন। নিজের ছেলের মতই তিনি যত্ন করেন মানসীর ছেলেকে। নিজের কোলেও তার

ছ'মাসের বেবি। খরচের সামান্য ক'টি টাকা ওঁর হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া অরবিন্দর কোন দায়িত্ব নেই।

ছেলের জামা-জাঙ্গিয়া এ সবের ব্যবস্থা তো মানসী আগে থেকেই করে রেখেছিল। কখন করলো এগুলি? মানসীর বাক্স খুলে ওগুলি দেখে অরবিন্দ সেদিন চোখের জল রাখতে পারেনি। শীতের গরম সোয়েটার, টুপি-মোজা পর্যন্ত সে বুনে রেখে গেছে ছেলের জন্যে। সেগুলি দেখে বৌদি তো অবাক!—এসব কোত্থেকে যোগাড় করলে?

—ওর মায়ের বাক্স থেকে।

কথাটা শুনে বৌদিও কেঁদে ফেলেছিলেন।

তবে হ্যাঁ, বৌদির আদরযত্নে ছেলেটা এই স্বল্প দিনের মধ্যেই দিব্যি নাদুস-নুদুস হয়ে উঠেছে। দেখলে কে বলবে যে একমাসের বাচ্চা। কত নাম-ই না সাজেস্ট করেছিল লোকে। মানসীর দেওয়া 'অনির্বাণ' নামটিই শেষপর্যন্ত বহাল রইল। ওর ছেলে হবে মানসী আগেই বুঝতে পেরেছিল।

মুখখানি কিন্তু অবিকল মানসীর মত। দেখলে হঠাৎ মেয়ে বলেই ভুল হয়। ওর মুখের দিকে চেয়ে বৌদি তাই বলেছিলেন—ছেলে তোমার খুব সুখী হবে ভাই, মাতৃমুখী ছেলে খুব সুখী হয়।

অরবিন্দ প্রতিবাদ করে উঠেছিল। বলেছিল—না, বৌদি, এ সমাজে মজুরের ছেলে সুখী হবার জন্যে জন্মায় না, জন্ম নেয় লড়াই করে বাঁচবার জন্যে।

কথাটা শুনে বৌদি হঠাৎ একটু চমকে উঠেছিলেন। কোন উত্তর দেননি।

অরবিন্দর ছেলে 'অনির্বাণ' মজুরের ছেলে ছাড়া কি! লেখাপড়া শিখেও অরবিন্দকে আজ কারখানায় চাকরি করতে হচ্ছে। মজুরের চাকরি। তা কেরানীগিরির চেয়ে মজুরের চাকরি একহিসাবে মন্দ কি! মেহনতী মানুষের সঙ্গে এক সারিতে সামিল হওয়া যায়।

সন্ধ্যা লাগে-লাগে। কারখানা থেকে ফিরে জামা-প্যান্ট বদলেই সোজা বৌদির ঘরে গিয়ে ঢুকলো অরবিন্দ। বাইরের জামা-কাপড় না

ছাড়লে ছেলের কাছে বৌদি যেতে দেন না। বলেন—নতুন পৃথিবীতে এসেছে, ওদের কোন immunity—প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। বাইরের জামা-কাপড় না ছেড়ে ছেলেকে ছোঁবে না।

অরবিন্দ জোর প্রতিবাদ করে ওঠে। বলে—মজুরের ছেলের মধ্যে প্রতিরোধ-ক্ষমতা—immunity তো জন্ম থেকেই। বংশানুক্রমে যুগযুগ ধরে ওরা লড়াই করে আসছে—সংসারে সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে—কাজেই ওসব ব্যাপারে তারা তো জন্ম থেকেই immune।

তর্ক করলেও শেষপর্যন্ত বৌদির কথাই মেনে নিতে হয়েছে। বাইরের জামা-প্যান্ট না বদলে সে ছেলেকে ছুঁতে পারে না।

তবে ঐ ছোঁয়াটুকু পর্যন্তই। কাছে বসে গালে টোকা দিয়ে কিংবা থুতনি ধরে এক-আধটু আদর করা—এই টুকুই সম্পর্ক ওর ছেলের সঙ্গে।

বিকেলে চা-টা আজকাল বৌদির ঘরে বসেই খায় অরবিন্দ। ছেলেটাকে উপলক্ষ্য করে বৌদি মধ্যে মধ্যে ওর সঙ্গে এক-আধটু হাসি-গল্প করেন বৈকি।

চায়ের কাপ খালি হতে না হতেই বৌদি হঠাৎ অভিযোগ করলেন—তুমি কেমন বাপ বল তো? ছেলেকে এ পর্যন্ত একবার কোলে নিলে না।

কথাটা মিথ্যে নয়। বাড়িতে নিয়ে আসার পর ছেলেকে আজ পর্যন্ত একবারও কোলে নেয়নি অরবিন্দ। সাহস পায়নি! অতটুকু বাচ্চা, কোলে নিতে গেলে যদি হঠাৎ লেগে-টেগে যায়। তা ছাড়া, আরো একটা ভয় আছে। যখন-তখন ও এমন সব কেলেঙ্কারী কাণ্ড করে বসে, তখন ওকে সামলানই দায় হয়ে পড়ে। অরবিন্দর প্যাণ্টেই হয়তো—সার্ট-প্যাণ্টের সংখ্যা তো খুব বেশি নয় ওর, যে নষ্ট করলে অমনি আর একটা বের করে ফেলবে। এমনিতেই তো আজকাল জামা-প্যাণ্ট পরিষ্কার রাখা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অরবিন্দর পক্ষে। মানসী ওর অভ্যাসটা খারাপ করে দিয়ে গেছে। নিজের এসব কাজ এখন নিজে করে উঠতে কষ্ট হয়।

বৌদির কথা শুনে অরবিন্দ তাই হেসে উত্তর দিলে—যা শিক্ষা দিয়েছ ছেলেকে, জামা-প্যাণ্ট কখন নষ্ট করে ফেলে তার ঠিক আছে?

—তাই বলে ছেলেকে কোলে নেবে না?—মৃদু হেসে বৌদি বলেন—নাও, ধর, আমি ততক্ষণে ওর দুধের জলটা গরম করে নিয়ে আসি।

বৌদি ছুতো করেই 'অনির্বাণ'-কে ওর কোলে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

আর তখুনি অরবিন্দর বাড়ির দরজায় কে যেন এসে কড়া নাড়লো। কে আবার এল এমন ভর সন্ধ্যেয়! কোন কমরেড নিশ্চয়।

বৌদির প্যাসেজের দরজাটা এখন খোলাই থাকে। দুবাড়ির যাতায়াতের সুবিধে হয় তাতে। ছেলেকে কোলে নিয়েই অরবিন্দ এগিয়ে এল। সদর দরজা খুলে বিস্ময়ে হতবাক। না, কোন কমরেড নয়, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ভূপেশবাবু— মানসীর বাবা। আর বাড়ির বাইরেই একখানা বুইক গাড়ী—সাদা রঙের।

হ্যাঁ, ড্রাইভার ছাড়া সঙ্গে আর কেউ আসেন নি। —আসুন। —বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে অরবিন্দ ওকে অভ্যর্থনা করে।

আর কোন কথা না বলে ভূপেশবাবুকে নিয়ে অরবিন্দ এসে তার শোবার ঘরে ঢোকে।

—বসুন।—অরবিন্দ ওঁর দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজে খাটের উপর গিয়ে বসে ছেলেকে কোলে নিয়ে।

স্তম্ভিত করুণ দৃষ্টি মেলে 'অনির্বাণে'র দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভূপেশবাবু বলেন—আমার মানুর ছেলে!—কথাগুলো কতকটা বিলাপের মত শোনায় যেন।

অরবিন্দ মাথা নীচু করে থাকে। কোন উত্তর দেয় না। ব্যাপারটা এত স্পষ্ট যে উত্তর দেবার প্রয়োজনও ছিল না।

—কি নাম রেখেছ?—ভূপেশবাবু ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করেন।

—'অনির্বাণ'।

স্থির-করুণ দৃষ্টি অরবিন্দর মুখের উপর রেখে ভূপেশবাবু বলেন—তোমার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি—

বিস্মিত প্রশ্ন নিয়ে ভূপেশবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে অরবিন্দ।

খানিক ইতস্ততঃ করে ভূপেশবাবু বলেন—আমার দাদুকে নিতে এসেছি।—একটু থেমে নিজেকে আরো পরিষ্কার করার জন্যেই যেন বললেন—একে মানুষ করা তোমার পক্ষে তো সম্ভব নয়।

কথাটা শুনেই মেজাজ গরম হয়ে উঠল অরবিন্দর। সে-তারটা

যথাসম্ভব চাপা দিয়ে উত্তর দিলে—ক্ষমা করবেন, মজুরের ছেলে, মজুরের ঘরে মানুষ হওয়াই তো উচিত।

কথাগুলো শুনে ভূপেশবাবু যেন হকচকিয়ে গেলেন।

গুম হয়ে খানিক বসে থেকে বললেন—একটু ভেবে দেখলে ভাল করতে।—ভূপেশবাবু তাঁর চির-অভ্যস্ত দাম্ভিক ভাবটা চেপে রাখতে পারলেন না।

খাটের উপর ছেলেকে নিয়ে চুপ করে বসেছিল অরবিন্দ। বারান্দায় বৌদিকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেই উঠে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছেলের দুধ খাবার সময় হয়েছে।

বৌদির কোলে ছেলেকে দিয়ে অরবিন্দ আবার এসে বসলো ভূপেশ-বাবুর সামনে।

ভূপেশবাবুর মেজাজ ততক্ষণে আরো যেন গরম হয়ে উঠেছে। আহত-অভিমানে থমথম করছে মুখ। ক্ষুব্ধ-গম্ভীর দৃষ্টিটা অরবিন্দর দিকে নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন।—এই তাহলে তোমার শেষ কথা?

—এ ছাড়া আর কি বলতে পারি!—অরবিন্দ চুপ করে বসে থাকে।

ভূপেশবাবু আচমকা উঠে দাঁড়ান।—আমি যাই তাহলে।—কথাগুলো কান্নার মত শোনায় যেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভূপেশবাবু সোজা তাঁর গাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী অবধি এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওকে যেন দেখতেই পেলেন না তিনি।

অরবিন্দর কাছে উনি এই রকম ব্যবহার পাবেন, ভাবতে পারেন নি।

গোপালপুর থেকে ফিরে এসেই ঐ মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা শুনলো ভূপেশ—মানসী এ সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে চিরদিনের মত। বিনাযত্নে, বিনা-চিকিৎসায় মেয়েটা হয়তো চলে গেছে। ভূপেশ কলকাতায় থাকলে এইভাবে চলে যেতে পারতো না। গোপালপুরে না গেলে এই সর্বনাশটা হতো না ভূপেশের।

আশ্চর্য ব্যাপার, মানসীর জন্যে ওর এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল না! চোখের সব জল যেন বুকের ভেতর বরফ হয়ে জমে গেছে।

খবরটা শোনার পর থেকে ললিতা বিছানা নিয়েছে। বিছানায় শুয়ে সর্বক্ষণ চোখের জল ফেলছে। দুঃসংবাদটা শুনেই ললিতার ছোট বৌদি ওদের কাছে চলে এসেছেন, আর বাড়ি ফেরেন নি। রাত্রে ললিতাকে উনিই আগলে রাখেন। নিজের ছেলে-বউ থাকতেও শালাবউকে এসে আজ ওদের সেবাযত্নের ভার নিতে হয়েছে।

গোপালপুর থেকে এসে অবধি সমীরের দেখা নেই—কোথায় নাকি এক্সকারশনে বেরিয়েছে। ছেলেটাও যদি কাছে থাকতো! ললিতাকে এখন সামলানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে।

ভূপেশ কাছে গেলেই বারবার ঐ এক কথা।—যাও এখুনি গিয়ে মানুর ছেলেকে নিয়ে এসো।

ছেলেটিকে নিয়ে আসার কথা ভূপেশেরও যে মনে আসেনি, তা নয়। অতটুকু বাচ্চা অরবিন্দ মানুষ করবে কি ভাবে। আয়া রেখে ছেলে মানুষ করারও সঙ্গতি নেই ওর।

হ্যাঁ, মানসীর বাচ্চাটির কথা চিন্তা করেই ভূপেশ আজ গাড়ী নিয়ে ছুটে গিয়েছিল অরবিন্দর ওখানে। গিয়ে কোন ফল হল না। উলটো অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হল ভূপেশকে।

ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে বাড়ি ফিরে চোরের মত আস্তে আস্তে দোতলায় উঠে এল সে।

ভয়ে-ভয়ে ললিতার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ললিতা শুয়ে ছিলো খাটের উপর। ভূপেশকে একলা ঘরে ঢুকতে দেখেই খাটের উপর উঠে বসলো।—একি, মানুর ছেলেকে নিয়ে এলে না?—বলেই কেঁদে উঠল।

ভূপেশ চেয়ারে বসে পড়ে। মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে—কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

—কথা বলছো না যে?—কান্না ধরা গলায় ললিতা বলে।

—কি বলবো বল?···ওদের ছেলে ওরাই মানুষ করবে।

—মামুর ছেলের উপর আমাদের তাহলে কোন অধিকার নেই ?—উত্তেজিত হয়ে ললিতা বলে ওঠে।

—না।—আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ভূপেশ উত্তর দেয়ঃ অধিকার থাকলে তো নিয়ে আসতেই পারতাম—এমন অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হত না।

ললিতা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ভূপেশ ওর কান্না সহ্য করতে পারে না। দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে। মাথাটা হঠাৎ কেমন ঝিম্‌ঝিম করছে।

ঠিক ঐ সময়েই ললিতার ছোট বৌদি এসে ঘরে ঢুকলেন। ভূপেশের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—শরীর খারাপ বোধ করছেন ?···চলুন, ও ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করবেন।

ভূপেশ তাঁর কথামত পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে। খাটের উপর বিছানাটা পাতাই ছিল, রাত্রে ভূপেশ এখন এই ঘরেই শোয়।

ঘরে ঢুকেই বিছানার উপর চিত হয়ে পড়লো ভূপেশ বসে থাকার শক্তি ছিল না।

ছোট বৌদি ছুটে গিয়ে এক কাপ হরলিকস নিয়ে এলেন ওর জন্যে। —নিন্ এটা খেয়ে নিন।···ডাক্তারবাবুকে এখুনি টেলিফোন করে দিচ্ছি। প্রেসারটা একবার চেক-আপ করে নেওয়া ভালো।

ভূপেশ নিজের মনে দুঃখের হাসি হাসে।—এখনও ভূপেশকে ভালো করার চেষ্টা করছেন ওঁরা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভূপেশ হরলিকসের কাপ হাতে তুলে নেয়।

খানিকবাদেই ডাক্তার এসে প্রেসার চেক-আপ করেন। বলেন—মেণ্টাল এগজসন্—মানসিক অবসাদই প্রধান কারণ ওর অসুস্থতার।

ওষুধের কথা বৌদিকে বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তার উঠে পড়েন। যাবার মুখে বৌদিকে লক্ষ্য করে বলেন—রাত্রে হালকা খাবার দেবেন, ঘুমের ওষুধটা দিতে ভুলবেন না কিন্তু।

না, ঘুমের ওষুধ দিতে ভুল করলেন না ছোট বৌদি। খাবার পরেই ঘুমের ওষুধ ও জলের গেলাস ভূপেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—নিন, ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়ুন এবার।

ঘরের জোরালো আলোটা নিভিয়ে অল্প পাওয়ারের সবুজ আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বললেন—এবার ঘুমিয়ে পড়ুন—দরকার পড়লেই ডাকবেন আমাকে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বৌদি আস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভূপেশ শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে ঘুমবার চেষ্টা করে। খানিকবাদেই মাথাটা আবার ঝিম্‌ঝিম করতে থাকে। ঘরের সবুজ বালবটা নিভে যায় হঠাৎ। ঘরের মধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকার।

শেষ রাত্রে হঠাৎ দরজায় সামনে এসে কে যেন ডাক দিলে ওকে।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে পড়লো ভূপেশ। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি জোয়ান ছেলে। বললে—চলুন, আর দেরি করবেন না, রাত ভোর হয়ে এসেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ভূপেশ ছেলেটির সঙ্গে নীচে নেমে এল। সদর পেরিয়ে রাস্তায় এসে নামলো দু'জনে।

মন্থর পায়ে ছেলেটির পিছু পিছু চলতে থাকে ভূপেশ। কিন্তু কোথায় চলেছে সে! সামনে দীর্ঘ বন্ধুর পথ।

সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই চোখে পড়ল একটা বিরাট মিছিল—অগণিত মানুষের।

জোয়ান সেই সঙ্গী ছেলেটি হঠাৎ ঐ মিছিলে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করলেও চারদিকে অন্ধকার তখনও থমথম করছে। অন্ধকার ভেদ করে মিছিলের ইস্পাত-কঠিন উজ্জ্বল মূর্তিগুলি দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

ভূপেশ আপ্রাণ চেষ্টা করেও ওদের ধরতে পারে না—পেছনে পড়ে থাকে। পা দুটো অসম্ভব ভারী মনে হয় ওর। দূরত্ব ক্রমশঃ বেড়ে যায়।

মিছিলের ভেতর থেকে হঠাৎ এক কিশোর বালক ছুটে এসে ওর হাত ধরলো। বললে—চল দাদু, তাড়াতাড়ি চল।

নিজেকে বড় ক্লান্ত—অবসন্ন মনে হয় ভূপেশের।

—একি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল, তাড়াতাড়ি চল। —কিশোর ছেলেটি ওকে তাড়া দেয়।

ছেলেটিকে যেন চেনা-চেনা মনে্ হয় ভূপেশের।

—কে তুমি ?

—আমাকে চিনতে পারছো না দাদু ? আমি 'অনির্বাণ'।

—অনির্বাণ! মানসীর ছেলে ? হ্যাঁ, তাইতো মুখখানি ঠিক মানসীর মতই।

—কোথায় চলেছ তোমরা ?—রুদ্ধশ্বাসে ভূপেশ প্রশ্ন করে।

—সূর্যোদয়ের পথে।

—সে যে অনেক দূর, অনেক চড়াই-উতড়াই ভেঙ্গে যেতে হবে।

ভূপেশ সমস্ত শক্তি দিয়ে 'অনির্বাণে'র হাতটা চেপে ধরে—ক্লান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায় মিছিলের দিকে।

ঘরের সবুজ বালবটা হঠাৎ জ্বলে উঠল। না, ভূপেশ তার খটের উপরই শুয়ে আছে।

খাটের পাশে ছোটবৌদি দাঁড়িয়ে আছেন ওর দিকে চেয়ে। জানলায় ভোরের আলো।

—স্বপ্ন দেখছিলেন ?—বিষন্ন হাসি হেসে বৌদি জিজ্ঞেস করেন।

স্বপ্ন ছাড়া কি! ভূপেশ কোন উত্তর দেয় না। উত্তর আশাও করেন না বৌদি।

—চা নিয়ে আসি।—বলে আস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ভূপেশ স্বপ্নের ঘোরেই যেন নিজের মনে বলে যায়—সূর্যোদয়ের পথ! সে যে অনেক দূর, অনেক চড়াই-উতড়াই ভেঙ্গে যেতে হবে আমাকে।...পথ এখনও অনেক বাকি—"দ্য উডস্ আর লাভলি, ডার্ক অ্যাণ্ড ডিপ, বাট আই হ্যাভ প্রমিসেজ টু কিপ, অ্যাণ্ড মাইলস্ টু গো বিফোর আই স্লিপ..."

সমাপ্ত

ভ্রম সংশোধন

২০৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় লাইন হবে :—রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় অমিত রায় যেমন করেছিল—কোন মেয়ের হাতে উচ্ছ্বাসের মাথায় আংটি-ফাংটি পরিয়ে কোন মেলোড্রামাও সৃষ্টি করেনি।